কসমোলজি

অমিয় কুমার ব্যানার্জ্জী

ক স মো ল জি

অমিয়কুমার ব্যানার্জ্জী

সময় আর আকাশের সুতোর বুননে বাস্তব নাকি অবাস্তব(?)
জগতের "সৃষ্টি ও জীবনতত্ত্ব"

করুণা প্রকাশনী।। কলকাতা - ৭০০ ০০৯

কে সে?
অথবা কি সে?
যেই হোক
অথবা যাই হোক
উদ্দেশ্য তাকেই।

বিষয়সূচি

ভূমিকা

"দেখরে নয়ন মেলে জগতের বাহার।"—জগতের বাহারকে উপভোগ করার মধ্যে আমরা মানব জীবনের সার্থকতা, জীবনের আনন্দ খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করি। উপভোগ করার ব্যাপারটি অনেক বড়। প্রকৃতির ব্যাপ্তি বিশাল। আকাশ, বাতাস, সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, অনু, পরমাণু, আলো, অন্ধকার, জীব, জন্তু, গাছ-পালা, শব্দ, ছন্দ, সুর, তাল, সৃষ্টি, লয়, জীবন, মরণ এই সব নিয়েই প্রকৃতি। এই সব ব্যাপারে যদি কিছুটাও জানা থাকে তবে উপভোগের মাত্রাটা বেশী হয়।

এই জানার জন্যে কত নামী, অনামী মানুষ তাঁদের সারা জীবন ব্যায় করে গেছেন। কেউবা কিছু উত্তর পেয়েছেন। এই কিছু উত্তরের সূত্র ধরে হয়তবা আর একজন পেয়েছেন একটু বেশী উত্তর। পূর্ণ-উত্তর অবশ্য অপেক্ষায় রয়েছে আরো বেশী অন্বেষণের।

মধ্যের এই ছোট ছোট উত্তর আমাদের উপভোগের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। বৈচিত্র বাড়ে। আরো বড় উত্তর খোঁজার ঝোঁক বাড়ে। অজানাকে জানার ইচ্ছে অদম্য হয়ে ওঠে।

জানতে ইচ্ছে করে এই প্রকৃতির আরম্ভ কোথায়? কত দিন আগে? এঁর শেষই বা কোথায়? কতদিন পরে?

এই অনুসন্ধানের মধ্যে আমরা পেয়েছি কত নতুন নতুন তথ্য। কত নতুন সূত্র। আর এই সব সূত্রকে ধরে আমরা তৈরী করেছি গাড়ী, জাহাজ, এরোপ্লেন, টিভি, রকেট, উপগ্রহ, কম্পুউটার, ফোন, মোবাইল ফোন, X-রে, লেজার, অণুবিক্ষন যন্ত্র, দূরবিক্ষন যন্ত্র। আরো কত কী?

আবিষ্কার হচ্ছে জীবনদায়ী কত নতুন ওযুধ, নতুন চিকিৎসা। বিশেষ সুবিধে হয়েছে যে কোন বিষয়ে শিক্ষা-গ্রহণের। কম্পুউটার-এর ইনটারনেটের মাধ্যমে যাবতীয় তথ্য বিস্তারিত ভাবে না হলেও সাম্যক জ্ঞান পাওয়া সহজ হয়েছে। আজ আমরা অনেক বেশী জানি। জানি বলেই আমাদের কাছে না জানার পরিধিটাও অনেক বড়।

বিস্ময় বাড়ে বিশ্বের বিশালতার কিছু পরিচয়ে। অবাক হই যখন ভাবি হয়ত

বিশ্বের সবকিছুর সৃষ্টির মূলে রয়েছে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম সব সুতোর মত জিনিস। এতই ক্ষুদ্র এই সব সুতো যা সবচাইতে শক্তিশালী অণুবীবক্ষন যন্ত্র দিয়েও দেখা সম্ভব নয়। এক একটি সুতো একটি অনু থেকে বহু হাজার কোটি গুণ ছোট। তবে এঁদের দেখা না গেলেও এঁদের সব সূত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। এই সব সূত্রগুলি সুপার স্ট্রিং থিওরি (Super String theory) নামে বিখ্যাত। তবে যতদিন না এই সব স্ট্রিংদের উপস্থিতি পরীক্ষামূলকভাবে প্রমাণিত হচ্ছে ততদিন এই সব সূত্রগুলির স্বীকৃতি পাওয়া যাবে না। সারা পৃথিবী জুড়ে গবেষণা চলেছে এই স্ট্রিং-দের উপস্থিতি পরীক্ষামূলকভাবে প্রমাণ করার।

এখন প্রায় নিশ্চিতভাবে জানা গেছে যে আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের বয়স ১৩৭০ কোটি বছর (13.7 Billion years)। আমাদের সূর্যের বয়স ৪৫০ কোটি বছর। আমাদের পৃথিবীর বয়সও ৪৫০ কোটি বছর।
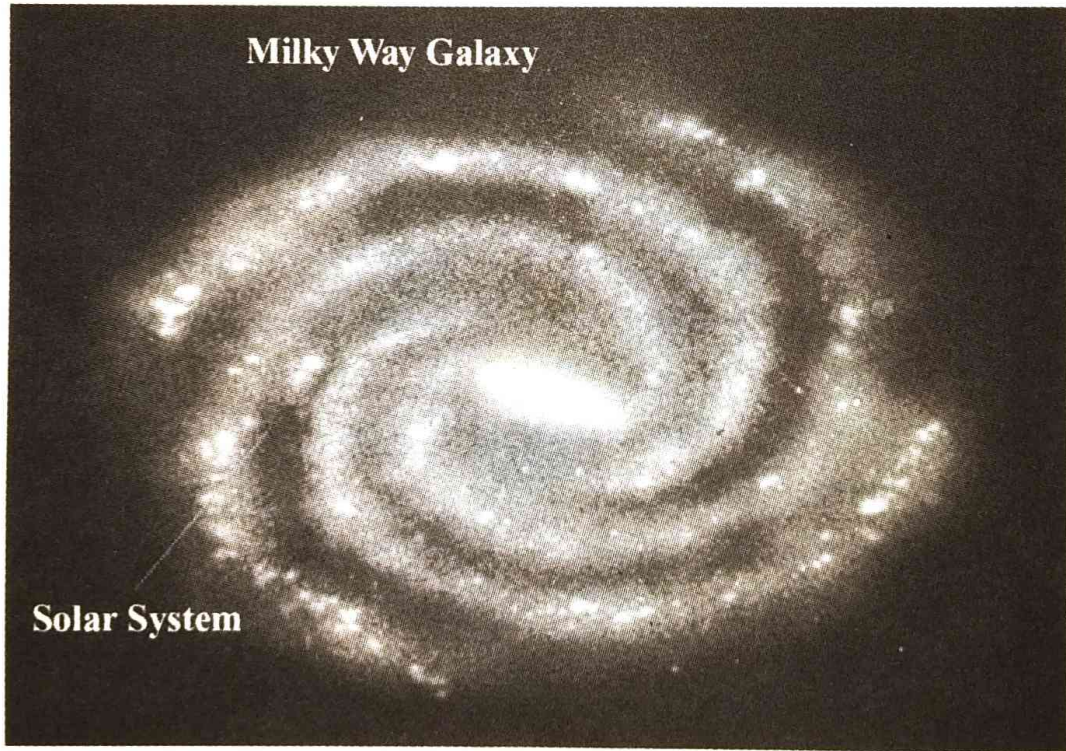
আমাদের আকাশগঙ্গা বা মিল্কিওয়ে তারামণ্ডলী। এটি একটি চারটি বাহু-বিশিষ্ট স্পাইরাল গ্যালাক্সি। ব্রহ্মাণ্ডের দশ হাজার কোটি তারামণ্ডলীর একটি। আকাশগঙ্গায় চল্লিশ হাজার কোটি তারার অবস্থান। আমাদের সূর্য তাদের মধ্যে মাঝামাঝি আকারের একটি তারা।

(শিল্পীর তুলিতে) সরাসরি আকাশগঙ্গার ছবিতোলা অসম্ভব। ছবি তুলতে যাওয়া দরকার আকাশগঙ্গার চৌহদ্দির বাইরে। কয়েক লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে।

আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের ১০,০০০ কোটি (দশ হাজার কোটি) (100 Billion) তারামণ্ডলি আছে। আমাদের তারামণ্ডলি যার নাম মিল্কিওয়ে (Milky way) তাঁদেরই একটি। আর আমাদের এই মিল্কিওয়েতে প্রায় ৪০,০০০ কোটি (চল্লিশ হাজার কোটি) (400 billion) তারা আছে। আমাদের সূর্যের থেকে যেমন অনেক ছোট তারাও আছে আবার অনেক বড় তারাও আছে। মিল্কিওয়ের এই ৪০,০০০ কোটি তারার মধ্যে মাঝারি মাপের একটি তারা আমাদের এই সূর্য। আর মিল্কিওয়ের সীমান্তে ৪টি বাহুর মধ্যে একটিতে আমাদের বাসস্থান। পৃথিবী সূর্যের, আজপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত ৮টি গ্রহের মধ্যে এই সংসারে তৃতীয় নিকটবর্ত্তী মাঝামাঝি আকারের একটি গ্রহ।

কি বিশাল ব্যাপার। চিন্তা করা যায় না। এর পরেও আরো বিস্মিত হতে হয় মহাকাশ বিজ্ঞান যখন বলে এই সবই কিন্তু বিশ্বের মাত্র ৫ শতাংশ। বাকী ৯৫ শতাংশ হল যা আমরা দেখতে পাই না। এদের উপস্থিতি সদ্য প্রমাণিত হয়েছে। এদের বলা হয় অন্ধকার বস্তু (DARK MATTER) । অন্ধকার শক্তি (Dark energy) যা রয়েছে আবিষ্কারের অপেক্ষায়।

মহাকাশ বিজ্ঞান বাস্তবের সত্য পরিচয়ের উন্মোচনে ব্রতী। বাস্তবের গভীর রহস্য অদ্যপি মানুষের অগোচরে। আধুনিক মহাকাশ বিজ্ঞানের মতে আমরা যা দেখি, যা শুনি এমনকি যা উপলব্ধি করি তা হয়ত বাস্তব নয়।

না জানি কত বৈজ্ঞানিকের অক্লান্ত পরিশ্রমে, অনন্য সাধনার ফলে এই বিশ্ব পরিচয়ের একটা একটা করে পাতা উল্টানো হয়েছে কয়েক শত বছর ধরে। এখনও শেষ পাতা উল্টানোর অনেক বাকি। তবুও উল্টানো পাতাগুলোর মধ্যে থেকেও আমরা আজ জানি প্রকৃতি কত বিচিত্র, অকল্পনীয় এর বিস্তার। ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম কণা হতে শুরু করে বিশাল থেকে বিশালতর আকাশ এর পরিমাপ।

আকাশ আর সময় অবিচ্ছিন্ন। সময় ছাড়া আকাশ অবাস্তব আবার আকাশ ছাড়া সময় অবাস্তব। আকাশ আর সময় নির্দিষ্ট নয়। Absolute নয়। এ দুটিই পরিবর্ত্তনশীল। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এঁদের পরিমাপের ও পরিমাণের পরিবর্তন সম্ভব।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এই সব ব্যাপারে কিছুটা আলোকপাতের চেষ্টা এই বই-এর উপলক্ষ্য। বিজ্ঞানের সম্যক জ্ঞান নেই এমন পাঠকও যেন এই বহ্মাণ্ডের, এই বিশ্বজগতের কিছুটা পরিচয় পেতে পারেন তারই চেষ্টার ফলশ্রুতি হিসাবে এই বই।

বইটিতে পাঠকদের নিয়ে যাবার চেষ্টা করব মহাকাশের বিচিত্র জগতের আঙিনায়। মহাকাশপথের দিশারী হয়ে যথাসাধ্য বাস্তব ঠিকানার সন্ধান দেবার চেষ্টা করব। আধুনিক কসমোলজির সূত্র ধরে সব তথ্য আলোচনা করব। কিছু সূত্র পরীক্ষিত ভাবে প্রমাণিত। কিছু সূত্র আংশিক ভাবে প্রমাণিত। কিছু সূত্র সম্পূর্ণ আনুমানিক, রয়েছে প্রমাণের অপেক্ষায়। কিছু সূত্র একেবারেই কাল্পনিক অথচ যুক্তিসংগত। এই সূত্রগুলিকে অনুসরণ করে যথাসম্ভব চেষ্টা করব আকাশ আর সময় দিয়ে তৈরী ব্রহ্মাণ্ডের কাঠামোটিকে স্পর্শ করার।

প্রথম অধ্যায়

"প্রাথমিক পরিচয়"

রবিবার সকালবেলায় ছাদে আরামকেদারায় উপবিষ্ট আপনি।

"সুপ্রভাত দাদা"

এস এস সেলিম। তোমার আগমনে আমার এই প্রভাত সত্যিই সুপ্রভাত হল।

সে না হয় হল। কিন্তু দাদা আমার নাম সেলিম কবে থেকে হলো?

জান সেলিম কাল রাত্রে আমি একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম। আমি দেখলাম আমার আত্মা নয়, আমি সশরীরে তোমাদের ছাড়িয়ে, পৃথিবী ছাড়িয়ে অনেক অনেক উপরে উঠে যাচ্ছি।

দাদা, গতরাত্রে টিভিতে আলমগির দেখাচ্ছিল নাকি? জয়ন্তের প্রশ্ন।

থাম থাম বন্ধু। মুড নষ্ট কর না। ঘুম ভাঙ্গার পরও স্বপ্নের রেশটা ছিল। আজ রোববার। সূর্যিমামার দিন। মামাকে প্রণাম করার জন্য তাই মামার উদয়ের আগেই বসে আছি। অপেক্ষায়।

কাল রাত্রে একটা পুরোনো কল্প বিজ্ঞানের (Science fiction) সিনেমা দেখাছিলাম টিভিতে। ভাবছিলাম বিগতকালে যা ছিল কল্পবিজ্ঞান তা অনেকটাই আজ বাস্তব।

আইনস্টাইন বলেছিলেন না Imagination is more important than knowledge.

কল্পনা জ্ঞানের থেকেও দরকারী। প্রয়োজনের তুলাদণ্ডে কল্পনা জ্ঞানের তুলনায় গুরুভর। মনে পড়ছে রবি ঠাকুরকে।

"সীমার মাঝে, অসীম, তুমি বাজাও আপন সুর" দেখ জয়ন্ত আমাদের সীমিত জ্ঞানের মধ্যেও জগতের অসীমত্তের কিছুটা আভাস আমরা পাই বিজ্ঞান, বিশেষ করে মহাকাশ বিজ্ঞান তথা cosmology-র দৌলতে।

স্বপ্নে দেখলাম আমার অবাধ বিচরণ আকাশ আর সময়ের তৈরী বিশ্ব মঞ্চের অভ্যন্তরে। বিচরণ তারাদের মধ্যে, তারামণ্ডলীর মধ্যে গ্রহ হতে গ্রহান্তরে। সাদা বামন তারা (White dwarf star), খয়েরী তারা (Brown star), লাল

দৈত্য তারা (Red giant star), নিউট্রন তারাদের মধ্যে। বিচরণ করেছি ব্লাক হোলের ধারে পাশে যেখানের আকাশ ভীষণভাবে দোমড়ান, মোচড়ান। সময়ের ধারা সেখানে ধীর। অকল্পনীয়ভাবে ধীর। শিহরীত হয়ে বলি জয়ন্ত দেখলাম সময় সেখানে স্থির। yes yes জয়ন্ত বিশ্বাস কর সময় স্থির। Time stands still.

স্বপ্নে দেখলাম বিগ ব্যাঙে (Big Bang)-এ বিন্দু হতে বিশ্বের উদভব। সময় আর আকাশের যাত্রারম্ভ। ক্ষুদ্র কণা (particles), অনু, পরমাণুর উৎপত্তি। মহাকাশীয় গ্যাস মূলত হাইড্রোজেন এবং কিছু পরিমাণ হিলিয়াম গ্যাসের উৎপাদন। সংকুচিত গ্যাসে গঠিত নিহারিকার আবির্ভাব। নিহারীকার (NEBULA) সংকোচনে তারার জন্ম। তারামণ্ডলীর জন্ম।

জয়ন্ত এর পর কি দেখলাম জান? দেখলাম মাধ্যাকর্ষণের দাপট। প্রচণ্ডভাবে সংকুচিত হতে থাকে একটি সম্পূর্ণ তারামণ্ডলী। কোথাও বা সংকুচিত হতে থাকে সম্মিলিতভাবে কয়েকটি তারা-মণ্ডলী। সংকোচনের সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে মাধ্যাকর্ষণ। বাড়তে থাকে মাধ্যাকর্ষণের দাপট। বাড়তে থাকে উত্তাপ। প্রখর উত্তাপে বিশ্ব গগন আলোয় উদ্ভাসিত করে আত্মপ্রকাশ করে বিশ্বের প্রথম কোয়াসের (QUASAR)। একই লগ্নে জন্ম নেয় বিশ্বের বিস্ময় একনায়কত্বের সাম্রাজ্য ব্লাক হোল। নায়ক মাধ্যাকর্ষণ।

জয়ন্ত, ব্লাকহোলের পারিপার্শ্বিক জায়গাতে দৃষ্টি অর্থহীন। আমি আমার সামনের জিনিষ দেখছিলাম না। সেখানে আলোর গতিপথ ভীষণভাবে বক্র। সমস্ত কিছুই তীব্র গতিতে ঘূর্ণীয়মান। ব্লাকহোলের অতল গহ্বরের দিকে আমাদের বিশ্ব হতে উধাও হওয়ার জন্যে ধাবিত।

আপনি বলে চল্লেন 'আরো কত কি দেখলাম। দেখলাম গামা রে বিস্ফোরণ। একটি মাত্র দিশায় (স্পট লাইটের মত) বিশাল শক্তির বহিঃপ্রকাশ।

দেখলাম বিশ্বের অন্যতম সর্ব্বাধিক উজ্জ্বল স্পন্দিত আলোর দ্যুতি পালসার (PULSAR) । আলোর পাল্‌সের উৎস একটি প্রচণ্ডভাবে ঘূর্ণীয়মান নিউট্রন স্টার।

আরো দেখলাম দুটি বিশাল ব্লাকহোলের সংঘর্ষ। দুটি নক্ষত্রমণ্ডলীর সংঘর্ষ। দেখলাম একটি নক্ষত্রের পূর্ণ বিলাস। ভীষণভাবে চমকে উঠলাম আকাশ বিদীর্ণ করা ভয়ঙ্কর সুপারনোভা বিস্ফোরণে।

বিস্ফোরণের ভগ্নাশেষ সম্মিলিতভাবে তৈরি করল নতুন তারা। নতুন তারামণ্ডলী। নতুন গ্রহ। নতুন উপগ্রহ। যেমন আমাদের মা বসুন্ধরা।

দলচ্যুত ভগ্নাশেষে তৈরি হল COMET বা ধুমকেতু। ধুমকেতুরা তাদের বাসস্থানভাবে বেছে নিল নেপচুন আর প্লুটোর মধ্যবর্তী স্থান। ''কি-পার' বেল্ট তৈরি হতে দেখলাম। (Kuiper Belt Pronounced ki-per)

—জয়ন্ত, অবাক হয়ে দেখলাম সৌরমণ্ডল গঠিত হওয়ার পর মঙ্গল আর বৃহস্পতির কক্ষের মধ্যবর্তী স্থানে তৈরী হল astoriods belt। গ্রহণাপুঞ্জের বাসস্থান। বহু এ্যসটোরয়েড কক্ষ্যচ্যুতভাবে বিচরণ করে বেড়ায় সৌর জগতের আকাশে। অনেকে আবার পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের আকর্ষণে প্রবেশ করে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে। বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে ঘর্ষণে উত্তপ্ত হয়ে জ্বলে উঠে টুকরো টুকরো হয়ে যায় গ্রহণাপুঞ্জ।

স্বপ্নে দেখলাম ৬ কোটি ৫০ লক্ষ বছর আগে এক প্রকাণ্ড উল্কার পৃথিবীর মাটিতে আছাড় মারার দৃশ্য। জ্বলে ওঠে পৃথিবী। সাগর শুকিয়ে যায়। নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় অধিকাংশ জীবজন্তু, গাছপালা, পশুপাখী। শেষ হয় ডাইনোসরসের রাজত্ব।

স্বপ্নে আরো দেখলাম আমাদের সাধের সূর্যের জীবনাবসান। আমাদের নক্ষত্রমণ্ডলী, দুধের রাস্তা, মিল্কিওয়ে বা আকাশগঙ্গার জীবনাবসান। আবার নতুন নক্ষত্রমণ্ডলীর জন্ম।

ভাঙ্গা-গড়ার আজব দুনিয়া। প্রলয় আর সৃষ্টির সহ অবস্থান। কোথাও বা শত কোটি সূর্যের ঔজ্জ্বল্যে আলোকিত জগৎ। আবার কোথাও বা পূর্ণ অন্ধকারে অদৃশ্য জগৎ।

দেখলাম চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারার মত আমাদের বিশ্বের আকার একটি গোলক নয়। বিশ্বের আকার Flat, চ্যাপ্টা। আয়তনে অসীম বিশ্ব। সামনে পেছনে, ডাইনে বাঁয়ে, ওপরে নিচে দূরত্ব অসীম।

আর জান জয়ন্ত, আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, 'এই সব ঘটনার পেছনের কারণ কি সেটিও জানতে পারলাম। কি সেই শক্তি? কি সেই অবস্থা? এই সব দেখলাম।

তাই বসে বসে ভাবছিলাম, এই সবই কি সত্যি? না কাকতলীয়? না অবশ্যম্ভাবী? বিশ্বের ভবিষ্যত কি তবে নিদৃষ্ট?

জয়ন্ত উঠে দাঁড়িয়ে বলল ''থামুন থামুন দাদা। আপনার কথায় সক্কাল বেলায় মাথা ভোঁ ভোঁ করছে। কি সব বলছেন তার কিছুই ঢুকছে না ঘিলুতে। ঘিলু যায় ভেস্তে। গজান বুদ্ধির ঘিলুর অবস্থা প্রায় কাহিল।

আপনার উপদেশ 'পড় জয়ন্ত। পড়াশুনা কর সামান্য। কসমোলজির প্রেমে পড়।"

যে ঘটনাগুলো বললাম জানতে চাওনা কি ঘটলো? আগ্রহ হয় না তোমার বিশ্বটির পরিচয় জানতে? জানতে চাও না বিশ্বের আকার কি? তার বয়স কত? তার আয়তন, তার জন্মবৃত্তান্ত, তার ভবিষ্যত? ইচ্ছে হয় না এই সব জানতে?

কসমোলজির প্রেমে সবকিছুরই একটা ছবি পাবে।

বুঝতে পারবে কত অর্থহীন আমাদের জাতিভেদ। কত অর্থহীন, যুদ্ধ, দ্বন্দ্ব। মরণাস্ত্রের উদ্ভাবনে কত অর্থের অপচয়। মন পিড়ীত হবে অর্থ আর সময়ের দুর্ব্যবহারে।

বিশ্বের পটভূমিকায় পৃথিবীর ক্ষুদ্রতায়, সূর্যের ক্ষুদ্রতায়, এমনকি আমাদের তারামণ্ডলী আকাশগঙ্গার ক্ষুদ্রতায় হয়ত বা নগণ্য মনে হবে নিজেকে।

আবার উজ্জীবিত হবে মানুষের জ্ঞানের বহরে। মানুষের জ্ঞানলাভের দুর্বার পিপাসায়।

হয়ত কোনদিন এক আমাবস্যার রাত্রে মুক্ত আকাশে লক্ষ্য তারার আলোয় স্নান করবে। ভাববে আলোর বাহক যে ফোটন কণাগুলির দ্বারা তুমি স্নাত হচ্ছ সেইগুলির জন্ম-ক্ষণ হাজার কোটি বছর আগে। আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের অতি বাল্য অবস্থায়।

সেই সময়কার কোন তারা হতে উৎক্ষিপ্ত ফোটন কণাগুলি হাজার কোটি বছর ধরে অসীম দূরত্ব অতিক্রান্তে স্পর্শ করছে তোমায়।

তোমার সদ্যপ্রাপ্ত কসমোলজির জ্ঞানের দৌলতে তুমি সেই স্পর্শ অনুভব করবে। শিহরিত হবে। রোমাঞ্চিত হবে। বিশ্বাস কর জয়ন্ত, সে এক অনাস্বাদিত শিহরণ। অনির্বচনীয় রোমাঞ্চ।

দেখবে, দূর হবে মনের সংকীর্ণতা। উদার হবে। জিজ্ঞাসু হবে। অসীমত্বতার একটা আভাস পাবে।

জয়ন্ত তুমি এক উৎকৃষ্ট বিশ্বনাগরিক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবে।

তাই আমার উপদেশ...প্রেমে পড়। জয়ন্ত, প্রেমে পড় কসমোলজির।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মহাকাশ বিজ্ঞানের আদি পর্ব্ব

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর আপনার বক্তব্য রাখলেন। "জান জয়ন্ত, আমাদের সূর্য, পৃথিবী, চন্দ্র সবই একদিন বিনাশপ্রাপ্ত হবে। তবে নিকট ভবিষ্যতে ভয়ের কোন কারণ নেই। ধংসের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে প্রায় ৮০০ কোটি বছর।

কি ভাবে বলবেন এই চিন্তার উপরান্তে আপনি আরম্ভ করলেন। বল্লেন, "মানব সভ্যতার প্রথমদিকেই মানুষ লক্ষ্য করেছিল মহাকাশে সবকিছুই নিয়মমাফিক হয়। সূর্যদয়, সূর্যাস্ত, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, এমনকি তারা, নক্ষত্রদেরও নির্দিষ্ট গতি আছে। এই নির্দিষ্ট গতির সঙ্গে তাল রেখেই সময়ের একটা মাত্রা ঠিক করা হয়েছিল।

প্রাচ্য নয় জয়ন্ত, মধ্যপ্রাচ্যের ব্যাবিলিয়ানরা প্রথম ক্যালেণ্ডার তৈরী করেছিলেন। যে পাঁচটি গ্রহ খালি চোখে দেখা যায় সেগুলি প্রথম এঁরাই আবিষ্কার করেছিলেন। এই পাঁচটি গ্রহ হল বুধ (MERCURY), শুক্র (VENAUS), মঙ্গল (MARS), বৃহস্পতি (JUPITER) আর শনি (SATURN)। রাত্রের আকাশে যে সবকটিই তারা নয় এটা পরিষ্কার হয়।

খালি চোখে যে কোন পরিষ্কার রাত্রে প্রায় ৫০০০ তারা দেখা যায়। এর মধ্যে পাঁচটিকে খুঁজে বার করা সহজ ব্যাপার ছিল না।

প্রমাণ পাওয়া গেছে যে খ্রিস্টপূর্ব্ব ৪০০০ বিভিন্ন প্রাচীন সভ্যতার মানুষেরা তারাদের বিশেষ করে উজ্জ্বল তারাদের শ্রেণীবদ্ধ করেছিলেন। এতে বিশেষ বিশেষ তারাদের চিহ্নিত করা সহজ হয়েছিল। এক একটি শ্রেণীর তারাদেরই রাশি বলা হয়। এই সব রাশিদের এক একটি করে কাল্পনিক নামকরণ করা হয়েছিল। বিভিন্ন জন্তুজানোয়ার, দেবদেবী এমনকি নিত্য ব্যবহার্য জিনিষ যেমন ফুলদানী, দাঁড়িপাল্লা ইত্যাদির নামানুসারে এই রাশিগুলির নামকরণ করা হয়েছিল। দ্বিতীয় শতাব্দীতে মিশরীয় মহাকাশ বৈজ্ঞানিক টলেমি (PTOLEMI) সূর্যের বার্ষিক গতিপথের (তখন ধারণা ছিল ভূকেন্দ্রিক জগৎ (GEOCENTRIC

UNIVERSE) নিকটস্থিত ১২টি উজ্জ্বল তারাগুচ্ছের বছরের ১২ মাসের অবস্থান অনুযায়ী ১২টি রাশির নামকরণ করেছিলেন।

এর পর ক্রমে ক্রমে নতুন নতুন তারার আবিষ্কার হতে থাকে। উত্তর আর দক্ষিণ মেরু অভিযানের পর ওখান থেকেও অনেক নতুন তারা আবিষ্কৃত হয়। এই সব তারাদেরও বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করে নতুন সব রাশির নামকরণ করা হয়েছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে INTERNATIONAL ASTRONOMICAL UNION ১৩০০টি তারার সমষ্টি নিয়ে ৮৮ রাশি নির্দিষ্ট করেছে। এখনও পর্য্যন্ত এর কোন পরিবর্ত্তন হয়নি।

ব্যাবিলিয়ানিক সভ্যতার বিকাশ খৃষ্টপূর্ব্ব ১৪শ থেকে ৬শ বৎসর পর্যন্ত। ইরাককে আগে ব্যারিলিয়ন বলা হত। ব্যাবিলিয়নিরা আর মেসোপটেমিয়ানেরা মহাকাশবিজ্ঞানে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। গ্রীসিয়ানেরা এঁদের কাছে মহাকাশ-বিজ্ঞানের অনেক কিছু শিখেছিলেন। তারপর গ্রীসের অনেক বৈজ্ঞানিক যেমন এ্যারিস্টারচুস (Aristarchus) (310-250 B.C.)-এরিস্টোটল (ARISTOTLE 385-322 B.C) আর বিখ্যাত আরকিমেডিস (ARCHIMEDES 287-212 B.C) মহাকাশবিজ্ঞানকে অনেকটাই এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন।

এ্যারিস্টোটল বিখ্যাত আলেকজাণ্ডারের (ALEXANDER THE GREAT 356-323B.C) শিক্ষাগুরু ছিলেন। আলেকজাণ্ডার তাঁর শিক্ষাগুরুর কাছে মহাকাশবিজ্ঞানের অনেককিছু শিখেছিলেন।

আলেকজাণ্ডার যখন তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্যে পারস্য থেকে আরম্ভ করে মিশর, মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশ হয়ে ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত এসেছিলেন তখন এই সব দেশের মনীষীরা গ্রীসিয়ানদের কাছ থেকে মহাকাশবিজ্ঞানে তাঁদের জ্ঞানকে অনেক সমৃদ্ধ করেছিলেন। ভারতবর্ষ থেকে ক্রমে ক্রমে চিন, জাপান ও অন্যান্য সব এশিয়াদেশগুলিতে এই বিদ্যার প্রসার লাভ হয়। অবশ্য আলোকজাণ্ডারের বেশ কয়েক বছর পূর্ব্বেই ভারতবর্ষে মহাকাশ বিদ্যার চর্চ্চা ছিল। উল্লেখযোগ্য পাণ্ডিত্যও ছিল। এই সম্বন্ধে তোমায় পরে অন্য একদিন বলব।

জান জয়ন্ত, মিশরের টলেমির সময় থেকে ২০০০ বছর পর্য্যন্ত তাঁর ভূকেন্দ্রিক জগতের মতবাদের কোন প্রতিবাদ হয়নি। প্রথম প্রতিবাদ করেছিলেন গ্রীসের বৈজ্ঞানিক এ্যারিস্টারচুস। বলেছিলেন জগৎ ভূকেন্দ্রিক নয়। জগৎ সূর্যকেন্দ্রিক। সূর্য স্থির। পৃথিবী, অন্যান্য গ্রহগুলি আর তারারা সবই সূর্যের চারপাশে আবর্তমান। দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁর সমস্ত লেখাই বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

আরকিমেডিসের লেখা থেকেই আমরা এ্যারিস্টারচুসের সূর্যকেন্দ্রিক মতবাদ সম্বন্ধে জানতে পার। আরকিমেডিসও সূর্যকেন্দ্রিক জগতের স্বপক্ষে তাঁর রায় দিয়ে গিয়েছিলেন। এই দুই বৈজ্ঞানিকের মতবাদকে তৎকালীন অন্যান্য বৈজ্ঞানিকরা অমান্য করেছিলেন।

বিগত ২০০০ বছরের সুপ্রতিষ্ঠিত অথচ সম্পূর্ণ ভুল ধারণার জোরালো প্রতিবাদ করেছিলেন তাঁর নতুন সূত্র আর অকাট্য যুক্তি দিয়ে অন্য কেউ নন...মহাকাশ বিজ্ঞানের বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকদের অন্যতম বৈজ্ঞানিক পোলাণ্ডের নিকলাস কোপারনিকাস (NICOLAUS COPERNICUS, 1473-1543)
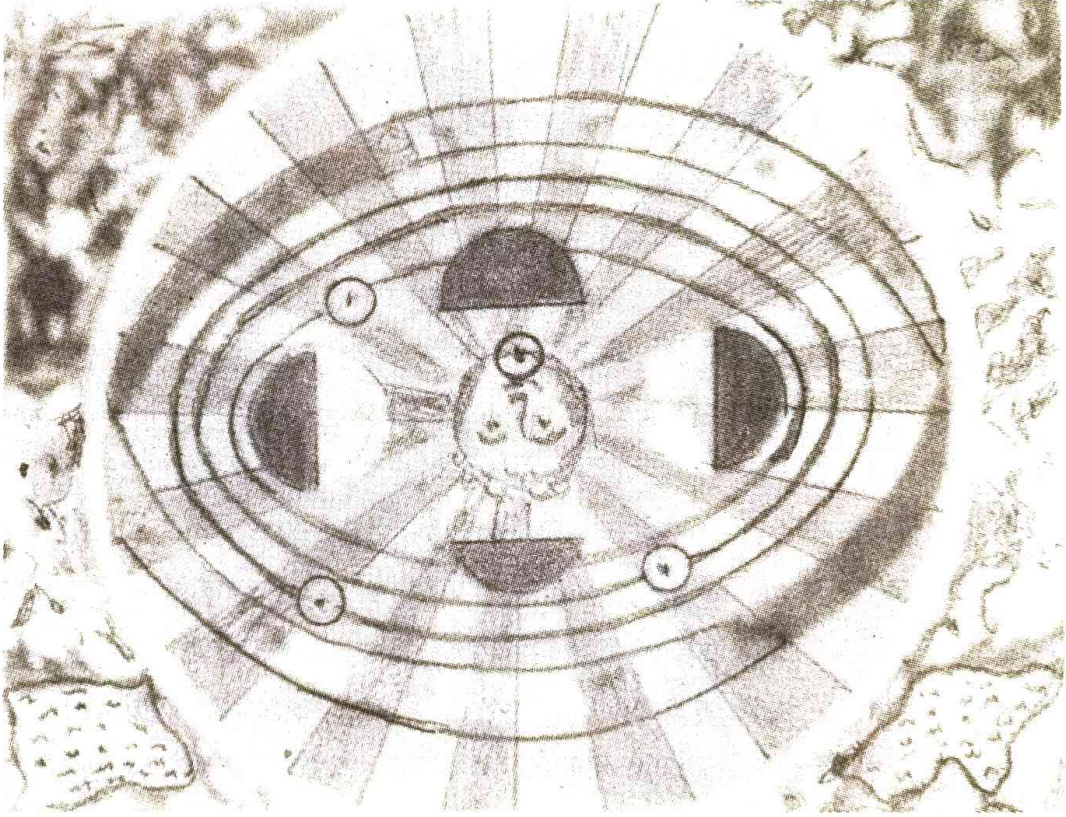
নিকলাস কোপারনিকাসের সূর্য কেন্দ্রিক জগত

মোটেই সহজ ছিল না এ কাজ। পাশ্চাত্ত্য সমাজে তখন চার্চের পূর্ণ আধিপত্য। চার্চের কথাই শেষ কথা। চার্চের মতবাদ শেষ মতবাদ। যে কোন সূত্র, যে কোন মতবাদের গ্রহণযোগ্যতার মাপকাঠি ছিল চার্চের স্বীকৃতি। কোপারনিকাস চার্চেই কাজ করতেন। চার্চের আধিপত্যতা ও যাজকশ্রেণীর বিরুদ্ধাচরণ করার ফলাফল তিনি খুব ভালভাবেই জানতেন। যথেষ্ট তিরস্কৃতও হয়েছিলেন তিনি। তাঁর সূর্যকেন্দ্রিক জগৎ সম্বন্ধীয় বইটি ক্যাথলিক চার্চ প্রত্যাখ্যান (BANNED) করেছিল তিনশ বছর পর্য্যন্ত। কোপারনিকাস তাঁর

সূর্যকেন্দ্রিক সূত্র দিয়ে (HOLIOCENTRIC THEORY) কিছু কিছু গ্রহের অস্থির গতির কারণ বিশ্লেষণ করতে সফল হয়েছিলেন।

ইটালির সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক গ্যালিলিও (GALILIO 1564-1642) দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করেন ১৬০৯ খ্রিস্টাব্দে। এই যন্ত্রের সাহায্যে তিনি সৌরকলঙ্ক (SUN SPOT), চাঁদের পাহাড়, চাঁদের উপত্যকা, গ্রহ বৃহস্পতির চারটি বড় উপগ্রহ (এখনও পর্য্যন্ত বৃহষ্পতির ছোট বড় মিলিয়ে ৩৯ টি উপগ্রহ আবিষ্কৃত হয়েছে। ভাবা যায়? না জানি বৃহস্পতির আকাশ কতই না রমণীয়। উনচল্লিশটি চাঁদ আকাশময় ছড়িয়ে আছে।) শুক্রগ্রহের চাঁদের মত কলা আবিষ্কার করেছিলেন। পদার্থ বিজ্ঞানেও গ্যালিলিও তাঁর অসামান্য আবেদন রেখে গেছেন। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে প্রমাণ করেছিলেন, বলা উচিৎ দৃশ্যত প্রমাণ করেছিলেন কোপারনিকাসের সূর্য-কেন্দ্রিক জগতের সূত্র।

দেখ জয়ন্ত, কি আশ্চর্য মানুষের ধর্মীয় গোঁড়ামি। জলের মত পরিষ্কারভাবে তাঁদের সূর্যকেন্দ্রিক জগতের আবিষ্কার প্রমাণ করে দেবার পর-ও তৎকালীন রোমান ক্যাথিলিক চার্চ তাঁদের ধারণার বিরুদ্ধাচরণ করার অপরাধে গ্যালিলিওকে তাঁর শেষ বয়সে যাবৎজীবন গৃহবন্দীর শাস্তি প্রদান করে। ভাবতে পার কত বড় দুঃখজনক ও বেদনাদায়ক ঘটনা যে মহান এক বৈজ্ঞানিক বন্দীদশায় মৃত্যু বরণ করেন। প্রায় ৩৫০ বছর পরে ভাটিক্যানের রোমান ক্যাথলিক চার্চ তাঁদের ভুল স্বীকার করে ১৯৯২ সালে। Better late than never।

জয়ন্ত লক্ষ্য করেছ কি তুমি? একদিকে ধর্মান্ধতা, ধর্মীয় গোঁড়ামি আর কোন কোন ক্ষেত্রে সামাজিক দায়বদ্ধতা যেমন বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে মন্থর করেছে অন্যদিকে আবার সুপ্রতিষ্ঠিত অথচ ভুল সূত্র বা ভুল ধারণাকে পরিত্যাগ করে সঠিক সূত্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্যই বিজ্ঞানের অগ্রগতি ত্বরান্বিত হয়েছে। গ্যালিলিওর কিছুকাল পরেই মহাকাশ বিজ্ঞানের জগতে দুই দিকপালের আবির্ভাব হয়েছিল। জার্মানির যোহান্স কেপলার (JOHANNES KEPLER 1571-1630) আর ইংল্যাণ্ডের স্যার আইজাক নিউটন (SIR ISAC NEWTON 1642-1727) ।

আধুনিক মহাকাশ বিজ্ঞান যে সব সূত্রগুলির ওপর ভর করে দাঁড়িয়ে রয়েছে কেপলার সাহেবের গ্রহাদির সূত্রগুলি (LAWS OF PLANETORY MOTION) তাদের অন্যতম। তাঁর তিনটি সূত্র আজ প্রায় ৪শ বছরেও অপরিবর্তিত। কেপলার সাহেবই প্রথম প্রমাণ করেন যে গ্রহগুলি সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে, বৃত্তাকার কক্ষে নয়। এদের সঠিক কক্ষ হল উপবৃত্তাকার (ELLIPTICAL)।
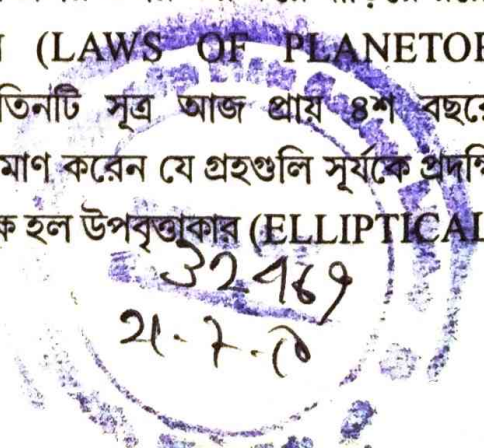
কেপলার সাহেবের গ্রহাদির গতি সম্বন্ধীয় তিনটি সমীকরণ আবিষ্কার তৎকালীন জ্যোতিবিদ্যার জ্ঞানে এ এক বিশাল সংযোজন। বলতে পারা যায় জয়ন্ত আধুনিক কসমোলজির জ্ঞানের দরজার সন্ধান তিনি উপহার দিয়েছিলেন মানব সভ্যতাকে।

এরপর বলতে পার বন্ধু, সেই মহান বিজ্ঞানীর নাম যিনি এই দ্বারটি উন্মোচিত করেছিলেন?

জয়ন্তর উত্তর :— স্যার আইজাক নিউটন?

আপনার জবাব :— আবার কে My friend? এইখানে আর কারও নাম আমি তো চিন্তাও করতে পারি না বন্ধু।

তৃতীয় অধ্যায়

জ্ঞানের আকাশে একটি জ্যোতিষ্ক "স্যার নিউটন"

আপনি উঠে দাঁড়িয়ে, চিন্তান্বিত মুখে ছাদময় পদচারণা করলেন সামান্য। জয়ন্ত উন্মুখভাবে অপেক্ষা করতে থাকল আপনার পরবর্ত্তী কথা শোনার জন্যে। চেয়ারে বসতে বসতে আপনি আপনার বক্তব্য আরম্ভ করলেন আবার।

বল্লেন 'জান জয়ন্ত! সর্ব্বকালের মহাকাশ বৈজ্ঞানিকদের সভায় যদি দুটি সভারত্নের নাম করতে হয় তবে একজন হলেন ইংল্যাণ্ডের স্যার আইজাক নিউটন আর অপরজন হলেন আমেরিকার এ্যালবার্ট আইনস্টাইন (ALBERT EINSTEIN 1879-1879-1955)।

বিজ্ঞানে এঁদের অবদান এতটাই যে অতীতের সমস্ত ভুল ধারণা, ভুল সূত্র, বহু কুসংস্কার, ধর্মীয় গোঁড়ামি ধুলিসাৎ হয়ে যায় এঁদের অকাট্য যুক্তি, অভ্রান্ত মতবাদ আর নির্ভুল সূত্রের কাছে। বিজ্ঞানের দুনিয়ায় নতুন যুগের সূচনা করেছিলেন এই দুই দিকপাল। মানুষের ক্রমবর্দ্ধমান বিজ্ঞানের জ্ঞানকে ধাপে ধাপে অনেকটাই এগিয়ে দিয়েছিলেন এই দুই বৈজ্ঞানিক। এর ফলে মানুষ বিজ্ঞানের প্রতি অনেক বেশি আকৃষ্ট হয়েছিল। বিজ্ঞানের চর্চা বেড়েছিল। নতুন নতুন দিগন্তের উন্মোচন হয়েছিল, বিজ্ঞান তথা উন্নতির গতি ত্বরান্বিত হয়েছিল শতগুণ।

নিউটন সাহেবের গতি সূত্র (LAWS OF MOTION) আর সর্ব্বজনীন মহাকর্ষ সূত্র (LAWS OF UNIVERSAL GRAVITATION) বিজ্ঞানের জগতে যুগান্তকারী আবিষ্কার। তিনশ বছর এই সূত্রগুলির কোনরকম খুঁত ধরা পড়েনি। এই সূত্রগুলির সত্যতা বার বার প্রমাণিত হয় আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে। হাত দিয়ে কিছুকে চাপ দিলে হাতে চাপ লাগে। কাউকে বা কোনকিছুকে ঠ্যালা দিলে তাতে গতির সঞ্চার হয়। গাছ থেকে আপেল পৃথিবীতেই পড়ে। মহাকাশে বিলীন হয়ে যায় না। গ্রহগুলি সব সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। নিজ নিজ কক্ষ থেকে কেউই বিচ্যুত হয় না। চাঁদ পৃথিবীর চারপাশে আবর্তমান। এমন কি মানুষের নিক্ষিপ্ত উপগ্রহগুলিও পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে

তাদের নির্দিষ্ট কক্ষে। এইসব ঘটনাই নিউটন সাহেবের সূত্রের প্রমাণ।

পদার্থ বিজ্ঞানে আলোর ওপরেও তাঁর অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে। সাদা আলো যে সাতটি রামধনু রঙের সমষ্টি এটি তাঁরই আবিষ্কার। নিউটন প্রতিফলিত দূরবীন যন্ত্রেরও (Reflective telescope) আবিষ্কারক। প্রতিসৃত দূরবীনের (Refractive telescope) বেশ কিছু ত্রুটি ছিল না এই যন্ত্রে। দামে সস্তা, ওজনে কম, আকারে ছোট, কাজে ভাল। বিখ্যাত হবল স্পেস টেলিস্কোপটিও একটি অধিবৃত্তাকার দর্পণযুক্ত (Parabolic reflector telescope) দূরবীক্ষণ যন্ত্র।

গণিত শাস্ত্রে নিউটনের অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। উচ্চ গণিতের এক বিশেষ দিক ''ক্যালকুলাস'' তিনিই আবিষ্কার করেছিলেন। উল্লেখ করা উচিত জার্মানির গটফ্রায়েড উইলহেম লায়েবনিথসও (Gottfried wilhelm Leibniz) একই সময় ক্যালকুলাস আবিষ্কার করেছিলেন। বিজ্ঞানের অসংখ্য সূত্রের আবিষ্কারের পেছনে ছিল ক্যালকুলাসের প্রয়োগ। বিজ্ঞানের এমন কোন শাখা নেই যেখানে ক্যালকুলাসের প্রয়োগ হয় না।

নিউটন রসায়ন শাস্ত্রেও অনেক কিছু লিখে গেছেন। এই সময়কার পদার্থবিদ্যার যুগকে ক্যাসিক্যাল ফিজিক্স হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

নিউটন ইংল্যাণ্ডের টাঁকশালের অধিকর্তা থাকার সময় মুদ্রা উৎপাদন প্রণালীতে এতটাই সুক্ষ্মতার প্রত্যাবর্তন করেছিলেন যে জাল মুদ্রা উৎপাদন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বেশ কিছু জালমুদ্রা উৎপাদকের হাতে ফাঁসির দড়িতে ঝোলার টিকিট ধরিয়ে দিয়েছিলেন তিনি।

জয়ন্ত বলে ওঠে ''দাদা ভারতবর্ষে একজন নিউটনের বিশেষ প্রয়োজন। তাই না?'' 'যা বলেছ বন্ধু'' আপনার উত্তর। ভারত নয় বল পৃথিবীতে।

নিউটন আর স্বতন্ত্র আকাশ
(Newton and Absolute Space)

কিছুক্ষণ মৌন থাকার পর আবার আপনি আপনার বক্তব্য রাখলেন। বল্লেন 'জান জয়ন্ত, আধুনিক বিজ্ঞানের জন্মক্ষণ বা সূত্রপাত ঠিক কোন সময় এই নিয়ে মতভেদ আছে। মতভেদ থাকাই স্বাভাবিক। তবে গ্যালিলিও, নিউটন, ম্যাক্স প্লাঙ্ক (Max Plank), লাইবনিতস্, কেপলার, হুকস্, হ্যালি ইত্যাদি বিজ্ঞানের মহারথি-সমুদয় তাঁদের অসামান্য অবদানে আধুনিক বিজ্ঞানের তরীটির পালে যে বাতাস লাগিয়েছিলেন এই সম্বন্ধে মতভেদের অবকাশ নেই।

ব্রহ্মাণ্ডের গতি বিষয়ক যে কোন প্রশ্নের উত্তর নিউটন তাঁর ৪টি সূত্রের

মধ্যে আবদ্ধ রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনটি সূত্র নিউটন লস অফ মোশেন আর একটি ল অফ ইউনিভারশাল গ্রাভিটেশন (Newton Laws of motion and law of universal Gravitation)। এ এক অনন্য কীর্তি। জগতের যাবতীয় বস্তুর গতির বিস্তারিত বিশ্লেষণ সম্ভব হয়েছিল এই ৪টি মাত্র সূত্রের সাহায্যে। পরবর্তীকালে আইনস্টাইন প্রমাণ করেছিলেন তত্ত্বীয়ভাবে নিউটনের সূত্রগুলির প্রয়োগে সঠিক উত্তর পাওয়া সম্ভব নয়। তবুও নিউটনের সূত্রগুলির প্রয়োগ তুলনামূলকভাবে অত্যন্ত সহজ। এই কারণেই আজও এই সূত্রগুলির বিশদ ব্যবহার করা হয় প্রতিনিয়ত। সেখানে গতি আলোর গতির তুলনায় নগণ্য (মানুষের তৈরী সর্বাধিক দ্রুতগতির রকেটের গতি ১০ মাইল প্রতি সেকেণ্ডে, আলোর গতি ১,৮৬,০০০ মাইল প্রতি সেকেণ্ডের তুলনায় নগণ্য)। সেখানে নিউটনের সূত্রের প্রয়োগে পাওয়া উত্তর ও সঠিক উত্তরের সঙ্গে তারতম্যও নগণ্য।

এই অবিস্মরণীয় কীর্তির পরও নিউটন এক গভীর সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর এই সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত তাঁর মহামূল্যবান সূত্রগুলির গ্রহণযোগ্যতা ব্যাহত হবে। স্যার আইজাক নিউটন আক্ষরিক অর্থে ছিলেন সত্যের পূজারী। নির্ভুলতা ছিল তাঁর জীবন-দর্শনের মূলমন্ত্র।

নিউটনের সমস্যা ছিল আপেক্ষিকতা। বিশেষভাবে উল্লেখ করা উচিৎ সমস্যা ছিল আপেক্ষিক গতি। (Relative motion)

জয়ন্ত তুমি তো জান আইনস্টাইনের অসামান্য খ্যাতির কারণ তাঁর আপেক্ষিক তত্ত্ব। (Relativity theory)। আপেক্ষিকতা সম্পর্কিত সবকিছুই আইনস্টাইনের সঙ্গে যুক্ত এই মতবাদে বিশ্বাসী সমস্ত বিশ্ববাসী। তথাপি ইংল্যাণ্ডের নিউটন, ইটালির গ্যালিলিও, অস্ট্রিয়ার আরনেস্ট্ ম্যাক, ফ্রান্সের রেনে ডেস্‌কারটেস ও তৎকালীন অন্যান্য অনেক বৈজ্ঞানিকেরা এই আপেক্ষিক সমস্যার সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তাঁদের সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করে গেছেন। বলা উচিত আপেক্ষিকতা সূত্রের বুনিয়াদটির ভিতর রচনায় তাঁরা অংশ নিয়েছিলেন।

যে কোন বস্তুর গতিই আপেক্ষিক গতি। আরো এক ধাপ এগিয়ে হয়ত বলা যায় জগতের অধিকাংশ জিনিষই আপেক্ষিক। ভালমন্দ, ক্ষুদ্র বৃহৎ, শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধার্ম্মিক অধার্ম্মিক, শীতল উষ্ণ, ধনী-গরীব, দুর্ব্বল শক্তিমান, আলো অন্ধকার, গতি স্থির সবই আপেক্ষিক। কার তুলনায় ভাল? কার তুলনায় মন্দ?

কার তুলনায় গতিশীল? কার তুলনায় স্থির? ইত্যাদি ইত্যাদি।

যখন বলা হয় গাড়ীর গতি ঘন্টায় ৬০ কিলোমিটার। কিসের তুলনায় ঘণ্টায় ৬০ কিলোমিটার? কার দৃষ্টিকোণ থেকে ঘণ্টায় ৬০ কিলোমিটার?

এই প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তর নিশ্চয়ই একটা। যে কোন স্থির বস্তুর পরিপেক্ষিতে। যে কোন গতিহীন বস্তুর তুলনায়। গাড়ী যে রাস্তায় চলছে সেই রাস্তার তুলনায়। রাস্তা স্থির।

রাস্তা স্থির? সত্যিই কি স্থির? পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে আবর্তমান। পৃথিবীর গতি ১৬৬৬ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায়।

যেমন গাড়ীতে উপবিষ্ট একজন গতিহীন নয়। গাড়ীর সঙ্গে সেও গতিশীল। অনুরূপ ভাবে বলা যায় রাস্তাও পৃথিবীর সঙ্গে গতিশীল। স্থির নয়। রাস্তার গতি পৃথিবীর গতির সমান। ১৬৬৬ মাইল প্রতি ঘণ্টায়। ভিন্ন কোন গ্রহবাসী কাছে গাড়ীটির গতি ঘণ্টায় ৬০ কিলোমিটার নয়। গাড়িটির গতি ১৬৬৬ কিলোমিটার আরও ৬০ কিলোমিটার। অর্থাৎ ১৭২৬ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায়।

গাড়ীটির গতি রাস্তার তুলনায় ৬০ কিঃ মিঃ প্রতি ঘণ্টায়। এই বক্তব্য সঠিক। আবার একটি বিপরীত-গামী-গাড়ী যার গতি ৩০ কিঃ মিঃ প্রতি ঘন্টায়। এই দ্বিতীয় গাড়ীটির পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম গাড়িটির গতি ঘন্টায় ৯০ কিঃ মিঃ। এই বক্তব্যও সম্পূর্ণ ভাবে সঠিক। এই যুক্তিতে বলা যায় গাড়ীর গতি ৬০ কিঃ মিঃ এই বক্তব্যের সীমাবদ্ধতা বর্তমান। নিউটন এই সীমাবদ্ধতা চাননি। তিনি চেয়েছিলেন এমন একটি জিনিষ যা স্থির। সর্বকালে, সর্ব্বক্ষণে, সর্ব্বস্থলে স্থির, অনড়, অটল। অনন্ত বিশ্বে যার অবস্থান। নিউটন চেয়েছিলেন তার সূত্রগুলি যেন মৌলিক সূত্র হয়। প্রযোজ্য হয় বিশ্বব্যাপী। ঠিক এই কারণেই তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করেন একটি সম্পূর্ণভাবে নতুন শব্দ "স্বতন্ত্র আকাশ" "ABSOLUTE SPACE"। জয়ন্ত নতুন শব্দ "স্বতন্ত্র আকাশ"। কিন্তু কি এই স্বতন্ত্র আকাশ? চির পরিচিত আকাশ আর স্বতন্ত্র আকাশের পার্থক্য কোথায়? কি এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য যার জন্যে এটি স্বতন্ত্র?

নিউটনের জবাব "আক্ষরিক অর্থে এই আকাশ জগতের অন্য সমস্ত জিনিষের থেকে বিচ্ছিন্ন। জাগতিক যে কোন বস্তুর ওপর এই আকাশের প্রভাব শূন্য। স্বতন্ত্র আকাশ রাত্রির আকাশ নয়। স্বতন্ত্র আকাশ দিনের আকাশ নয়। স্বতন্ত্র আকাশ গতকালের আকাশ নয়। স্বতন্ত্র আকাশ আগামীকালের আকাশ নয়। স্বতন্ত্র আকাশের অস্তিত্ব সর্ব্বকালে, সর্ব্বক্ষণে। এই আকাশ অপরিবর্ত্তনশীল, স্থির। সর্ব্বকালের জন্য স্থির। জগতের সমস্ত গতির, সমস্ত তরান্বিত গতির পরিমাণের মানদণ্ড স্বতন্ত্র আকাশের পরিপ্রেক্ষিতে।

গাড়ীর গতি ঘণ্টায় ৬০ কিলোমিটার স্বতন্ত্র আকাশের পরিপ্রেক্ষিতে। পৃথিবীর সূর্যকে ঘণ্টায় ১৬৬৬ কিলোমিটার প্রদক্ষিণের গতি স্বতন্ত্র আকাশের পরিপ্রেক্ষিতে। এমন কি ১৯৫৪ সালের অলিম্পিকে ২৫ বছরের যুবক ইংল্যাণ্ডের রজার ব্যানিস্টারের ৪ মিনিটের কম সময় এক মাইল দৌড়ানর গতিও ছিল স্বতন্ত্র আকাশের পরিপ্রেক্ষিতে।

আপনি বল্লেন 'জয়ন্ত এবার শোন—তেণ্ডুলকারের পরিপেক্ষিতে আখতারের বলটি তাঁর দিকে ধাববান ১৬০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায়। সবাই জানি বা দেখছি তেণ্ডুলকার স্থির। বলটি গতিশীল। অন্যদিকে যদি বলা হয় মাঝপথে বলটি স্থির তেণ্ডুলকার বলটির দিকে ধাবমান ১৬০ কিলোমিটার প্রতিঘণ্টায়। এই বক্তব্য নিশ্চয়ই সঠিক নয়। বিখ্যাত ইটালিয়ান দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক গ্যাললিওর মতানুসারে শেষের উক্তিটিও যুক্তিপূর্ণ। তাঁর অভিমতে ''ধরা যাক কোন চলমান একটি জাহাজে কারো হস্তচ্যুত বলটি তাঁর পায়ের কাছে পতিত হয়। আবার সেই ব্যক্তির তীরে অবস্থান কালেও হস্তচ্যুত বলটি সেই তাঁর পায়ের কাছেই পতিত হয়। অতএব যদি বলা হয় জাহাজটি স্থির আর তলার জলরাশি গতিশীল তবে সত্যের অপলাপ হয় কি? কি মত তোমার জয়ন্ত? ধরে নিলাম ''অপলাপ হয়না'', এই তোমার জবাব।

এবার বলতো ত্বরান্বিত গতির ক্ষেত্রেও (accelerated motion) কি একই যুক্তি প্রযোজ্য? ত্বরান্বিত গতি উপলব্ধি করা যায়। গাড়ী বা ট্রেনের হঠাৎ গতির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা হয় সামনের দিকে অথবা পেছনের হেলে পড়ি। বেশী গতিশীল হলে পেছনে হেলে পড়ি আবার হঠাৎ ব্রেক করলে সামনে ঝুঁকে পড়ি। হঠাৎ ডানদিকে গতি পরিবর্ত্তন করলে বাঁদিকে হেলে পড়ি। বাঁ দিকে গতি পরিবর্ত্তন করলে ডানদিকে হেলে পড়ি। মাটি থেকে অনেক ওপরে এরোপ্লেনে উপবিষ্ট কারো পক্ষে প্লেনের নিকটস্থ কোন স্থির বস্তুর অবর্তমানে প্লেনের তীব্র গতি সম্বন্ধে ধারণা করা অসম্ভব। অথচ প্লেনটির চলার শুরুর পর রানওয়েতে চলার সময় এবং ঠিক জমি থেকে আকাশে ওড়ার সময় প্লেনের যে তীব্র গতি এই সম্বন্ধে সহজেই ধারণা করা যায়। সহজেই ধারণা করা যায় কারণ প্লেনের নিকটস্থ স্থির জমি, গাছ পালা ইত্যাদির সঙ্গে প্লেনের গতির তুলনা করা যায়। অধিকন্তু প্লেনের ত্বরান্বিত গতির কারণে প্লেনে উপবিষ্ট সবাই পেছনের দিকে হেলে পড়েন।

স্কাইডাইভিং-এর সময় কোন এক স্কাইডাইভার যদি আরেকজন স্কাইডাইভারকে কোন একদিকে ঘুরিয়ে দেয় তখন ঘূর্ণমান স্কাইডাইভারটির হাত ও পাগুলি সম্প্রসারিত হয়ে পড়ে আপনা আপনি। ত্বরান্বিত ঘূর্ণমান গতি

স্কাইডাইভারটির অনুভূত হয়। এই কারেণই তার হাত, পাগুলি সম্প্রসারিত হয়।

অতএব প্রশ্ন করা যায় কি? মসৃণ গতির ক্ষেত্রে আপেক্ষিকতার প্রয়োজন। ত্বরান্বিত গতির ক্ষেত্রে আপেক্ষিকতার প্রয়োজন অপরিহার্য নয়। ত্বরান্বিত গতি অনুভব করা যায়। ত্বরান্বিত গতি উপলব্ধি করা যায়।

এই আপেক্ষিক গতির এবং আপেক্ষিক ত্বরান্বিত গতির তর্ক-বিতর্কের একটি সর্ব্বকালীন নিষ্পত্তির জন্যে নিউটন একটি পরীক্ষা করেছিলেন। একটি জল-ভরতি বালতি ও একটি দড়ির সাহায্যে। অত্যন্ত সহজ সরল পরীক্ষা কিন্তু অত্যন্ত হতবুদ্ধিকর (PUZZLING) পরীক্ষা।

জলেভরতি বালতিটি একটি লম্বা দড়ির সাহায্যে ঝুলিয়ে দিয়ে দড়িটিতে বেশ কয়েকটি পাক দিয়ে ছেড়ে দিয়েছিলেন। জল- ভরতি বালতিটি ঘুরতে আরম্ভ করেছিল।

জয়ন্ত কি বলছি এবার একটু মন দিয়ে শোন। জয়ন্ত বলে "আপনি বলুন দাদা। আমার মন, প্রাণ সবই এখন আপনার জিম্মায়"

"OK. My Friend শোন তবে।

পরীক্ষার শুরুতে বালতি ঘূর্ণমান, জল স্থির। উভয়ের মধ্যে আপেক্ষিক গতি সর্ব্বাধিক। জলের লেবেল অপরিবর্তিত। সমতল। কিছুক্ষণ পর যখন বালতি এবং জল উভয়েই ঘূর্ণমান, উভয়ের আপেক্ষিক গতি শূন্য জলের লেবেল ধনুরাকৃতি। কিছুক্ষণ পরে বালতির ঘূর্ণমান গতির দিশার পরিবর্ত্তন। বিপরীত দিকে ঘোরা আরম্ভ। ঠিক এই দিক পরিবর্ত্তনের সময় বালতিটি স্থির ক্ষণকালের জন্যে। জল্ কিন্তু ঘূর্ণমান। বালতি ও জলের মধ্যে আপেক্ষিকতা সর্ব্বাধিক। জলের লেবেল ধনুরাকৃতি। অতএব জলের লেবেল আর জলের আর বালতির আপেক্ষিকতা অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর।

এই বিভ্রান্তির অবসানের জন্যে স্যার আইজাক নিউটন এমন একটি সাহসী পদক্ষেপ নিলেন যা হয়ত একমাত্র নিউটনের পক্ষেই নেওয়া সম্ভব। কল্পনায় নিউটন পরীক্ষাটি নিয়ে গেলেন পৃথিবী থেকে অনেক দূরে, সৌর মণ্ডলীর থেকে অনেক দূরে। মহাকাশ সম্পূর্ণভাবে মহাশূন্যে। সম্পূর্ণভাবে বস্তুহীন। নেই কোন সূর্য, নেই কোন গ্রহ, নেই কোন তারা, নেই কোন তারামণ্ডলী। পাশ্ববর্তী স্থান অন্ধকার, বল-বস্তু-বর্জিত আকাশ।

যেহেতু দড়ি বালতির পরীক্ষায় জলের লেবেলের আকৃতি কিছু পরিমাণ পৃথিবী মাধ্যাকর্ষণের জন্য দায়ী তাই তিনি দড়ি বালতির বদলে একটি দড়ির দুই প্রান্তে দুটি পাথর বাঁধা অবস্থায় পরীক্ষাটির কথা কল্পনা করতে বললেন,

সেখানে মহাকাশ মহাশূন্য। এই পরিসরে দড়িটিকে যদি ঘোরান হয় তবে কি দু প্রান্তে বাঁধা দুটি পাথরেরও ঘোরার কারণে দড়িটি টান টান অবস্থায় থাকবে? অথবা ঢিলে অবস্থায় থাকবে?

মহাকাশের এই রকম এক পরিবেশে ভাসমান স্কাইডাইভারটিকে ঘুরিয়ে দিলে তাঁর হাত-পা-গুলি কি সম্প্রসারিত হবে? স্কাইডাইভারটি ঘূর্ণ্যমান গতির তুলনা করার জন্য সমস্ত বস্তুই অনুপস্থিত। এই অবস্থায় স্কাইডাইভারটির ত্বরান্বিত ঘূর্ণমান গতির অনুভূতি হবে কি?

সাধারণ বুদ্ধি বলে হবে। সাধারণ বুদ্ধি বলে দড়ির অবস্থা থাকবে টান টান। নয় কি জয়ন্ত?

নিউটনের মতে তুলনা করার জন্যে জগতের সর্ব্বস্থলে সর্ব্বক্ষণ স্বতন্ত্র আকাশ বর্ত্তমান। অতএব মহাশূন্য মহাকাশেও স্বতন্ত্র আকাশ বর্ত্তমান। দুপ্রান্তে পাথর বাঁধা ঘূর্ণমান দড়ি স্বতন্ত্র আকাশের তুলনায় ঘূর্ণ্যমান। দড়ির অবস্থান নিশ্চই থাকবে টানটান। স্কাইডাইভার স্বতন্ত্র আকাশের তুলনায় ঘূর্ণমান। অতএব স্কাইডাইভারটির ঘূর্ণমান গতির নিশ্চিৎ অনুভূতি হবে। তার হাত-পা-গুলি সম্প্রসারিত হবে।

গতিশীল জাহাজের ওপর কারো হস্তচ্যুত বল তাঁর পায়ের কাছে পড়ে কারণ বলের গতি স্বতন্ত্র আকাশের পরিপ্রেক্ষিতে। আবার তীরে অবস্থিত কোরো হস্তচ্যুত বলও তার পায়ের কাছেই পড়ে কারণ সেখানেও বলের গতি স্বতন্ত্র আকাশের পরিপ্রেক্ষিতে।

জয়ন্তের দিকে তাকিয়ে বলেন "কি ঠিক আছে তো বন্ধু? তখন মোটামুটি কিছুটা তো বোঝা গেল। স্বতন্ত্র আকাশ শব্দটিও প্রতিষ্ঠিত করা গেল। স্বতন্ত্র আকাশকে কাজে লাগিয়ে গতি বিষয়ক অনেক সমস্যার সমাধানও পাওয়া সম্ভব হল।

কিন্তু স্বত্ন্ত্র আকাশ জিনিসটি কি? স্বতন্ত্র আকাশকে কি স্পর্শ করা যায়? স্বতন্ত্র আকাশকে কি অনুভব করা যায়? স্বতন্ত্র আকাশকে কি দেখা সম্ভব? স্বতন্ত্র আকাশের স্বাদ, সৌরভ কিছু আছে কি? স্বতন্ত্র আকাশের অস্তিত্বের প্রমাণ কোথায়? স্বতন্ত্র আকাশের প্রভাব কোথায়? অণু পরমাণু কণাদের মাঝে? সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, তারা, তারামণ্ডলীর মধ্যে? স্বতন্ত্র আকাশের প্রবর্ত্তক স্যার আইজাক নিউটন কি উত্তর দিয়েছিলেন এই সব প্রশ্নের?

নিউটনের সেই বিখ্যাত উক্তি—

"Absolute space, in its own nature, without reference to

anything internal, reamins always similar and unmovable") (Principia)

"স্বতন্ত্র আকাশ নিজধর্ম্ম অনুযায়ী বাহ্যিক কোন তুলনা ব্যাতীত সদা সর্ব্বক্ষণে সদৃশ্য ও অটল থাকে"

নিউটন নিজেও কিন্তু তাঁর এই উত্তরে অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন না। যথেষ্ট অসন্তোষ ছিল তাঁর মনে। তাই তিনি লিখে গেছেন।

"কোন বস্তুর গতিশীলতাকে নির্ণয় করা এবং তার মৌলিক গতি আর তার আপেক্ষিক গতিকে পৃথক করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার, কারণ অপরিবর্তনশীল স্বতন্ত্র আকাশের যে অংশে এই গতিশীলতা সম্পন্ন হয় তা আমাদের দৃষ্টির গোচরে নয়, আমাদের ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির বাইরে।

নিউটনের কথায়—

"It is indeed a matter of great difficulty to discover and effectually to distingish the true motions of particular bodies from the aparent because the parts of the immovable space in which those motions are performed by no means come under the observations of our senses" (Principia).

এই বক্তব্য রাখার পর নিউটন তৎকালীন বহু বৈজ্ঞানিকদের অত্যন্ত বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে দিয়েছিলেন। তিনি নিজেও জানতেন তাঁর বক্তব্যের মধ্যে বিভ্রান্ত হওয়ার মত যথেষ্ট কারণ আছে। বহু বৈজ্ঞানিক তাঁর স্বতন্ত্র্য আকাশের মতবাদ মনে নেননি। কিন্তু কেউই কোন বিকল্প মতবাদ পেশ করতে সফল হননি।

দৃষ্টিভঙ্গিতে নিউটন এতটাই নিখুঁত ছিলেন যে একবার মানুষের চোখের উপরিভাগের এনাটমি যাচাই করার জন্যে একটি স্থূল ফলকের সাহায্যে তিনি নিজের চোখের উপরিভাগ বিদ্ধ করেছিলেন।

ভাবা যায় জয়ন্ত? কত বড় সত্যের পুজারী ছিলেন তিনি?

তাঁরই উক্তি "Hypotheses non fingo"(parincipia Mathematics) "আমি প্রকল্পিত সত্যে বিশ্বাস করি না"

সভ্যতার অগ্রগতির মধ্যে তাঁর উপদেশ' "To explain all nature is too difficult task for any one man or even for any one age. It is much better to do a little with certainty and leave the rest for others that come after you.

কোন একজনের পক্ষে অথবা কোন এক যুগে প্রকৃতির পূর্ণ পরিচয়

উন্মোচিত করা অত্যন্ত কঠিন। অধিক গ্রাহ্র আংশিক উন্মোচন। অবশিষ্টাংশ উত্তরপুরুষের জন্যে ছেড়ে দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

কত বড় দূরদর্শী ছিলেন স্যার নিউটন তাঁর একটা উদাহরণ দিই তোমায় জয়ন্ত।

মনে হয় আইনস্টাইনের জন্যে সঙ্কেত রেখে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন "Are not gross bodies and light convertible to one another? May not bodies receive much of their activity from the particles of light which enter into their composition? The changing of bodies into light and light into bodies is very comfortable to the course of nature, which seems delighted with transmulation.

বস্তু এবং আলো কি পারস্পারিকভাবে পরিবর্তনশীল নয়? বস্তুর (ক্ষুদ্র পদার্থের?) ক্রিয়াকলাপ কি তাদের ওপর বর্ষিত আলোর ক্ষুদ্রকণারদ্বারা নির্দ্ধারিত হয় না? প্রকৃতির জীবনধারাটি সেইক্ষেত্রে অনেক সহজ হয়।

এক মহাপুরুষের তিরোধানের ১৭৮ বছর উপরান্তে অপর এক মহাপুরুষের কণ্ঠে উচ্চারিত হয় দৈববাণী $E=MC^2$। আলো এবং বস্তু পরস্পরের পূরিপূরক।

জয়ন্ত, মনুষ্যকুলের ইতিহাসে নরশ্রেষ্ঠের শ্রেষ্ঠ উপহার।

এস জয়ন্ত এবার তোমায় নরশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক এ্যালবার্ট আইনস্টাইনের কীর্ত্তির কথা বলব।

চতুর্থ অধ্যায়

জ্ঞানের আকাশে অপর এক জ্যোতিষ্ক এলবার্ট আইনস্টাইন

ক্ল্যাসিক্যাল ফিজিক্স-এর যুগের উপরান্তে পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদের অন্যতম ও অত্যন্ত জনপ্রিয় বৈজ্ঞানিক এ্যালবার্ট আইনস্টাইন জার্মানির উল্ম শহরে জন্মগ্রহণ করেন ১৪ই মার্চ ১৮৭৯ সালে। CHILD SHOWS THE MAN এই উক্তি তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণভাবে অপ্রযোজ্য ছিল। তাঁর অবিশ্বাস্য প্রতিভার কোনরকম আভাস তাঁর শৈশবে একেবারেই প্রকাশ পায় নি। এমনকি তিন বছর বয়স অবধি তিনি কথা পর্যন্ত বলতে পারতেন না।

১৯০৫ সাল। বিজ্ঞানের জগতে আইনস্টাইন তাঁর আবির্ভাব ঘোষনা করলেন যে সূত্রটি দিয়ে সেটি তাঁর অন্যতম অবিস্মরণীয় কীর্তি SPECIAL THEORY OF RELATIVITY। বিশিষ্ট আপেক্ষিক তত্ত্ব। এই তত্ত্বে তিনি বল্লেন আলোর কোন আপেক্ষিক গতি নেই। যে কোন সচল অথবা স্থির বস্তুর কাছে আলোর গতি অপরিবর্ত্তনশীল জগতের যে কোন গতির শেষ সীমা হল আলোর গতি। ব্রহ্মাণ্ডের কোন কিছুই আলোর গতিকে অতিক্রম করতে পারে না।

পদার্থের ভরের (MASS) সঙ্গে আলোর দুরন্ত গতির দুবার গুনন ঘটিয়ে তিনি শক্তির এক নতুন পরিমাপ পেশ করলেন। উপস্থিত করলেন তাঁর জগৎ-বিখ্যাত সূত্র $E=MC^2$। ক্ষুদ্র বস্তুর মধ্যেও প্রচণ্ড শক্তি নিহিত এটি প্রমাণ করলেন। মহাবিশ্বের অনন্ত শক্তির ভাণ্ডারের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন।

জয়ন্ত জানবে মানুষের জ্ঞানের ভাণ্ডারে এ এক ব্যাপক সংযোজন।

এর ঠিক তের বছর পর আইনস্টাইন মনুষ্য সভ্যতাকে উপহার দিলেন আধুনিক বিজ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার সাধারণ আপেক্ষবাদ সূত্র (GENERAL THEORY OF RELATIVITY)।

তিনি বললেন নিউটনের সূত্রগুলি সর্বৈব সত্য নয়। তত্ত্বীয়ভাবে কখনই পূর্ণ সত্য নয়। বিগত দুশ বছরের বিশ্বাস, ধারণা যে TRUTH AND

NOTHING BUT THE TRUTH, সত্য আর সত্য বই মিথ্যা নয় এই মতকে ঝটকায় বাতিল করে দিয়ে বললেন "ভুল সবই ভুল"।

নিউটনের স্বতন্ত্র আকাশের (ABOSOLUTE SPACE) মতবাদ আর তৎকালীন বৈজ্ঞানিকদের ধারণা আলোর সম্প্রসারণের আধার (MEDIUM) ইথারের (LUMINIFEROUS ETHER) অস্তিত্ব সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করে প্রমাণ করলেন আলোর গতি বিশ্বজনীনভাবে স্থির, অপরিবর্তনীয় (UNIVERSAL CONSTANT)।

আমাদের চেনা-জানা জগৎটার একটা নতুন পরিচয় তিনি পেশ করলেন। বললেন, আকাশ আর সময় অভিন্ন। এই অত্যন্ত সরল ব্যাপারটি দিয়ে তিনি আমাদের শিখিয়ে দিলেন কি ভাবে জগৎটিকে দেখা উচিত।

চিন্তা করে দেখ জয়ন্ত। সত্যিই তো আকাশকে এককভাবে ভাবা সম্ভব কি? সৃষ্টির ক্ষণ থেকেই তো সময় বয়ে চলেছে টিক্ টিক্ করে। তাই শুধু আকাশ বলে কিছু আছে কি? কখনকার আকাশ? আজকের? গতকালের? একশ বছর আগেকার? তুতেনখামেনের সময়ের আকাশ? আজ থেকে ১০ হাজার কোটি বছর পরের আকাশ? সময় ছাড়া আকাশের কোন মানেই হয় না। হয় কি জয়ন্ত?

আবার আকাশ ছাড়া খালি সময়ের কোন মানে হয় কি? এক সেকেণ্ড, এক মিনিট, এক ঘণ্টা, এক বছর, এক হাজার বছর। এ সবই তো সময়ের পরিমাপ। এর মধ্যে সময় কোথায়?

এবার যদি এই পরিমাপের সঙ্গে একটি কাল জুড়ে দেওয়া হয়, ভূত, ভবিষ্যৎ বা বর্ত্তমান—যে কোন একটি কাল আর বলা হয়—গতকাল, একবছর আগে, একবছর পরে বা এই মুহূর্তে তখনই একটা মানে হয়।

সময়ের পরিমাপের সঙ্গে কাল জুড়ে দেওয়া হলেই আকাশ আপনা আপনি এসে পড়ে। গত কাল কোথায়? এক বছর আগে কোথায়? এক বছর পরে কোথায়? বাড়ীতে? পাড়াতে, দেশে? পৃথিবীতে? জগতে?

ভাব জয়ন্ত। ভাব। একটু ভাবলেই বোঝা যায় যে আকাশ আর সময় অভিন্ন, অবিচ্ছন্ন।

আইনস্টাইন বললেন আকাশ আর সময়ের স্থিতি স্বতন্ত্র (ABSOLUTE) নয়, একক নয়, Singular নয়। এদের স্থিতি যুগ্ম (Dual)। আর বললেন এই যুগ্ম স্থিতির ৪টে দিশা আছে (4 DIMENSIONS)। সামনে পেছনে, ডাইনে বাঁয়ে আর ওপরে নিচে। এই তিনটি হল "কোথায়" (আকাশ SPACE) আর 'কখন' এটা হল সময়।

বাংলাভাষায় একটা সুন্দর কথা আছে না জয়ন্ত? স্থান, কাল, পাত্র। স্থান হল আকাশ, কাল হল সময়। আর তার ওপর পাত্র থাকলে সোনায় সোহাগা। তবে পাত্র অপরিহার্য নয়।

এরপর আইনস্টাইন যে বক্তব্যটি রাখলেন সেটি একদিকে যেমন অকল্পনীয় অন্যদিকে তেমনই প্রখরভাবে প্রভাবশীল। প্রভাবশীল মহাকাশীয় ঘটনায়।

যেমন বললেন অত্যাধিক শক্তিশালী মধ্যাকর্ষণ বলের ক্ষমতা আছে আমাদের এই আকাশ আর সময়ের কাঠামোটিকে মোড়ে দেওয়ার। এমনকি যদি মহাকাশীয় কোন বস্তুর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ততটাই বেড়ে যায় তবে আলোর রশ্মি পর্য্যন্ত ঐ বস্তুটির থেকে বেরিয়ে আসতে অক্ষম। একটি বা দুটি নয়, বিগত কয়েক বছরের মধ্যে কয়েক হাজার এই রকম মহাকাশীয় বস্তু আবিষ্কৃত হয়েছে। এইগুলির নামকরণ করা হয়েছে ব্লাক হোল (BLACK HOLE)।

ব্লাক হোলের অসীম মাধ্যাকর্ষণকে অতিক্রম করে আলো পর্য্যন্ত বেরিয়ে আসতে পারে না। তাই ব্লাক হোলকে আমরা সরাসরি দেখতে পাই না। তবে সরাসরি দেখা না গেলেও ব্লাকহোলের অস্তিত্ব অন্য অনেক ভাবেই প্রমাণিত হয়েছে। যেমন একটি ব্লাকহোলের পারিপার্শ্বিক তারাদের গতিবিধির পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা গেছে। এ ছাড়াও ব্লাকহোলের থেকে X-রে রশ্মির বিচ্ছুরণও পরিলক্ষিত হয়েছে।

এখন প্রমাণ পাওয়া গেছে অধিকাংশ তারামণ্ডলের (Galaxy) কেন্দ্রস্থলে একটি করে অত্যন্ত বৃহৎ ব্লাকহোলের উপস্থিতির। আমাদের তারামণ্ডল মিল্কিওয়ের কেন্দ্রে একটি প্রকাণ্ড ব্লাকহোলের অবস্থানের সুনিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেছে। আর নিজ ধর্ম্মানুযায়ী একের পর এক পারিপার্শ্বিক তারাকে গ্রাস করে চলেছে অহরহ। আর এই সব তারাদের নিজের অদ্যপি আমাদের অজানা, অচেনা ভয়ঙ্কর গহ্বরে নিক্ষেপ করে আমাদের চেনা জানা জগতের থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিচ্ছে একের পর এক। জয়ন্ত তবে এইসব দানবীয় ভক্ষকের থেকে আমাদের কোন বিপদের সম্ভবনা নিকট ভবিষ্যতে নেই। কারণ সূর্যের নিকটবর্ত্তী অঞ্চলের মধ্যে এখনও পর্য্যন্ত কোন ব্লাক হোলের অবস্থান আবিষ্কৃত হয়নি। অতএব পৃথিবীর অবস্থান সুরক্ষিত।

জয়ন্তের আবেদন "দাদা ব্লাক হোল সম্বন্ধে বিস্তারিত কিছু বলেন।"

আপনি বললেন "আমি জানি জয়ন্ত ব্লাক হোল, বাংলায় যার নাম কৃষ্ণ গহ্বর। এই মহাকাশীয় বস্তুটির পূর্ণ পরিচয় জানার জন্যে তুমি উৎসূক। তবে আজ নয় বন্ধু। আরেক দিন বলব মহাকাশীয় বস্তুদের সর্ব্বাধিক কৌতুহল

উদ্দীপক এবং মহাকাশ বিজ্ঞানীদের সর্ব্বাপেক্ষা রহস্যাবৃত বস্তু কৃষ্ণ গহ্বরের কথা।

বরং আজকের সন্ধ্যায় যে মহাপুরুষটি স্মরণে আমরা অর্ঘ্য প্রদানে ব্রতী সেটিই জারী রাখা থাক। চল বলি তাঁর অনন্য কৃতীর কথা।

রিলেটিভিটি থিওরি, আপেক্ষিকবাদ

জয়ন্ত, ধরা যাক এক্সপ্রেসওয়ে রাস্তার পাশেই তোমার বাড়ী। পাড়ায় বেরিয়ে শুনলে, অমিতাভ বচ্চন সকাল ১০টায় তাঁর ঢাউস মারসেডিস গাড়ী করে তোমার বাড়ীর সামনের রাস্তা দিয়ে পাস করবেন। অমিতাভবাবু জোরে
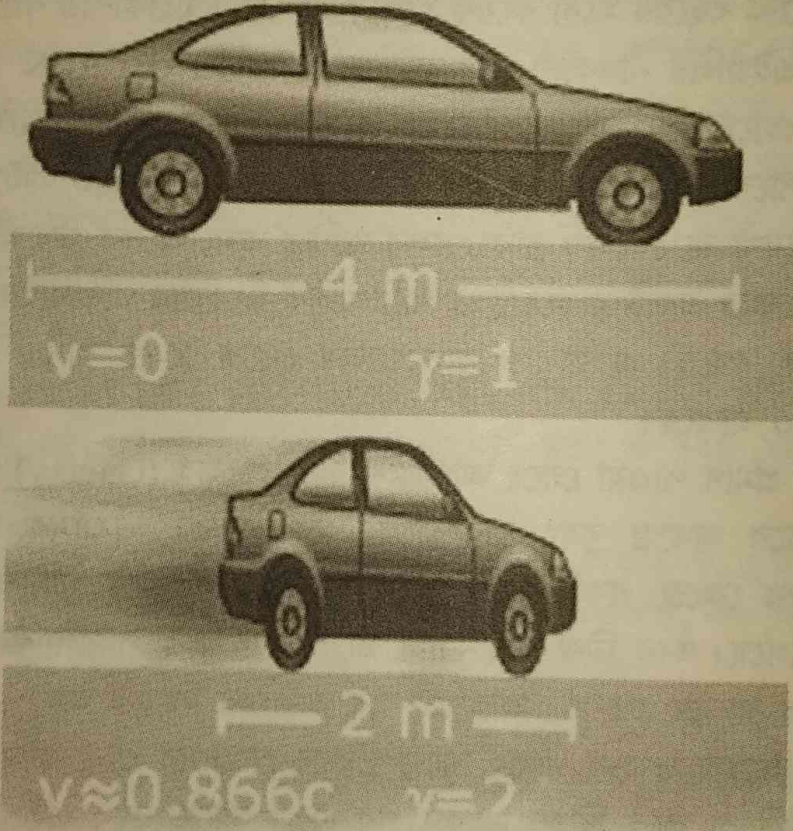
রিলেটিভিটি দৈর্ঘ্য সঙ্কোচন

গাড়ী চালান। ঠিক দশটার সময় এককথার মানুষ অমিতাভবাবু আলোর গতির ৮০ শতাংশ গতিতে (আলোর গতি মোটামুটি ৩ লক্ষ্য কিলোমিটার প্রতি সেকেণ্ডে) একেবারে সঠিক মাপ ২৯৯৭৯২৪৫৮ মিটার প্রতি সেকেণ্ডে) তোমার বাড়ীর সামনের এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে পাস করলেন। তুমি অবাক হয়ে দেখলে কোথায় ঢাউস মারমেডিস গাড়ী? অমিতাভবাবুতো মারুতি ৮০০ থেকেও একটা ছোট গাড়ী চালাচ্ছিলেন। পরে শুনলে তোমার বাড়ীর সামনে

দিয়ে পাশ করার সময় অমিতাভবাবু তাঁর অত্যন্ত দামী ঘড়িতে সময় দেখেছিলেন। তাঁর দামী ঘড়িটিতে তখন ১০টা নয় ৯টা বাজছিল।

তা হলে তুমি যে সে শুনেছিলে তিনি খুবই দামী ঢাউস মারমেডিস গাড়ী চড়েন? খুবই দামী হাতঘড়ি ব্যবহার করেন? দামী মারমেডিসের এই অবস্থা? মারুতি ৮০০ থেকেও ছোট? দামী ঘড়ির এই অবস্থা ১ ঘণ্টা স্লো?

মহামান্য এ্যালবার্ট আইনস্টাইন যদি তোমার পাশে থাকতেন, যদি থাকতেন নয়। ধর জয়ন্ত তিনি পাশে দাঁড়িয়ে বললেন ''আপনি যা দেখলেন...''অমিতাভ বাবু মারুতি ৮০০ থেকেও ছোট গাড়ী চালাচ্ছিলেন তা একেবারে সঠিক। আবার অমিতাভবাবুও যে ঢাউস মারমেডিস গাড়ী চালাচ্ছিলেন তাও সঠিক। আপনার বাড়ীর সামনে দিয়ে পাশ করার সময় আপনার ঘড়িতে সকাল ১০টা তাও যেমন একেবারে সঠিক তেমনি ঠিক সেই সময় অমিতাভবাবুর দামী ঘড়িটিও একেবারে নির্ভুল সময় দেখাচ্ছিল। তাঁর ঘড়িতে তখন বাজছিল সকাল ৯টা।"

তোমার তো প্রায় মূর্চ্ছা যাওয়ার অবস্থা।

আইনস্টাইন বলে কথা। ভুবন জোড়া নাম। নোবেল বিজয়ী। তোমার সন্দেহ ভীমরতি।

আইনস্টাইন তোমার মনের অবস্থা বুঝতে পেরে মুচ্‌কি হাসলেন। সাদামাটা একজন বঙ্গসন্তানের বিভ্রান্তি নিরসনে তোমার কাঁধে হাত রেখে বললেন যে আপনার সন্দেহ অমূলক। আমার মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ সুস্থ। আপনার বিভ্রান্তিই আমার বিশিষ্ট আপেক্ষিকবাদ সূত্র (Special theory of Relativity).

এই সূত্র অনুযায়ী যে কোন গতিশীল বস্তুর গতির অভিমুখে আয়তন হ্রাস পায়। যে কোন স্থির বস্তুর তুলনায় গতিশীল বস্তুর সময়ের প্রবাহ হ্রাস পায়। গতিশীল বস্তুর ঘড়ির গতি মন্থর হয়। স্লো চলে। প্রাত্যহিক জীবনে এই আয়তন ও সময়ের প্রবাহের হ্রাসের পরিমাণ নগণ্য। এতই নগণ্য যে মানুষের তৈরী কোন যন্ত্রের সাহায্যে আয়তন ও সময়ের এই পার্থক্য মাপা অসম্ভব। এমনকি অনুভব করাও অসম্ভব। অথচ আলোর গতির তুলনামূলক গতিতে এই পার্থক্য অত্যন্ত প্রখর। উদাহরণস্বরূপ আলোর গতির ৯০ শতাংশ গতিতে অর্থাৎ ২৪০০০০ কিলোমিটার প্রতি সেকেণ্ডের গতিতে আয়তন হ্রাসের পরিমাণ ৪৪ শতাংশ। সময়ের হ্রাসের পরিমাণ প্রায় ৩০ শতাংশ।

মহামানব বললেন, ''আমার রিলেটিভিটির স্পেশাল থিওরী একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব প্রদান করে। তত্ত্বটি ভর ও শক্তি সম্পর্কেও। Relationship

করলেন। অপু আর দুর্গা অবাক হয়ে দেখল এবার কিন্তু টর্চের আলোর গতি বলের মত ট্রেনের গতির সঙ্গে যুক্ত হল না। বাবা বাড়ীতে টর্চ জ্বাললেও টর্চের আলোর যা গতি চলন্ত ট্রেনে বসা অবস্থাতেও টর্চের আলোর গতি সমান।

আলোর গতির ক্ষেত্রে আপেক্ষিক গতি কথাটি অপ্রযোজ্য।

দেখ জয়ন্ত আইনস্টাইনের পূর্ব্ববর্তী পদার্থ বিজ্ঞানীরা আলোর গতির মিডিয়াম হিসাবে ইথারের উপস্থিতির চিন্তা করেছিলেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা প্রথমে কোন একটি বিষয়ে চিন্তা করেন, কল্পনা করেন। অতঃপর সেই চিন্তাকে সেই কল্পনাকে প্রমাণ করার জন্যে নানা প্রকার পরীক্ষা নিরিক্ষা করেন। নানা রকম গণিতের সাহায্যে বিভিন্ন সমীকরণ রচনা করেন। ইথারের সম্ভাব্য উপস্থিতির কথা চিন্তা করারপর তৎকালীন বহু বিজ্ঞানী পরীক্ষামূলকভাবে এটি প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। কোন নদীতে জলের ঢেউএর বিপরীত দিকে সাঁতার কাটলে ঢেউ-এর কাছে দ্রুত পৌছন সম্ভব। ঢেউ-এর একই দিকে সাঁতার কাটলে ঢেউ-এর কাছে পৌঁছতে বিলম্ব হয়। অনুরূপভাবে তৎকালীন বিজ্ঞানীরা চিন্তা করেছিলেন ইথারের ঢেউ-এর বিপরীত দিকে আলোর গতি হ্রাস পায় এবং একই দিকে আলোর গতি ত্বরান্বিত হয়।

১৮৮৭ সালে আমেরিকান বিজ্ঞানী এ্যালবার্ট মাইকেলসন এবং এডওয়ার্ড মোরলে বহু পরীক্ষার পরও আলোর গতির কোনপ্রকার তারতম্য প্রমাণে ব্যর্থ হন। প্রমাণ হয় আলোর গতির ওপর আলোর উৎসের গতি অথবা আলোর প্রাপকের গতির প্রভাব শূন্য। ভ্যাকুইমে আলোর গতি স্থির।

আইনস্টাইন বলেছিলেন ইথারের উপস্থিতি অপ্রমাণিত কারণ ইথার কাল্পনিক। আলোর প্রবাহের জন্যে কোন মিডিয়ামের প্রয়োজন নেই। আলো আপনি বিচরণে সক্ষম। আলো 'একলা চলরে" মতবাদে বিশ্বাসী। অপছন্দ তেনার কোন রকম সঙ্গী সাথীর।

আলোর গতি স্থির বিশ্বের প্রতিটি বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতে। সর্ব্বকালের পরিপ্রেক্ষিতে। সর্ব্বস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে।

যাইহোক চিন্তা করা যাক অমিতাভবাবুকে, টা টা বাই বাই করার পর তুমি আর আইনস্টাইন চা বিস্কুট খাচ্ছ তোমার বসার ঘরে বসে। উনি আজ বেশ খোস মেজাজে, বেশ আড্ডা মারার মেজাজে আছেন। চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে বললেন "আচ্ছা বাঙ্গালীবাবু ধরুণ আমি আপনাকে একটা মহাকাশযান space ship দিলাম। এই যানের সর্ব্বোচ্চ গতি আলোর গতির অধিক। আমি একটা লেজার বন্দুক থেকে লেজার রশ্মি ছাড়লাম মহাকাশের দিকে। তুমি

থেকে ৩ সেকেণ্ড। তিন সেকেণ্ড থেকে ৪ সেকেণ্ড এই ভাবে ১ মিনিট থেকে ২ মিনিট, এক ঘণ্টা থেকে ২ ঘণ্টা। এই সবেরই মধ্যবর্তী সময় হ্রাস পায়। এক সেকেণ্ড আর ১ সেকেণ্ড থাকে না। ১ সেকেণ্ডের ক্ষণ কমে যায়। এক মিনিট আর এক মিনিট বা এক ঘণ্টা আর এক ঘণ্টা থাকে না। এদের ক্ষণ কমে যায়। আর ক্ষণ কমে যাওয়া মানেই ঘড়ির আস্তে চলা। সময়ে এই ঢিমে চলাকে বলা হয় "TIME DILATION" বাংলায় বলা যেতে পারে "সময়ের হ্রাস" বা "ক্ষণের হ্রাস।"

তিনি আরো বললেন, আলোর অনুপাতিক গতিতে যে কোন বস্তুর গতির অভিমুখে বস্তুটির দৈর্ঘ্যও কমে যায়। অমিতাভের ঢাউস মারসেডিস গাড়ী মারুতি ৮০০ থেকেও ছোট হয়ে যায়। দৈর্ঘ্যের এই শঙ্কুচিত হওয়াকে বলে "Length contraction। বাংলায় বলা যায় "দৈর্ঘ্য সঙ্কোচন"।

এর পর আইনস্টাইন বললেন যে, এবার আমি আপনাদের যে কথাটি বলব তা হয়ত কারুরই পছন্দ হবে না। আধুনিক যুগের মানুষ সবাই আপনারা। সবাই figure conscious। হারডির মত কেউই হতে চান না। আলোর আনুপাতিক গতিতে বস্তুর ভরের বৃদ্ধি হয়। ভরের বৃদ্ধি হওয়া মানেই ওজনেরও বৃদ্ধি হওয়া। গতির জন্যে এই বর্দ্ধিত ভরকে বলা হয় RELATIVISTIC MASS। বাংলায় বলা যেতে পারে আপেক্ষিক সম্পর্কিত ভর।

চুরুটে একটা সুখটান দিয়ে আইনস্টাইন বলেন "শুনলেন তো সবাই...গতিশীলতা মোটেই ভাল নয়। অমিতাভবাবুর বড় গাড়ী ছোট হয়ে যায়। দামী ঘড়ি আস্তে চলে। এমন কি এই বয়সেও ওনার এত সুন্দর ফিগার। তাও নষ্ট হয়ে যায়। উনি মোটা হয়ে যান। আপনারা কেউ দয়া করে ওনাকে ফোন করে অনুরোধ করে দেবেন যেন উনি জোরে গাড়ী না চালান। আপনার ও কেউ কখনও আলোর গতিতে ভ্রমণ করবেন না। মহাকালে এক বছর আলোর গতিতে বিচরণ করার পর পৃথিবীতে ফিরে এসে দেখবেন আপনার এক বছরের ছেলে বুড়ো হয়ে গেছে। আপনার থেকে অনেক বড় হয়ে গেছে। আপনার বয়স কিন্তু মাত্র ১ বছরই বেড়েছে।

মহাজ্ঞানী আইনস্টাইনের বক্তৃতা শুনে সবাই তো হতবাক।

আইনস্টাইন সবাইকার মনের অবস্থা উপলব্ধি করে বললেন "আপনাদের আমার কথা অবিশ্বাস করার কোন কারণ নেই। এই সমস্ত সূত্র পরীক্ষিতভাবে প্রমাণিত। বার বার বহুবার প্রমাণিত। কিন্তু আপনাদের বিচলিত হওয়ার কোন দরকার নেই। কারণ দৈনন্দিন জীবনে যে কোন বস্তুর গতি আলোর গতি অতি ক্ষুদ্র এক ভগ্নাংশ। এই ক্ষুদ্র গতিতে 'সময়ের হ্রাস' ক্ষণের হ্রাস, দৈর্ঘ্য সঙ্কোচন

অবস্থানে বিশ্বাসী। আকাশের অবর্ত্তমানে সময় গৌণ। সময়ের অবর্তমানে আকাশ গৌণ।

জগতের কোন কিছুই স্থির নয়। সমস্ত জগৎই গতিশীল সদা সর্বদা। আকাশ আর সময়ের মধ্যে দিয়েই এই গতি। আকাশের মধ্যে গতি এই ব্যাপারটি তো সবারই জানা। নিত্যদিনের ঘটনা। আমাদের চলা ফেরা, গাড়ী, এরোপ্লেন, জাহাজ, রকেট এই সবই যখন গতিশীল, এই গতিশীলতা আকাশের মধ্যে। আমরা কোন বস্তুকে গতিশীল তখনই বলি যখন ঐ বস্তুটি কিছু না কিছু আকাশ অতিক্রম করে। কিছু না কিছু দূরত্ব অতিক্রম করে। দৈনন্দিন জীবনে আমরা গতিশীল বলতে এইটাই বুঝি। এক স্থান থেকে আরেক স্থানে গমন করাকে বলা যেতে পারে আকাশের মধ্যে গতিশীলতা। বিশ্বের সমস্ত বস্তুর মধ্যে আর এক প্রকারের গতিও বর্তমান। সর্ব্বক্ষণে বর্তমান। সময়ের মধ্যে গতি। সময়ের মধ্যে গতিশীলতা। সময়ের মধ্যে গতিশীলতা আকাশ অতিক্রম করে না। দুরত্ব অতিক্রম করে না। সময়ের মধ্যে গতিশীলতায় স্থানচ্যুত হওয়াও বাধ্যতামূলক নয়। সময়ের মধ্যে গতিশীলতা সময়-কে অতিক্রম করে। আইনস্টাইন বললেন, আমি, আপনারা, পৃথিবীর সবাই, সবকিছু, বিশ্বের সবকিছু সময়কে অতিক্রম করে চলেছি সদাসর্ব্বদা। সময়কে অতিক্রম করে চলেছি বলেই আমাদের বয়স বেড়ে চলেছে। বিশ্বে সমস্ত কিছু সময়কে অতিক্রম করে চলেছে বলেই বিশ্বের সবকিছুরই বয়স বেড়ে চলেছে। বেড়ে চলেছে সৃষ্টির ক্ষণ থেকেই।

চুরুটে আর একটা সুখ টান দিয়ে আইনস্টাইন বলেন, "এটাই বোঝার ব্যাপার। বোঝার ব্যাপার এই যে গতি দু'রকম। এক আকাশের মধ্যে গতি। অপরটি সময়ের মধ্যে গতি। আকাশের মধ্যে গতির ব্যাপারটিতে আমরা এতই অভ্যস্থ যে সময়ের মধ্যে গতিশীলতা ব্যাপারটি হৃদয়ঙ্গম করতে অসুবিধে হয়। এই দুটি গতি এক অপরের পরিপূরক। সময়ের মধ্যে গতির হ্রাস হলেই আকাশের মধ্যে গতির বৃদ্ধি হয়। আবার আকাশের মধ্যে গতির হ্রাস ঘটলে সময়ের মধ্যে গতির বৃদ্ধি ঘটে।"

"সময়ের মধ্যে গতি" এই নতুন তথ্যটি শ্রোতাদের হজম করার সময় দেওয়ার জন্যে জ্ঞানী ও সম্ভ্রান্ত অতিথিটি কিছুক্ষণের জন্যে বক্তৃতা বন্ধ রাখলেন।

অতঃপর পুনরায় বক্তৃতা আরম্ভ করলেন এই বলে যে, "আমার 'স্পেশাল থিওরী অফ রিলেটিভিটির' সূত্র অনুসারে আকাশের মধ্যে গতি এবং সময়ের মধ্যে গতি এই দুটি গতি মিলিত ভাবে আলোর গতি সমান।" (Vectorial sum)

between mass and energy $E=MC^2$ সকলেই আইনস্টাইনের পৃথিবী বিখ্যাত সমীকরণ হিসাবে জানে এটিকে।

বাঙ্গালীবাবু জানেন হয়তো ম্যাক্সওয়েল সাহেব তাঁর ইলেট্রোম্যাগনেটিসম থিওরীতে প্রমাণ করেন যে আলোর তরঙ্গ "শক্তি" বহন করে। আলোর উৎসটির শক্তির ক্ষয় হয়। সেই রকম $E=MC^2$ সূত্র অনুযায়ী শক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হওয়ার জন্যে বস্তুটির ভরও হ্রাস পায়। সূর্য প্রতিনিয়ত আলো তথা শক্তি বিচ্ছুরণ করে। প্রতিনিয়ত সূর্যের ভরও হ্রাস- প্রাপ্ত হয়।

একই সূত্রের অনুসারে সামান্য তেজক্রিয় পদার্থের বিস্ফোরণে অর্থাৎ পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণে অসামান্য শক্তির বহিঃপ্রকাশ হয়। ফল, অকল্পনীয় সংহার। অনেকের মতে বিজ্ঞানের অভিশাপ? বিজ্ঞান দোষী নয়। বিজ্ঞানের অপব্যবহারকারীরা দোষী। নয় কি জয়ন্তবাবু?

১৯০৫ সালের ৩০ শে জুন মহামান্য এ্যালবার্ট আইনস্টাইন দুটি মহামুল্যবান তত্ত্বের অবতারণা করেন তাঁর জগৎবিখ্যাত সাধারণ আপেক্ষিকবাদ থিয়রীর মাধ্যমে।

(১) আপেক্ষবাদ মতবাদ (The Principle of Relativity):-

The laws of physics are the same in all inertial frame of reference.

সমস্ত স্থির অথবা সমগতি সম্পন্ন কাঠামোতে পদার্থ বিজ্ঞানের সমস্ত নিয়মাদি এক ও অনন্য।

(২) The speed of light in vacumm has the same value 'C' in all inertial frame of reference.

সমস্ত স্থির অথবা সমগতি সম্পন্ন আলো আর আকাশের শূন্যগর্ভের কাঠামোর মধ্যে আলোর গতির পরিমাণ "C" সর্ব্বক্ষেত্রে সমান।

(আধুনিক বিজ্ঞানের মতে Vacum এ আলোর গতি C = ২৯৯৭৯২৪৫৮ মিটার প্রতি সেকেন্ড।)

জয়ন্তের দিকে তাকিয়ে আপনি বললেন "জয়ন্ত মনে মনে চিন্তা কর যে কাশফুলে ভরতি মাঠ থেকে দুর্গা আর অপু দেখল তাদের বাবা ট্রেনে করে বাড়ী ফিরছেন। ওরা দেখল বাবা অপুর জন্যে কেনা বলটি সামনের দিকে জোরে ছুড়ে দিলেন। ট্রেনের গতি V_1। বাবার ছোড়া বলটির গতি V_2 অপু দেখল বলটির গতি V_1+V_2। অপুর তো খুব আনন্দ। বাবা তার জন্যে কি ভালই না বল কিনেছে। কত জোরে দৌড়ই বলটা। এবার দুর্গা আর অপু দেখল বাবা পকেট থেকে একটা টর্চ-বের করে জ্বালালেন আর সামনের দিকে ফোকাস

তো জানো যে লেজার এক প্রকারের নিদৃষ্ট দিশার আলো। আলোর গতিতে ভ্রমণ করে।

এরপর আপনাকে একটা অনুরোধ করলাম। বললাম, বাঙ্গালি আপনার কাছে তো স্পেসশিপ আছে। ঐ স্পেসশিপের গতি আমার ছাড়া লেজার রশ্মির থেকে বেশী। আপনি সহজেই মহাকাশের দিকে স্পেসশিপ চালিয়ে আমার ছাড়া লেজার রশ্মি ধরতে পারবেন। আপনার কাছে আমার অনুরোধ আপনি কি স্পেসশিপ চালিয়ে লেজার রশ্মিকে ধরে আমার জন্যে একমুঠো লেজার রশ্মি নিয়ে আসতে পারেন?

তুমি জয়ন্ত ছাপোষা সাধাসিধে বঙ্গসন্তান। আইনস্টাইনের মত একজন পৃথিবী বিখ্যাত মানুষ তোমার বসার ঘরে বসে তোমার সঙ্গে চা খাচ্ছেন। গর্ব্বে তোমার তো ছাতি ফুলে ৪৪ ইঞ্চি। তোমার বসার ঘরের জানালা, দরজা দিয়ে পাড়াপড়সীরা সব উঁকি ঝুঁকি মারছেন।

মহানুভব আইনস্টাইনের অনুরোধে তুমি লাফিয়ে উঠে সদর্পে বললে, "নিশ্চই পারি। স্যার আপনার অনুরোধ রাখতে একবার কেন একশবার পারি। এক মুঠো কেন? সঙ্গে শান্তিনিকেতনি ঝোলা ব্যাগ নিয়ে যাব। আপনার জন্যে একমুঠো নয় এক ব্যাগ ভরতি লেজাররশ্মি নিয়ে আসব।

আইস্টাইন তো তোমার ভাবভঙ্গী দেখে তাঁর বিখ্যাত গোঁফের পাশ দিয়ে মুচকে মুচকে হাসছিলেন।

ঐ হাঁসি দেখে তোমার মনে সন্দেহ হল তুমি ভাবলে তাই তো এক মুঠো লেজাররশ্মি বা এক ঝুড়ি লেজাররশ্মি এক রকম তো কোথাও শুনিনি। কোথাও পড়ি নি। কোথা দেখিনি। এমন কি T.V. তেও দেখিনি। কোন ফেরিওয়ালা ফেরি করছে লেজারওয়ালা, লেজার চায়, লেজার এ রকম কোথাও দেখিনি বা শুনি নি। আমেরিকায় WALLMART বিশাল দোকান। হেন জিনিষ নেই যা পাওয়া যায় না। ওখানেও তো দেখিনি সেল্ফে সেল্ফে ব্যাগ ভরতি লেজাররশ্মি রাখা আছে বিক্রির জন্যে। তবে?

অবশেষে রক্ষাকর্তা আইনস্টাইন বঙ্গসন্তানকে তাঁর অসহায় অবস্থা হতে মুক্ত করলেন। বললেন তাঁর বিশেষ আপেক্ষিকবাদ সূত্রের (Special theory of relativity) অনুসারে বিশ্বে আলোর গতিই হল যে কোন গতির শেষ কথা। এই গতিকে কেউই, কোন কিছুই কোনকালে, কোনস্থানে, কোন অবস্থায় অতিক্রম করতে পারে না।

আলোর গতিতে সময়ের প্রবাহ থেমে যায়। ঘড়ি চলা বন্ধ হয়ে যায়। ১ সেকেণ্ড থেকে ২ সেকেণ্ড। এর মধ্যবর্তী সময় হ্রাস পায়। আবার ২ সেকেণ্ড

এবং আপেক্ষিক সম্পর্কিত ভর ইত্যাদি ঘটনাগুলি শূন্য নয় কিন্তু বলা যায় এতই নগণ্য যে এগুলি প্রায় শূন্য। অণু পরমাণুর জগতে এদের প্রভাব প্রখর। মহাকাশের বহু ক্ষেত্রেও এই সব ব্যাপারে প্রভাব অসীম।

এই বলে হয়তবা আইনস্টাইন দম নেওয়ার জন্যে একটু থামলেন।

পেছনের সারীতে বসা একজন শ্রোতা গণ্যমান্য অতিথিটিকে বললেন "স্যার অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। একই রকম বক্তৃতা শুনতে শুনতে একেবারে Bore হয়ে গেছলাম। আপনার ভিন্নস্বাদের মনমুগ্ধকর বক্তৃতা খুবই উপভোগ করলাম।"

আইনস্টাইন বললেন, মনমুগ্ধকর মানে? বাংলা ভাল জানি না।

প্রশ্নকর্তা উত্তর দিলেন, মনমুগ্ধকর মানে চিত্তাকর্ষক। না না ওটাও তো বুঝবেন না। মনমুগ্ধকর মানে Mind refreshing. I feel refreshed in mind. আপনার বক্তৃতা শুনে।

আমার প্রশ্ন এই সবের কারণ কি? এই যে সময়ের হ্রাস বা ক্ষণের হ্রাস, দৈর্ঘ্য সঙ্কোচন, আপেক্ষিক সম্পর্কিত ভর—আলোর গতিতে এই সব হওয়ার কারণ কি? কঠিন কঠিন অঙ্ক ছাড়া আপনি যদি একটু বুঝিয়ে বলেন।

জয়ন্ত তোমার দিকে ফিরে রসিক আইনস্টাইন বললেন, আর এক কাপ চা হবে? আপনাদের এখানে মনমুগ্ধকর চা আমার খুব পছন্দ হয়েছে।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললেন, আপনাদের নিশ্চই মনে আছে আমি আপনাদের বলেছিলাম আমাদের বিশ্বের এই কাঠামোটি আকাশ আর সময় দিয়ে তৈরী। আকাশ আর সময় অবিচ্ছিন্ন। Inseparable। এই ব্যাপারটা আমরা প্রাত্যহিক জীবনে খেয়াল রাখি না বা এ নিয়ে চিন্তা করি না।

প্রকৃতির অন্যান্য সব বিষয়ের মধ্যে সময়ের সঠিক সংজ্ঞা আজ অবধি অনুচ্চারিত। বহু মনীষী সময়ের বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। যেমন সময় হল স্থায়িত্বের সচেতন অভিজ্ঞতা। কোন ঘটনার স্থায়িত্বের কাল কোন প্রক্রিয়ার স্থায়িত্ব কাল। কোন কর্ম্মের স্থায়িত্ব কাল। আইনস্টাইনের বললেন, আমার স্পেশাল থিয়োরী অফ রিলেটিভিটির মতে সময় প্রকৃতির অপর আর একটি দিশা। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ আর উচ্চতা এই তিনটি দিশার সঙ্গেই সময়ের সহ-অবস্থান অপর আর একটি দিশা হিসাবে।

সৃষ্টির ক্ষণ থেকেই সময় আবহমান। সেকেণ্ডের পর সেকেণ্ড। মিনিটের পর মিনিট। ঘণ্টার পর ঘন্টা। বছরের পর বছর। সময়ের প্রবাহের মধ্যে আকাশ বর্ত্তমান সদাসর্ব্বদা। সময় এবং আকাশ উভয়েই একত্বে বিশ্বাস করে না। একত্রে

নিউটনের ভুল ধারণা ছিল যে আকাশের মধ্যে গতি আর সময়ের মধ্যে গতি এই দুটি গতি, স্বতন্ত্র। এই দুটি গতির মধ্যে কোন রকম সম্পর্ক নেই। এই ধারণা সম্পূর্ণভাবে ভুল। অসত্য। ভ্রান্ত। সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।”

এই বলে মহামান্য আইনস্টাইন শ্রোতাদের দিকে চেয়ে বুঝতে পারলেন তাঁর বক্তব্যে অনেকেই বেশ বিস্মিত। বুঝতে পারলেন বহুদিনের ধারণাকে, নিত্যদিনের অভিজ্ঞতাকে পরিহার করে নতুন ধারণাকে গ্রহণ করতে অনেকেই দ্বিধাগ্রস্থ।

জয়ন্ত তোমার সম্মানীয় অতিথিটি উঠে দাঁড়িয়ে তোমাকে জিজ্ঞেস করলেন আপনার ছেলের ব্লাক বোর্ডখানি ব্যবহার করা যাবে কি? তোমার সম্মতিক্রমে উনি ব্লাকবোর্ডের কাছে দাঁড়িয়ে বললেন, “আপনাদের দ্বিধা দূর করার জন্যে আর সময়ের মধ্যে গতির ব্যাপারটি আপনাদের বুঝবার সুবিধের জন্যে আমি দুটি উদাহরণ দেব।

ধরুণ দুজন পাইলট রকেশ মিশ্র আর দুর্ব্বা ব্যানার্জী। এই দুজন পাইলট-কে বলা হল ঠিক উত্তর দিকে ১০০ কিলোমিটার ১০০ কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা গতিতে তাঁদের নিজ নিজ এরোপ্লেন ফ্লাই করতে।

রাকেশ মিশ্র তাঁর এরোপ্লেনে করে কম্পাস দেখে দেখে ঠিক উত্তর দিকে ১০০ কিলোমিটার ওড়ার পর বললেন তাঁর ১০০ কিমি প্রতি ঘণ্টা বেগে ১০০ কিঃ মিঃ উত্তর দিকে উড়তে ১ ঘণ্টা সময় লেগেছে। “সঠিক উত্তর।”
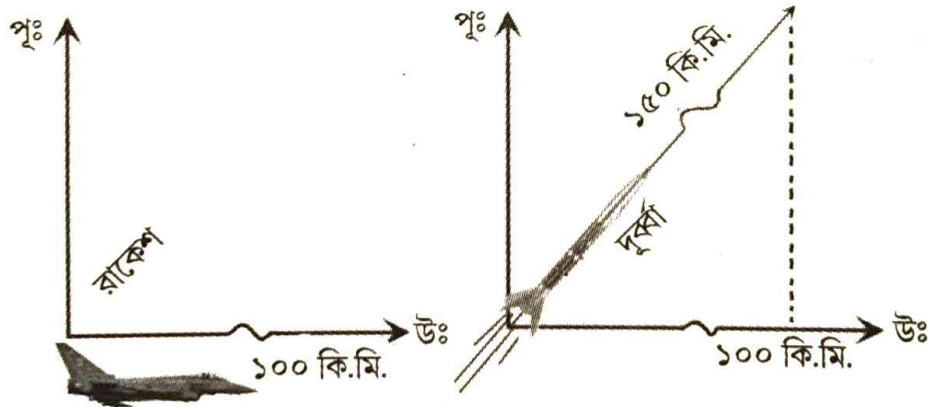
রিলেটিভিটি সময়ের গতিহ্রাস

দুর্ব্বার ব্যানার্জ্জীর এরোপ্লেনের কম্পাসটি খারাপ হয়ে যাবার জন্যে তিনি আন্দাজে উত্তর দিকে উড়তে গিয়ে সামান্য দিক পরিবর্তন করে উত্তর পূর্ব্ব দিকে উড়লেন। ফলে ১০০ কিঃ মিঃ উত্তরে যাওয়ার জন্যে তাঁকে উড়তে হল ১৫০ কিঃ মিঃ। সময় লাগলো ১ঘণ্টা ৩০ মিনিট। এই এক ঘণ্টা তিরিশ

মিনিটে দুর্ব্বা দেবী উত্তর দিকে উড়লেন ১০০ কিঃ মিঃ। উত্তর দিকে তাঁর গতি কমে দাঁড়াল ৬৬.৬৬ অর্থাৎ প্রায় ৬৭ কিঃ মি প্রতি ঘণ্টায়। তাঁর এই গতি কমে যাওয়ার কারণ তাঁর উত্তর দিকে কিছুটা গতি পূর্ব্ব-দিকে পরিবর্ত্তন করেছিলেন।"

এই বলে পণ্ডিত আইনস্টাইন একটু জল খেয়ে গলাটা ভিজিয়ে নিলেন।

এরপর পণ্ডিত মানুষটি তোমার দিকে তাকিয়ে বলতে শুরু করলেন। বললেন, "ধরুন আপনি গাড়ীতে বসে আছেন। ড্রাইভারের জন্যে অপেক্ষা করছেন। এই অবস্থায় আপনার পরিপ্রেক্ষিতে আপনার গাড়ী স্থির। রাস্তা ঘাট, গাছ পালা, বাড়ী সবই স্থির। স্থির আপনার পরিপ্রেক্ষিতে। স্থির আকাশের মধ্যে গতিতে। আমি আগেই বলেছি স্পেশাল থিওরী অফ রিলেটিভিটির সূত্র অনুসারে আকাশের মধ্যে গতি এবং সময়ের মধ্যে গতি এই দুইএর মিলিতগতি আলোর গতির সমান। আপনার স্থির অবস্থায় আকাশের মধ্যে গতি শূন্য। অতএব সময়ের মধ্যে গতি সর্ব্বাধিক। সময়ের মধ্যে গতি আলোর গতির সমান। সময়ের গতি আলোর গতির সমান কথাটি খেয়াল করবেন।

গাড়ীর ড্রাইভার ফিরে আসার পর আপনার গাড়ী চলতে আরম্ভ করে। আকাশের মধ্যে গতি ক্রমে ক্রমে বাড়তে শুরু করে। সঙ্গে সঙ্গে আনুপাতিক হারে আপনার গাড়ীর সময়ের মধ্যে গতি হ্রাস পেতে আরম্ভ কেরে ঠিক যেমন দুর্ব্বা দেবীর দিক পরিবর্তনের জন্যে উত্তরের গতি হ্রাস পেয়েছিল। সময়ের গতি আলোর গতির থেকে কম হতে শুরু করে। আপনার হাত ঘড়ি চলা স্লো হয়ে যায়। দেখুন গতি মানে কি? তার দু উত্তর :— গতি মানে নিদৃষ্ট দূরত্বকে ঐ দূরত্ব অতিক্রম করতে সময় দিয়ে ভাগ। আলোর গতি স্থির। অতএব সময় হ্রাস পেলে, দূরত্বও হ্রাস প্রাপ্ত হয়। হয় বলেই আলোর গতি স্থির। এই কারণেই আলোর গতির কাছাকাছি গতিতে আকাশের হ্রাসপ্রাপ্তি ঘটে। অমিতাভের গাড়ী ছোট হয়ে যায়। তাঁর দামী গাড়িও আস্তে চলে।

আইনস্টাইন তাঁর দীর্ঘ বক্তৃতার শেষে চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, "আশাকরি সময়ের হ্রাস (TIME DIALATION), দৈর্ঘ্য সঙ্কোচন (Length contrection) ব্যাপারগুলি এবং এইগুলি ঘটার কারণ আপনারা বুঝতে পেরেছেন। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের গতিতে এই ঘটনাগুলির পরিমাণ অত্যন্ত নগণ্য। তাই আমাদের এদের প্রভাবও অত্যন্ত নগণ্য। আর এই ভাবেই চলেছে আমাদের জগৎ।"

জেনারেল থিওরি অফ রিলেটিভিটি

দম নেবার জন্যে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর পুনরায় আপনার বক্তব্য আরম্ভ করলেন। "দেখ জয়ন্ত, স্পেশাল থিওরী আবিষ্কার করার সময় বিদুষী আইনস্টাইন জানতেন যে তিনি তাঁর থিওরীতে ব্রহ্মাণ্ডের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অন্তর্ভূক্ত করছেন না। বিষয়টি মাধ্যাকর্ষণ। (gravity)

১৯১৫ সাল। আইনস্টাইন বিশ্ববাসীকে উপহার দিলেন তাঁর অনন্য কীর্তি জেনারেল থিওরী অফ রিলেটিভিটি। একক প্রচেষ্টায় বিজ্ঞানকে শত যোজন এগিয়ে দিলেন।

ধরা থাক তুমি আর তোমার নতুন বন্ধু মহামান্য আইনস্টাইন বিমানে দার্জিলিং-এর পথে বাগডোগরা যাচ্ছ। তোমার প্রথম বিমান যাত্রা। বিমানের জানলা দরজা সমস্ত বন্ধ। জানলার সাটার নামান। বাইরের কোন কিছুই দেখা যাওয়ার উপায় নেই। বিমান চলেছে সমান গতিতে, বাগডোগরার অভিমুখে। বিমানের গতি মসৃণ। কানে ইয়ার ফোনে রবীন্দ্র সংগীত উপভোগ করছ তুমি।

জয়ন্ত, হঠাৎ তোমার মনে হল বিমানটি চলছে তো? পাশে বসা আইস্টাইনের হাতটি তোমার দুটো হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে ভীত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলে "আইনস্টাইন দাদা বিমানটি চলছে তো?"

আইনস্টাইন তোমার কাঁধে হাত রেখে তোমায় অভয় দিয়ে বললেন "ভয় নেই প্লেনটি উড়ছে বরং বলা উচিৎ অত্যন্ত ভালভাবে উড়ছে। তবে আপনার যে সন্দেহ প্লেনটি হয়ত বা স্থির মোটেই অমুলক সন্দেহ নয়। অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত সন্দেহ।"

তোমার সন্দেহ যে অমূলক নয় বোঝাবার জন্যে বললেন "দেখুন প্লেনটি এখন একেবারে স্থির। অপরিবর্ত্তিত গতিতে উড়ছে। অপরিবর্ত্তিত গতি অনুভূত হয় না। ত্বরান্বিত বা পরিবর্ত্তিত গতি অনুভুত হয়। আপনার মনে আছে নিশ্চয়ই প্লেনটি আকাশে ওড়ার সময় আপনার পিঠ চেয়ারে চাপ দিয়েছিল। তখন প্লেনের গতি ছিল প্রবলভাবে ত্বরান্বিত।"

প্লেনের স্পিকার হঠাৎ পাইলট সমস্ত যাত্রীদের সিটবেল্ট বেঁধে নিতে অনুরোধ করলেন। বললেন সামনে এয়ার পকেট থাকতে পারে। প্লেনে ঝাঁকুনি হতে পারে। পাছে কেউ সিট থেকে পড়ে গিয়ে আঘাত পায় তাই এই সাবধানতা।

AIR POCKET? বাতাসের পকেট? সেটা আবার কি? তোমার প্রশ্ন। আইনস্টাইন তোমায় বোঝালেন যে আবহমণ্ডলের উপরিভাগে কখন যখন

কোথাও বাতাসের ঘনত্ব অত্যন্ত কমে যায়। বাতাসের চাপকে কাজে লাগিয়েই এরোপ্লেনের উড়ান। কম ঘনত্বের বাতাস। ফলে অপ্রতুল বাতাসের চাপ। ফলে আকস্মিকভাবে এরোপ্লেনের উচ্চতার হ্রাস। বলা যায় এরোপ্লেনটির free fall হয়। আবহমণ্ডলের নিম্নস্তরে যখন প্লেনটি আবার ঘন বাতাস পায় তখন পুনরায় প্লেনটি সামনের দিকে উড়তে থাকে। এই নিম্নচাপের বাতাসের অংশটিকে এয়ার- পকেট বলে।

ধন্যবাদ আইনস্টাইন দাদা, এয়ার পকেট ব্যাপারটা খুব সরল ভাবে বুঝিয়ে দেবার জন্যে। কিন্তু সিট বেল্ট বাঁধার প্রয়োজন কেন? জয়ন্ত তোমার দ্বিতীয় প্রশ্ন। প্রশ্ন করার পরই তুমি আমতা আমতা করে বললে "দাদা আমার বোকা বোকা প্রশ্নের জন্যে আপনি রেগে যাচ্ছেন না তো? সত্যি বলতে কি আপনার কাছে কত নুতন জিনিস শিখছি। যদিও ইংরেজীতে বলে Little learning is a dangerous thing।"

আইনস্টাইন দাদা স্বদর্পে উত্তর দিলেন জানিনা কে বলেছে এই কথা। আমি বলি Little learning is much much better than no learning।

তোমার স্যার বললেন "যাই হোক আপনার প্রশ্নের উত্তরে বলি যে এরোপ্লেনটি এয়ার পকেটে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এরোপ্লেনটির ফ্রি ফল হয়। এরোপ্লেনটির ওড়ার উচ্চতা বেশ কিছুটা কমে যায় তাৎক্ষণিক ভাবে। এরোপ্লেনের সঙ্গে প্লেনে উপবিষ্ট সকলেরই ফ্রি ফল হয়। ফ্রি ফল মানে যদি আপনি এরোপ্লেন থেকে লাফ মারেন আপনি ভূপৃষ্ঠের দিকে পতিত হবেন। আপনার এই পতনকেই বলা হয় ফ্রি ফল।

এরোপ্লেনের সঙ্গে সঙ্গে আপনারও ফ্রি ফলের জন্যে হয়ত আপনি সিট থেকে পড়ে যেতে পারেন। আঘাত লাগতে পারে আপনার। সিট ব্লেট পরা থাকলে পড়ে যাওয়ার ভয় থাকে না।"

স্যার আইনস্টাইন বললেন "আপনি এখন প্লেনের সিটে বসে আছেন। প্লেনের সিটটি আপনার ফ্রি ফলকে বাধা দিচ্ছে। প্লেনের মেঝে সিটটি আপনার ফ্রি ফলকে বাধা দিচ্ছে। বাতাসের চাপ এরোপ্লেনের ফ্রি ফলকে বাধা দিচ্ছে। এমনকি আপনি যখন পৃথিবীর বুকে দাঁড়ান তখন পৃথিবীর মাটি আপনার ফ্রি ফলকে বাধা দেয়।

আপনার পা দুটি আপনার সমস্ত শরীরের ভর বহন করে। আপনার দুটি হাত দুই দিকে ঝুলে থাকে। এক কথায় আপনি আপনার ওজন অনুভব করেন। একটি ওজন মাপার যন্ত্রের ওপর দাঁড়ালে ওজন মাপার যন্ত্রটির কাঁটা আপনার ওজন নির্দ্দেশ করে। অথচ ঐ ওজন মাপার যন্ত্রটিকে আপনি যদি পায়ের সঙ্গে

বেঁধে এরোপ্লেন থেকে লাফ মারেন তবে আপনার ভূপৃষ্ঠের দিকে পতনের সময় আপনি দেখবেন ওজন মাপার যন্ত্রটির কাঁটাটি শূন্যের ঘরে। অর্থাৎ আপনার ওজন শূন্য। বাতাসের উপস্থিতি অগ্রাহ্য করলে আপনার মনে হবে আপনি শূন্যে ভাসছেন। বাস্তবে অবশ্য বাতাস আপনার নিম্নগামী গতি রুদ্ধ করার চেষ্টা করবে। ধরুন আপনি আপাদমস্তক কোন ধাতুর তৈরী একটি প্রেসারাইজ স্পেশ সুট পরে আছেন। ফলে বাতাসের উপস্থিতি আপনি অনুভব করতে পারবেন না। (বাস্তবে স্পেশ সুটটির নিম্নগতি বাতাসের জন্যে বাধাপ্রাপ্ত হবে। আপনি যেহেতু স্পেসারাইজ স্পেস সুটের অভ্যন্তরে আছেন আপনার নিম্নগামী গতি অপ্রতিহত থাকবে। ফলে আপনার ফ্রি ফল হবে। স্পেশ সুটটির ফ্রি ফল হবে না বাতাসের বাধার জন্যে। স্পেশ সুটের নিম্নগামী গতি কম হবে আপনার গতির থেকে। যদি পা ভূপৃষ্ঠের দিকে করে আপনার গতি হয় তখন দেখবেন ওজন নেওয়ার যন্ত্রের কাঁটাটি সামান্য ওজন নির্দ্দেশ করছে। বোঝবার সুবিধের জন্যে এই সামান্য বাতাসের বাধা অগ্রাহ্য করা যাক) এই অবস্থায় আপনি ভাবতে পারেন আপনি আকাশে ভাসছেন। মহাকাশচারীদের পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ ছাড়িয়ে যাওয়ার পর ঐ একই রকম অনুভূতি হয়। তাঁরাও তখন রকেটের মধ্যে শূন্যে ভাসমান অবস্থায় থাকে। রকেটের গতি বৃদ্ধি পেতে থাকলে মহাকাশচারীরাও তখন রকেটে দাঁড়াতে সমর্থ হয়। অর্থাৎ নিজেদের ওজনের অনুভূতি হয়। ওজন নেওয়ার যন্ত্রে তখন আর শূন্য ওজন দেখায় না। রকেটের ত্বরান্বিত গতি ক্রমশ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মহাকাশচারীদের ওজন-ও বাড়তে থাকে এক সময় তাঁদের ওজন ভূ-পৃষ্ঠে তাঁদের ওজনের সমান হয়ে যায়। রকেটটির ত্বরান্বিত গতি যত বেশী হতে থাকে। মহাকাশচারীদের ওজনও সেই অনুপাতে বেশী হতে থাকে।

অতএব বলা যায় মাধ্যাকর্ষণ বল ও ত্বরান্বিত গতির বল এক। মাধ্যাকর্ষণ বলটি আসলে ত্বরান্বিত গতির বল। এইটিকেই বলা হয় principal of equivalance.)

জ্ঞানী আইনস্টাইন অনেকক্ষণ ধরে প্রিনসিপ্যাল অফ ইকুইভ্যালেন্স বোঝাবার পর দম নেওয়ার জন্য সামান্য চুপ করলেন। বিমান সেবিকাকে এক গ্লাস খাবার জলের জন্যে অনুরোধ করলেন। তোমার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন বাঙ্গালী বাবু আমার থিওরী প্রিনসিপ্যাল অফ ইকুইব্যালেন্স ভাল করে বুঝেছেন তো?

তোমার উত্তর আইনস্টাইন দাদা পৃথিবীতে আপনার থেকে ভাল সহজ করে বোঝাবার আর কেউ আছে কি?

ভারতের সম্ভ্রান্ত অতিথিটি মুচ্‌কে হেসে বললেন, আসলে মাধ্যাকর্ষণ বল

বলে কিছু নেই। ত্বরান্বিত বা গতির পরিবর্তনের জন্যে যে বল সেটিই মাধ্যাকর্ষণ বল। গতির পরিবর্তনের জন্যে বল ও মাধ্যাকর্ষণ বল একই মুদ্রার দুটি দিক।

নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ বলের সংজ্ঞা সম্পূর্ণভাবে নির্ভুল নয়।

নিউটনের মত প্রখর বুদ্ধিমান ব্যক্তি বুঝেছিলেন যে তিনি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার অনুল্লেখিত রেখে যাচ্ছেন। ব্যাপারটি হল মাধ্যাকর্ষণ বল কি ভাবে কাজ করে? সূর্য এবং তার গ্রহগুলির মধ্যে বিশাল দূরত্ব অতিক্রম করে কি ভাবে সূর্যের মাধ্যাকর্ষণ বল গ্রহগুলিকে নিজের দিকে আকর্ষিত করে? নিউটনের মতে এই মাধ্যাকর্ষণ বল কাজ করে তাৎক্ষণিক ভাবে।

আইনস্টাইন দাদা বললেন, তাৎক্ষণিক ব্যাপারটি আপনাকে বুঝিয়ে বলি। অনুমান করুন কোন কারণে সূর্য উধাও হয়ে যায়। সূর্যের অস্তিত্বের বিলুপ্তি। নিউটনের মতে সূর্যের বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সূর্যের মাধ্যাকর্ষণ আকর্ষণেরও বিলুপ্তি ঘটে। ফলে সূর্যের গ্রহগুলি কক্ষচ্যুত হয়ে মহাকাশের উদ্দেশ্য পাড়ি দেয়। পাড়ি দেবার ব্যাপারটি তাৎক্ষণিক। সূর্যের উধাও হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই। এই তথ্য ভুল। ব্রহ্মাণ্ডের কোন কিছুই আলোর গতিকে অতিক্রম করতে পারে না।

এছাড়া তৎকালীন মহাকাশীয় বৈজ্ঞানিকরা বুধগ্রহের কক্ষের পেরিহেলিয়ন বিন্দুটির স্থানচ্যুত হওয়ার কারণের ব্যাপারটি নিউটনের থিয়োরীর দ্বারা প্রমাণ করতে কৃতকার্য্য হচ্ছিলেন না। বুধ কক্ষের পেরিহেলিয়ান বিন্দুটি সূর্যকে পদক্ষিণ করে প্রতি ৩০ লক্ষ বছরে একবার। অর্থাৎ বুধের কক্ষের পরিবর্তন হয়। যদিও অত্যন্ত কম এই পরিবর্তন। আমি আমার জেনারাল থিয়োরী অফ রিলেটিভিটির সাহায্যে এইটি প্রমাণ করি।

জলের গ্লাসে গলা ভিজিয়ে মহামান্য আইনস্টাইন বলেন, বাঙ্গালীবাবু এবার মন দিয়ে শুনুন মাধ্যাকর্ষণ মানে কি? এই বলে তিনি মাধ্যাকর্ষণের এক অকল্পনীয় রূপ বর্ণনা করলেন। মাধ্যাকর্ষণের রূপ? ঠিক তাই। বললেন, Gravity is the geometric distortion in the fabric of space and time by energy or by pressure or by any massive body.

কোন ভর বিশিষ্ট বস্তুর উপস্থিতি অথবা কোন শক্তির উপস্থিতি অথবা কোন চাপের উপস্থিতি আকাশ আর সময়ের সমন্বয়ে তৈরী সমতল চাদরটিকে অসমতল করে। ঐ অসমতল জায়গাটিই বা ক্ষেত্রটিই মাধ্যকর্ষণ।

ধরুণ আমাদের বিশ্বটি আকাশ আর সময়ের সুতো দ্বারা তৈরী একটি বিশাল অদৃশ্য চাদর। চাদরটি রবারের মত। চাপে বড় হয়। চাপ সরিয়ে নিলে পূর্ব্ব অবস্থায় ফিরে আসে। একটি ভারী বস্তু যেমন ধরুণ একটি লোহার বল। এই
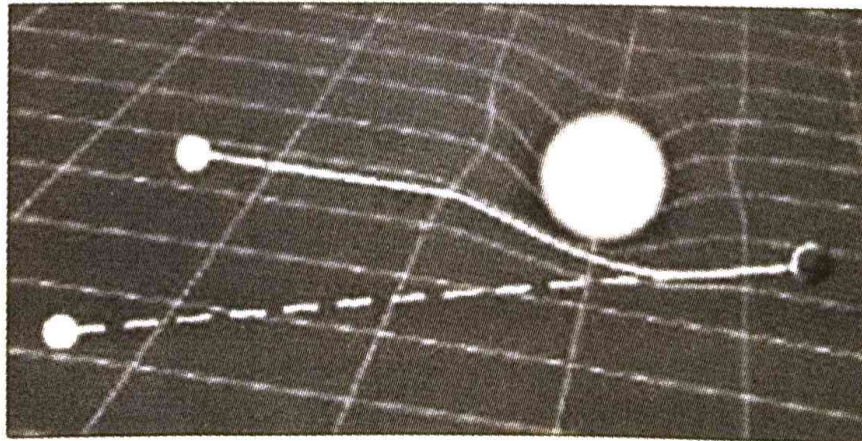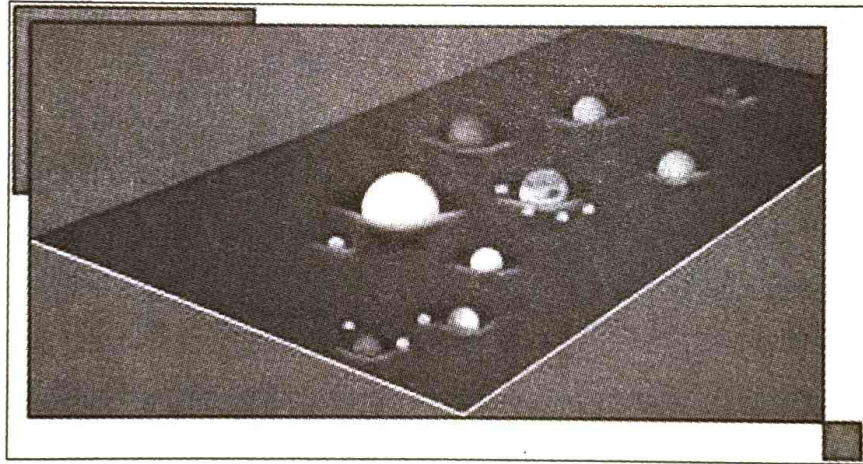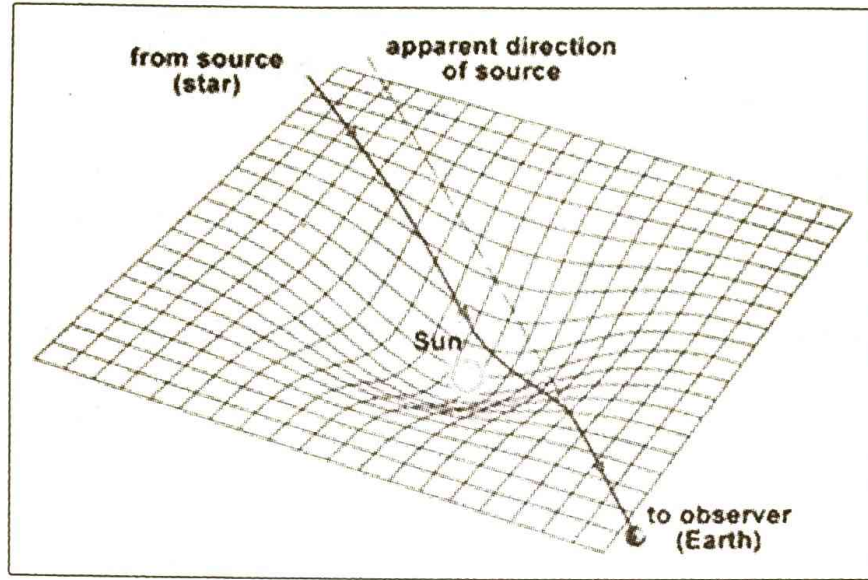
রিলেটিভিটি গুরুভর পদার্থের উপস্থিতিতে সময় ও আকাশের চাদরে ভাঁজ

বলের অবস্থানে চাদরটিতে একটি গর্তের সৃষ্টি হয়। বলটি চাদরটিকে মোচড় দেয় তার পারিপার্শ্বিক জায়গায়। এখন যদি একটি ছোট বল চাদরটির মধ্যে গড়িয়ে দেওয়া হয়, ছোট বলটির গতির দিক নির্দ্ধারিত হয় চাদরটির ভারী বলটির অবস্থানের ফলে ভাঁজ অনুসারে। যদি ছোট বলটির সঠিক গতি থাকে তবে ছোট বলটি বড় বলটিকে একটি নিদৃষ্ট কক্ষে আবর্তন করতে থাকবে। ঠিক যেমন পৃথিবী সূর্যকে পদক্ষীণ করে। যদি ছোট বলটির গতি কম হয় তখন ছোট বলটি বড় বলটিকে ধাক্কা দেবে। অতঃপর বড় বলটির পাশেই অবস্থিত হবে। যদি ছোট বলটির গতি বেশি হয় তখন সেটি চাদরের ভাঁজটিকে অনুসরণ করে ভাঁজের বাইরে চলে যাবে বিপরীত দিকে।

একইভাবে আলোর রেখা যখন এইরকম কোন আকাশ আর সময়ের সমন্বয়ে তৈরী চাদরটির ভাঁজের মধ্যে দিয়ে গমন করে রেখাটি ভাঁজটিকে অনুসরণ করে। ফলে কোন ভারী বস্তুর অবস্থানের স্থলের ঠিক পাশ্ববর্তী অংশে আলোর রেখা বক্র হয়। পৃথিবী এবং কোন নক্ষত্রের মাঝে সূর্যের অবস্থানের ফলে পৃথিবী থেকে নক্ষত্রটিকে দেখা সম্ভব হয়। অবশ্য সাধারণ দিনে সূর্য্যের উজ্জ্বলতায় দিনের বেলায় আকাশে নক্ষত্র দৃশ্যমান নয়। কেবলমাত্র পূর্ণ সূর্য-গ্রহণের সময় আকাশে সূর্যের বর্তমানের সময়ও নক্ষত্র দেখা যায়। এই সময় সূর্যের অপরদিকে অবস্থিত কোন নক্ষত্র (যাকে সাধারণ অবস্থায় দেখা যাওয়া উচিৎ নয়) থেকে নির্গত আলোর রেখা সূর্যের মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্রে বক্র হয়। ফলে পৃথিবীতে নক্ষত্রটিকে সামান্য স্থানচ্যুত অবস্থায় দেখা যায়। এই ব্যাপারটি আমার থিওরী অফ রিলেটিভিটির যথার্থতা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে। ছবিতে এই ব্যাপারটি পরিষ্কার বোঝা যাবে।

যে কোন ভরবিশিষ্ট বস্তুই আকাশ আর সময়ের চাদরটিকে মোচড় দেয়। গুরুভর বস্তু বেশী মোচড় দেয়। একটি নক্ষত্রমণ্ডলীর ভর একটি তারার ভরের চেয়ে অনেক বেশী। ফলে একটি নক্ষত্রমণ্ডলী আকাশ আর সময়ের চাদরটিকে অনেক বেশী মোচড় দেয়। ফলে নক্ষত্রমণ্ডলীর পাশ্ববর্ত্তী অঞ্চলে আলোর গতিপথের বক্রতাও ততধিক বেশী। এর ফলে কখনও কখনও বাস্তবে একটি নক্ষত্রকে দুটি নক্ষত্র হিসেবে দেখা যায়। ছবিতে এই ব্যাপারটি স্পষ্ট বোঝা যাবে। এই ব্যাপারটিকে গ্র্যাভিটেশনাল লেনসিং বলা হয় (Gravitational lensing)। গ্র্যাভিটেশনাল লেনসিং-এর জন্যে দূরবর্ত্তী নক্ষত্র বা নক্ষত্রমণ্ডলীর চতুঃপার্শ্বে বিভিন্ন রংঙের সংমিশ্রণের রিং বা আর্দ্ধ রিং দেখা যায়। মধ্যের নক্ষত্রমণ্ডলীটি লেন্সের কাজ করে। অনুরুপ ভাবে একটি নক্ষত্রমণ্ডলীর গুচ্ছ (Galaxy cluster) একটি (Lence) লিন্সে হিসাবে কাজ করে। একটি

নক্ষত্রমণ্ডলীও অন্যথায় অদৃশ্য দৃশ্যমান হয় এই ভাবে বৈজ্ঞানীরা অনেক নক্ষত্র এবং নক্ষত্রমণ্ডলী যাদের সরাসরি দেখা যায়না তাদের উপস্থিতি জানতে পারেন। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের ভর নির্ণয়ে সাহায্যে করে। বৈজ্ঞানিকরা বলেন গ্র্যাভিটেশনাল লেন্সিং হল প্রাকৃতিক দূরবীন, (Natures telescope)
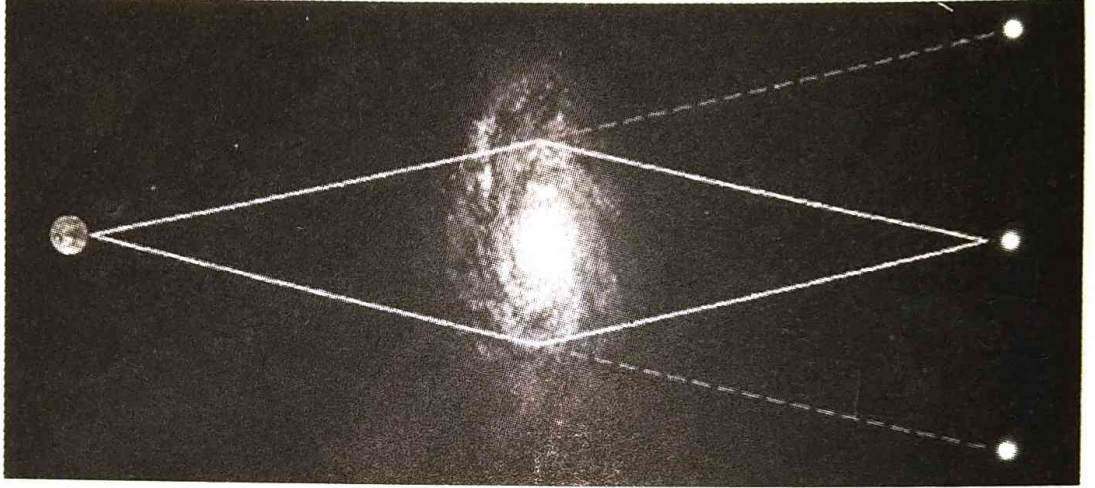
গ্র্যাভিটেশনাল লেন্সিং

এই বলে আইনস্টাইন দাদা কিছুক্ষণ চুপ করে হয়ত কিছু চিন্তা করলেন। আবার বলতে আরম্ভ করলেন "দেখুন আমার জেনারেল থিওরীর ফিল্ড ইকিউয়েশনগুলি ব্যবহার করে বিশ্বের অনেক ব্যাপারে অনুমান করা সম্ভব। বহুক্ষেত্রে পরবর্ত্তীকালে প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির ফলে এইসব অনুমান যথার্থভাবে প্রমাণিত হয়েছে। আমার GTR প্রকাশিত হওয়ার কয়েক মাসের মধ্যেই GTR -এর ফিল্ড ইকিউয়েশনগুলি ব্যবহার করে জার্ম্মানির কার্ল সোয়াজারচাইল্ড (KARAL SCHWARZSCILD) বিশ্বের আকাশ আর সময়ের কাঠামোটির মধ্যে ব্লাকহোলের সম্ভাব্য উপস্থিতি গণিতিকভাবে প্রমাণ করেন। প্রমাণ করেন অত্যন্ত বেশী ভরবিশিষ্ট মহাকাশীয় বস্তু আকাশ আর সময়ের কাঠামোটিকে এতটাই মোচড় দিতে সক্ষম যে কাঠামোটির ঐ অংশটির সংকোচনের ফলে বিন্দুতে পরিণত হয়। ঐ বিন্দুটিকে বলা হয় SINGULARITY বিন্দুটিকে কেন্দ্র করে একটি গোলকের সৃষ্টি হয়। গোলকটির ব্যসকে বলা হয় (EVENT HORIZON) ইভেন্ট হরাইজন। বিশ্বের যে কোন বস্তু ঐ ইভেন্ট হরাইজনের লক্ষণরেখাটি অতিক্রম করলেই বস্তুটির বিলুপ্তি ঘটে ব্লাকহোলের ঐ অতল গহ্বরে। ব্লাকহোলের অসীম মাধ্যাকর্ষণ আলোর বহিঃগমনকেও রুদ্ধ করে। ফলে ব্লাকহোল দৃশ্যমান নয়। অদৃশ্য। ব্লাকহোলের প্রবল মাধ্যাকর্ষণের আকর্ষণে পারিপার্শ্বিক তারাদের আচরণের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যায়। এ ছাড়াও আরো

বিভিন্ন উপায়ে ব্লাক হোলের উপস্থিতি প্রমাণ করা সম্ভব।" (ব্লাক হোলের বিস্তারিত বিবরণ ৮৮ পৃষ্ঠায়)।

জলের গ্লাসে একটু গলাটা ভিজিয়ে নিয়ে মহামান্য অতিথিটি বললেন, "আমার জেনারেল থিওরী অফ রিলেটিভিটির ফিল্ড ইকিউয়েশন দ্বারা মহাকাশীয় বস্তুর ভর অনুসারে আকাশ আর সময়ের কাঠামোটির আকৃতির পরিবর্ত্তনের পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভব। অন্য কোন মহাকালীয় বস্তুর ওপর এর প্রভাবও নির্ণয় করা সম্ভব। আমার ফিল্ড ইকিউয়েশনগুলি তুলনামুলকভাবে জটিল। অন্যদিকে পৃথিবীর প্রাত্যহিক জীবনে যে সব গতি বা ভর নিয়ে আমরা কাজ করি তাতে নিউটনের ইকিউয়েশনের উত্তর প্রায় নির্ভুল। তাই নিউটনের সূত্রগুলি আজও বহুল ভাবে ব্যবহৃত।

আইনস্টাইন দাদা তোমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "দেখুন আমার জেনারেল থিয়োরী প্রকাশের পুর্ব্ববর্তীকালে বিশ্বের আয়তন, বিশ্বের আকার আকৃতি এবং বিশ্বের বয়স সম্বন্ধে ধারণা ছিল সম্পূর্ণ ভুল।

তৎকালীন বুদ্ধিজীবিদের ধারণা ছিল বিশ্বটি চিরস্থির, চিরস্থায়ী এবং অনন্ত এর বিস্তার। স্থানীয়ভাবে কিছু পরিবর্তন স্বম্ভব। সম্পূর্ণ বিশ্বের আকার এবং আয়তন চিরস্থায়ী, অপরিবর্ত্তনীয় এবং স্থির।

বললেন "আমার জেনারেল থিওরীর মতানুসারে বিশ্বের আয়তন কখনই স্থির হওয়া সম্ভব নয়। সর্ব্বক্ষণ বিশ্বের আয়তন সঙ্কুচিত হয় অথবা সম্প্রসারিত হয়। স্থির আয়তনবিশিষ্ট বিশ্ব অসম্ভব।

আরো বললেন "১৯২৯ সালে আমেরিকার এডউইন হাবল ক্যালিফোর্নিয়ার মাউন্ট উইলসন অবজারভেটরির ১০০ ইঞ্চি দূরবীক্ষণ যন্ত্রে পর্যবেক্ষণ করেন যে কয়েকটি ছায়ামণ্ডলীর পরস্পরের দূরত্ব বর্ধিত হচ্ছে। অর্থাৎ পরস্পরের থেকে ছায়ামণ্ডলীগুলি দুরে সরে যাচ্ছে। বর্তমানে মহাকাশে ঘূর্ণীয়মান হাবল টেলিস্কোপ ও অন্যান্য আরো অনেক শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে প্রমাণ করা হয়েছে যে, সমস্ত ছায়ামণ্ডলী পরস্পরের চেয়ে দুরে সরে যাচ্ছে সর্ব্বক্ষণ। অর্থাৎ আমাদের বিশ্বটির সম্প্রসারিত হচ্ছে সদাসর্ব্বদা। হাবল এই সম্প্রসারণের গতিও নির্দ্ধারণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি প্রমাণ করেছিলেন অধিক দুরবর্তী ছায়াপথের দূরে চলে যাওয়ার গতিও অধিক। যেমন যে ছায়াপথের দুরত্ব পৃথিবী হতে ১০০ মিলিয়ন (১০ কোটি) আলোকবর্ষ তার আমাদের থেকে দূরে সরে যাওয়ার গতি ৫.৫ মিলিয়ন মাইল প্রতি ঘণ্টায়। যে ছায়াপথের দূরত্ব ২০০ মিলিয়ন আলোকবর্ষ তার দুরে সরে যাওয়ার গতি ১১ মিলিয়ন মাইল

প্রতি ঘণ্টায়। যার দুরত্ব ৩০০ মিলিয়ন আলোকবর্ষ হার তার দুরে সরে যাওয়ার গতি ১৬.৫ মিলিয়ন মাইল প্রতি ঘণ্টায়। বিশ্ব ক্রমবর্দ্ধমান।

এই তথ্য দিয়ে আমরা আমাদের জগতটির বয়স নির্দ্ধারণ করতে পারি ইনটারপোলেট করে।

জয়ন্ত তোমার প্রশ্ন "কিছু মনে করবেন না স্যার। ইনটারপোলেট মানে?"

অসীম ধৈর্যশীল আইনস্টাইন দাদার পাল্টা প্রশ্ন "আপনার উচ্চতা (হাইট) কত?

সাড়ে ৫ ফিট তোমার উত্তর।

আইনস্টাইন দাদা বললেন, মানে ৬৬ ইঞ্চ। ধরুণ আপনার জন্মক্ষণ থেকে আপনার লম্বা হওয়ার গতি সর্ব্বসময় স্থির। আপনি মেপেছেন যে আপনার লম্বা হওয়ার গতি বছরে ২ ইঞ্চ। অতএব আপনার এখন বয়স ৬৬ কে ২ দিয়ে ভাগ। ৩৩ বছর। একে বলে ইনটারপোলেসন।

ইনটারপোলেট করে আমরা যেমন অতীতের ব্যাপার জানতে পারি এক্সট্রাপোলেট করে আমরা ভবিষ্যৎ অনুমান করতে পারি। আপনি যেমন বলতে পারেন ২ বছর পর আপনার হাইট আরো ৪ ইঞ্চি বাড়বে যদি আপনার উচ্চতা বাড়ার গতির কোন পরিবর্ত্তন না হয়।

দাদা বললেন, "আমার জেনারেল থিওরীর ব্যাপারে আর একটা কথা যদি সূর্য এই মূহুর্তে বিলুপ্ত হয়ে যায় তবে আকাশ আর সময়ের যে স্থানে সূর্যের অবস্থান সেই অংশটি পুনরায় সমতল হয়ে যাবে। সূর্যের উপস্থিতির জন্যে আকাশ আর সময়ের কাঠামোটিতে যে গর্তের সৃষ্টি হয়েছিল সেটি বুজে যাবে। এই বুজে যাবার ব্যাপারটি ঘটবে তাৎক্ষণিকভাবে নয়। ঘটবে আলোর গতিতে। সূর্যের অবস্থানের স্থান প্রথমে সমতল হবে। ক্রমে ক্রমে দূরবর্তী স্থানগুলিও সমতল হয়ে যাবে। অনেকটা একটি তরঙ্গের প্রবাহের মত। এই তরঙ্গের প্রবাহকে বলা হয় গ্রাভিটেশন ওয়েভ। এবং এই প্রবাহের গতি হবে আলোর গতির সমান। অর্থাৎ সূর্য বিলুপ্ত হওয়ার ৮ মিনিট পরে পৃথিবী কক্ষচ্যুত হবে। সূর্যের আলো পৃথিবীতে পৌঁছতে ৮ মিনিট সময় নেয়। সূর্যের বিলুপ্তির ৬ ঘণ্টা পরে প্লুটো গ্রহের কক্ষ্যচুতি ঘটবে। সূর্যের বিলুপ্তির পরও সূর্যের মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব থাকবে। প্রভাব থাকবে ততক্ষণ যতক্ষণ না সূর্য ও তার পাশ্ববর্ত্তী স্থান সমতল হয়। মাধ্যাকর্ষণ তাৎক্ষণিকভাবে কাজ করে না। নিউটনের ধারণা ছিল সম্পূর্ণ ভুল।

আইনস্টাইনদাদা ঘড়ি দেখে বললেন, আমাদের বাগডোগরা পৌঁছতে আর

দেরী নেই। আমার থিওরী অফ রিলেটিভিটি সম্বন্ধে আপনাকে সংক্ষেপে বললাম। আশাকরি আপনার মোটামুটি একটা ধারণা হয়েছে।

আমাদের বাঙ্গালীবাবুর উত্তর, 'দাদা আপনাকে কি বলে যে ধন্যবাদ দেব?'

বলতে বলতেই স্পিকারে বিমান সেবিকা ঘোষণা করলেন আমাদের বিমান বাগডোগরায় অবতরণ করতে যাচ্ছে। দয়াকরে যেন সবাই সিটবেল্ট বেঁধে নিন। বাগডোগরার আবহাওয়া পরিষ্কার। বাইরের টেমপারেচার ২২ ডিগ্রী সেলসিয়াস।

জয়ন্ত তুমি অনুভব করলে বিমান বাগডোগরার ভূমি স্পর্শ করল। বিমানের প্রবলভাবে গতিহ্রাসের ব্যাপারটি অনুভব করলে। তোমরা নির্বিঘ্নে বাগডোগরা পৌঁছলে।

(বোঝার সুবিধার জন্যে আকাশ আর সময়ের "চাদর" বলা হয়েছে। ছবিতেও অনুরূপভাবে দেখান হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে আকাশ আর সময়ের কাঠামোটির দিক তিনটি Three Dimensional. চাদরের মত দুটি দিশা নয় Two dimensional নয়)।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে আপনি বললেন "চল জয়ন্ত আজকের মত এখানেই আমাদের সভা ভঙ্গ করা যাক। নচেৎ যে চিরকুটটি এতক্ষণ আশা উচিত ছিল, এল বলে আর সেটির matter যে খুব এক চিত্তাগ্রহী হবে না তা বলাই বাহুল্য। অতএব আজকের মত good day। সময় পেলে আবার এস যে কোন সন্ধ্যের সময়।

পরের মুলাকাতে বলের কথা বলব। খেলার বল নয়। ব্রহ্মাণ্ডের চারটি মৌলিক বলের খেলা।

জয়ন্ত Mind how you go and good day once again my friend.

পঞ্চম অধ্যায়

বলের খেলা খেলার বল নয়

আপনি গরমের সন্ধ্যায় ছাদে খোলা আকাশের নিচে আরাম কেদারায় বসে তারা দেখছেন।

সিঁড়িতে জয়ন্তর পদধ্বনি।

চেয়ারে বসতে বসতে জয়ন্ত বলে "It is not enough to have a good mind. The main thing is to use it well.

দাদা বলতে পারেন কার quotation এটি? কার উক্তি?

রেনে ডেকারটেস? আপনার জিজ্ঞাসা।

১০০ তে একশ। মৃদু হেসে জয়ন্তর উত্তর।

আপনি বললেন "সতেরোশো শকাব্দের ফ্রান্সের বিখ্যাত গণিতজ্ঞ এবং দার্শনিক। x, y, z cartesian কো অর্ডিনেট, $১০০=১০^২$, $১০০০=১০^৩$ indices-এর উদ্ভাবক। দেখ জয়ন্ত এই উক্তিটি খুবই বর্হুমুখী উক্তি। আরো অনেক কিছুতেই সমভাবে প্রাসঙ্গিক। যেমন ধর

It is not enough to have good intelligence বা বুদ্ধি বা ধর বিদ্যা, জ্ঞান অথবা ধার্ম্মিকতা। এই সবগুলিই যথার্থ ব্যবহার বিনা অর্থহীন।

জয়ন্ত প্রশ্ন করে "দাদা দেখছি দূরবীক্ষণটা সেট করেছেন।"

আপনি : হাঁ বন্ধু বৃহস্পতিতে লগ করা আছে।

জয়ন্ত : হঠাৎ বৃহস্পতি।

আপনি : বৃহস্পতি আজ পৃথিবীর সব থেকে কাছে। দূরত্ব ৬৮ কোটি মাইল। ৬ মাস আগেও ছিল আরও ৩৩ কোটি মাইল দূরে। বৃহস্পতির ভর পৃথিবী হতে ৩১৮ গুণ বেশী। সৌর মণ্ডলের সর্ববৃহৎ। মূলত হাইড্রোজেন গ্যাস এবং সামান্য হিলিয়াম গ্যাস, এই দিয়েই গ্রহটি তৈরী। প্রচন্ড ঘূর্ণি ঝড় আর বিশাল গতিতে ঝোড় হাওয়া এই হল এর আবহাওয়া। জয়ন্ত দুরবীক্ষণে দেখ। স্পষ্ট দেখতে পাবে বৃহস্পতির great red spot। পৃথিবীর দ্বিগুণ বড় ৩০০ বছর ধরে বৃহস্পতির বুকে বইছে প্রচন্ড ঘূর্ণি ঝড়। এই বিশাল গ্রহের ঘোরার গতিও

প্রচন্ড। পৃথিবীর ২৪ ঘন্টা, বৃহস্পতির মাত্র ১০ ঘন্টা। মোটেই স্বাস্থ্যকর জায়গা নয়। কি বল জয়ন্ত?

যা বলেছেন দাদা। আচ্ছা দাদা এত বড় গ্রহ। কয়েকশ বছরের মধ্যে আজ আমাদের নিকটস্থ দূরত্বে। এর মাধ্যাকর্ষণের টান অনুভব করা যাবে না?

আপনার জবাব "আমি নিউটনের সূত্রের সাহায্যে অঙ্ক কষে দেখলাম বৃহস্পতির তোমার ওপর মাধ্যাকর্ষণের টান পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ টানের থেকে ৩.৪ কোটি গুণ কম। অর্থাৎ প্রায় শূন্য।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর আপনি বললেন "জয়ন্ত এই বলের প্রসঙ্গে তোমায় বলি আমাদের এই জগতটির জন্মক্ষণ থেকেই যা কিছু ঘটেছে, যা কিছু ঘটছে, এমনকি যা কিছু ঘটবে এই সবেরই মূলে রয়েছে মাত্র ৪টি মৌলিক বল। Four Basic forces. Yes জয়ন্ত yes। বিশ্বাস কর মাত্র ৪টি মৌলিক বল। অবিশ্বাস্য মনে হলেও এই উক্তি বর্ণে বর্ণে সত্যি। আমার হয়ত বলা উচিত ৩টি মৌলিক বল। হালে দুটি বলের সংযুক্তিকরণ প্রমাণিত হয়েছে।

সার্বিকভাবে বিশ্ব পরিচয় জানার জন্য এই চারটি বলের পরিচয় জানা আবশ্যক। চারটি বল :—

১) মাধ্যাকর্ষণ বা Gravity
২) ইলেকট্রোম্যাগনেটিক বল
৩) স্ট্রং নিউক্লিয়ার বল (Strong Nuclear force)
৪) উইক নিউক্লিয়ার বল (Weak Nuclear force)

১) মাধ্যাকর্ষণ বল : জয়ন্ত এই বলটি সম্বন্ধে অল্প বিস্তর সবাই জানি। নিউটন সাহেবের প্রসিদ্ধ উক্তি "আপেল গাছ থেকে মাটিতেই পড়ে।" শূন্যে বিলীন হয়ে যায় না। চাঁদ পৃথিবীর চারিদিকে সদা আবর্তমান। পৃথিবী আর সূর্যের অন্যান্য গ্রহগুলি সূর্যকে প্রদক্ষিণে মত্ত। আমাদের তারামন্ডলী মিল্কিওয়ে তার পরিবারে ৪০ হাজার কোটি তারাদের সঙ্গে আপন কেন্দ্রিয় কক্ষপথে আবর্তমান।

ব্রহ্মান্ডের সমস্ত ভরবিশিষ্ট পদার্থেই এই বলটির অস্তিত্ব বর্তমান। পদার্থের ভরের ওপরই মাধ্যাকর্ষণ বলটি সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। ভারী পদার্থের এই বলটি বেশী। হাল্কা পদার্থে বলটির পরিমাণ কম। সূর্যের মাধ্যাকর্ষণ বল পৃথিবীর থেকে বেশী। চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ বল আমাদের থেকে কম।

মাধ্যাকর্ষণ বল প্রধানত একটি আকর্ষণীয় বল (Attractive Force। যে কোন বস্তু যারই ভর আছে সেটিই অন্য একটি বস্তুকে নিজের দিকে আকর্ষিত করে। একজন স্কাইডাইভার এরোপ্লেন থেকে পৃথিবীর আকর্ষণের ফলে যেমন

ভূপৃষ্ঠের দিকেই ধাবিত হতে থাকে ঠিক সেই রকম ভাবে স্কাইডাইভাবটিও সমস্ত পৃথিবীকে তাঁর নিজের দিকে আকর্ষিত করে। তুলনায় পৃথিবীর অধিক ভরের জন্যে স্কাইডারভারটির পতন ভূপৃষ্ঠের দিকেই নিবদ্ধ হয়। পৃথিবী শূন্যে ভাসমান স্কাইডারভারটির দিকে ধাবিত হয় না।

জয়ন্ত জান কি? জাগতিক চারটি বলের মধ্যে মাধ্যাকর্ষণ বলটি দুর্বলতম। এতটাই দুর্বল এই বল যে সমস্ত পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ বল দ্বারা আকর্ষিত একটি ভূমিষ্ঠ আলপিনকে একটি ছোট্ট চুম্বক তার নিজের দিকে টেনে নিতে সক্ষম। কত দুর্বল? চারটি বলের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোরস। যদি এই বলটির শক্তি ১ ধরা হয় তবে মাধ্যাকর্ষণের শক্তি .০০০০০০০০০০০ ০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০৬ বা ৬×১০$^{-৩৯}$। দশমিকের পর ৩৮ টা শূন্য তারপরও ৬। বুঝলে জয়ন্ত কত দুর্বল এই বল?

দুর্বল কিন্তু উপেক্ষিত নয়। বিশ্বময় এর বিস্তার। অবিশ্বাস্য এর প্রভাব।

চিন্তা করে দেখ জয়ন্ত, বস্তুহীন, পদার্থহীন এক বিশ্ব একেবারেই অর্থপূর্ণ নয়। এ এক নিরস আকর্ষণশূন্য বিশ্ব। আমাদের বিশ্বটি বস্তু আর পদার্থে অস্তিত্বের কারণেই অর্থপূর্ণ। অগণিত মহাকাশিয় বস্তুর বাসস্থান এই বিশ্বে। ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম কণা থেকে বৃহৎ হতে বৃহত্তম তারামন্ডলীর মধ্যে এই বলটির প্রভাব। বিশেষভাবে গুরুভর পদার্থের আকার আয়তন, গতিবিধি, চালচলন এমনকি আচার, ব্যবহার সব কিছুই নির্ধারণ করে মহাকর্ষণ বল।

মহামান্য আইনস্টাইন তাঁর জেনারেল থিওরী অফ রিলেটিভিটিতে মাধ্যাকর্ষণ বলের এক অসামান্য নতুন সংজ্ঞা ব্যক্ত করেছেন। মাধ্যাকর্ষণকে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপে হাজির করেছেন। আইনস্টাইন বক্তব্য রাখলেন—(জয়ন্ত মন দিয়ে শোন) বললেন মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব, আকাশ আর সময়ের সুতো দিয়ে বোনা বিশ্বের সর্বদিশায় (সর্বদিশায় ব্যাপারটা খেয়াল রাখবে জয়ন্ত) বিশ্বের সমতল চাদরটিকে ক্ষেত্রবিশেষে অসমতল করে মাধ্যাকর্ষণের উপস্থিতি। বাস্তবে বিশ্বের কাঠামোটি মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবেই অসমতল। মাধ্যাকর্ষণ আকাশকে সঙ্কুচিত করে। সময়কে কক্ষ্যচ্যুত করে।

Gravity shrinks space. Gravity bends time. (মাধ্যাকর্ষণ সম্বন্ধে আরো আলোচনা, ছবি ৪৬ পৃষ্ঠায়, Black hole-এর বিবরণে)

সাধারণত প্রায় সর্বক্ষেত্রে মাধ্যাকর্ষণ একটি আকর্ষিত বল। Attractive force।

জয়ন্ত, ব্রহ্মান্ডের জীবনকালে একটি বিশেষ মুহূর্তে মাধ্যাকর্ষণ ছিল একটি বিকর্ষিত বল। Repulsive force। বলতে পার কি সেই বিশেষ মুহূর্ত?

দুই দিকে ঘাড় নেড়ে জয়ন্তর নিতিবাচক উত্তর।

আপনি বললেন, ‘‘জয়ন্ত শোন আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের জীবনে সর্বকালের সর্বাধিক মূল্যবান মুহূর্তে মাধ্যাকর্ষণ বলটি ছিল একটি বিকর্ষিত বল। অন্যথায় বিশ্বের উত্থান হত বিপন্ন। মুহূর্তটি হল বিশ্বের জন্মের ঠিক পরমুহূর্তে।

তুমি তো জান জয়ন্ত এক বিশাল বিস্ফোরণে বিশ্বের জন্ম। বিগবাঙ Big Bang বিস্ফোরণে। জন্মক্ষণে একটি পরমাণু হতে ক্ষুদ্র ছিল বিশ্বের আয়তন। ‘‘.’’ এই ১ মিমি বিন্দুতে ২ কোটি হাইড্রোজেন পরমাণুর অবস্থান সম্ভব। অতএব চিন্তাকরে দেখ জয়ন্ত কত ক্ষুদ্র ছিল বিশ্বের আয়তন তার জন্মক্ষণে।

চক্ষের পলকে, দাঁড়াও দাঁড়াও, কি বললাম? চক্ষের পলকে? না না বন্ধু তার থেকেও অনেক অনেক কম সময়ে, বলা হয় জন্মাবার ১ ট্রিলিয়ন (মানে $১০^{-১২}$) সেকেন্ড পর ক্ষুদ্র ‘‘শিশু বিশ্বটি’’ প্রায় তাৎক্ষণিকভাবে বিশাল বিশ্বে রূপান্তরিত হয়। কসমোলজির ভাষায় বিশ্বের এই বিশাল বিস্তৃতিকে বলা হয় ইনফ্লেশন। (ইনফ্লেশনের বিস্তারিত আলোচনা দশম অধ্যায়ে)। ইনফ্লেশনের কারণ বিকর্ষিত মাধ্যাকর্ষণ বল। এই বিকর্ষিত মাধ্যাকর্ষণ বলটিকে বলা হয় কসমোলজিকাল কন্সটান্স্ট। Cosmological Constant বা বিকর্ষিত মাধ্যাকর্ষণ বল। এ বলের প্রথম কে চিন্তা করেছিল বলতে পার বন্ধু?

জয়ন্ত : না দাদা। এই ব্যাপারে আমি এক বিন্দুও জানি না।

এই রকম এক যুগান্তকারী ভাবনা মানব শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান আইনস্টাইন ছাড়া আর কার মাথায় আসবে জয়ন্ত?

সমস্ত মৌলিক বলগুলিরই এক বা একাধিক বাহন কণা বর্তমান। দুটি বস্তুর মধ্যে বাহন কণাদের আদানপ্রদান করার কারণেই বলের সৃষ্টি হয়। মাধ্যাকর্ষণের বাহন কণাকে বলা হয় গ্রাভিটন। অত্যন্ত ক্ষুদ্র এই গ্রাভিটন। এর ক্ষুদ্রতার কারণে ভরহীনতার কারণে এবং এই কণাটির কোন চার্জ না থাকার কারণে এই কণাটির অস্তিত্ব আজ অবধি পরীক্ষিত ভাবে প্রমাণ করা সম্ভব হয়নি। আশাকরা যায় অদূর ভবিষ্যতে সম্ভব হবে। খুবই কঠিন এই কাজ। তবে আজকের যুগে মানুষের কাছে অসাধ্য সাধন করাটা একটা নিয়ম।

জান জয়ন্ত? আধুনিক প্রযুক্তবিদ্যা অত্যন্ত লাভজনকভাবে মাধ্যাকর্ষণকে কাজে লাগায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে। নদীকে বাঁধ দিয়ে জল ধরে রাখা হয়। ধরে রাখা জল উঁচু থেকে নিচে ছাড়া হয় জলপ্রপাতের মত। মাধ্যাকর্ষণের ফলে জল তীব্র গতিতে নিচের টারবাইনের পাখাতে ধাক্কা দেয়। টারবাইন ঘুরতে থাকে। উৎপন্ন হয় জলবিদ্যুৎ। প্রাকৃতিক বহু জলপ্রপাত থেকেও এইভাবে জলবিদ্যুৎ

উৎপাদন করা হয়। উদাহরণ নায়াগ্রা। এমনকি হসপিটালে রোগীদের বোতল ঝুলিয়ে ড্রিপ দেওয়া হয় সেটিও কাজ করে এই বলটির কারণে। দূর আকাশে গমনকারী কৃত্রিম উপগ্রহের গতি বৃদ্ধি করা হয় মধ্যবর্তী কোন গুরুভর বিশিষ্ট গ্রহের মাধ্যাকর্ষণকে কাজে লাগিয়ে।

জয়ন্ত : দাদা ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না।

আপনার জবাব : ধর একটা কৃত্রিম উপগ্রহ ছাড়া হল প্লুটোর উদ্দেশ্যে। ছাড়া হল পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ মুক্তির গতিতে। অর্থাৎ ১১.২ কি. মি. প্রতি সেকেন্ডে (মাধ্যাকর্ষণ মুক্তির গতির বিশদ বিবরণ ৭৫ পৃষ্ঠায়)। কৃত্রিম উপগ্রহটিকে সরাসরি প্লুটোতে না পাঠিয়ে, উপগ্রহটিকে বৃহস্পতি গ্রহের চারপাশে কয়েকবার প্রদক্ষিণ করান হয়। বৃহস্পতি গ্রহ সর্ববৃহৎ। গ্রহদের মধ্যে এর মাধ্যাকর্ষণ সর্বাধিক।

Equatorএ বৃহস্পতির গড় ঘূর্ণায়মান গতি ৩৭০০০ কি. মি. প্রতি ঘন্টা। কৃত্রিম, উপগ্রহটিও বৃহস্পতিকে প্রদক্ষিণ করার ফলে এই গতিটি উপরিলাভ করে। এইভাবে ৫/৬ দিনে গতি বৃদ্ধি করে ফেলে কৃত্রিম উপগ্রহটি। প্লুটোতে পৌঁছতে অন্যথায় ১৬/১৭ বছর লাগার জায়গায় মাত্র তিন বছরেই উপগ্রটি পৌঁছে যায় তার গন্তব্যস্থানে। মাধ্যাকর্ষণ বলকে কাজে লাগানোর এই পন্থাকে বলা হয় Sling-slot effect.

বুঝলে জয়ন্ত আইনস্টাইনের জেনারেল থিয়োরী অফ রিলেটিভিটি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভের মত গ্রাভিটি ওয়েভের সম্ভাব্য অস্তিত্বের কথা ব্যক্ত করে। কোন গুরুতর মহাকাশীয় বস্তুর স্থানান্তরিতের কারণে বিশ্বের সময়ও আকাশের মঞ্চটিতে তরঙ্গের সৃষ্টি করে। অত্যন্ত পরীক্ষিতভাবে প্রমাণ করা এখনও পর্যন্ত সম্ভব হয়নি।

আপনি একটি ছবি জয়ন্তকে দেখিয়ে বললেন "ছবিটি কয়েকদিন আগে হবল টেলিস্কোপে তোলা।

একটি ক্ষেত্রে দুটি ব্লাকহোল এবং অপর ক্ষেত্রে দুটি শ্বেত বামন তারা (white dwarf Stars) পরস্পরের দিকে মাধ্যাকর্ষণের আকর্ষণে বিনাশ আলিঙ্গনের উদ্দেশ্যে ধাবিত।

আপনি বললেন "জয়ন্ত, আইনস্টাইনের জেনারেল থিয়োরী অফ রিলেটিভিটির মতানুসারে কোন গুরুতর মহাকাশীয় বস্তুর ত্বরান্বিত গতি পারিপার্শ্বিক আকাশ এবং সময়ের কাঠামোটিকে মাধ্যাকর্ষণ তরঙ্গে আপ্লুত করে। এই দুটি ক্ষেত্রেই তত্বীয়ভাবে আকাশ মাধ্যাকর্ষণ তরঙ্গে প্লাবিত হওয়ার কথা।

আগামি দশকের মাঝামাঝি সময় গ্রাভিটি ওয়েভের সন্ধানে LISA (Laser Interferometre Space Antenna) উপগ্রহগুলি উপেক্ষিত হবে। তিনটি উপগ্রহ আকাশে ভিন্ন ভিন্ন দূরবর্তী স্থানে প্রতিষ্ঠিত করা হবে। মাধ্যাকর্ষণ তরঙ্গের (Gravity wave) কারণে এই উপগ্রহগুলিরও তরঙ্গের তালে তালে

মাধ্যাকর্ষণ তরঙ্গ

ভাসার কথা। গঙ্গার মাঝে অবস্থিত বয়াগুলির ভাসার মত। মাধ্যাকর্ষণ তরঙ্গের জন্য সমস্ত মহাকাশীয় বস্তুই Blob করে বা বলা যায় তরঙ্গের তালে তালে ওঠা নামা করে। দূরবর্তী স্থানে অবস্থানের কারণে তিনটি উপগ্রহের এই ওঠানামার তারতম্য ধরা যাবে পৃথিবীতে বিভিন্ন মানমন্দিরে। আশাকরা যায় প্রমাণিত হবে মাধ্যাকর্ষণ তরঙ্গের অস্তিত্ব।

জয়ন্ত এই মুহূর্তে তুমি, আমি, পৃথিবীর সমস্ত কিছুই স্নাত হচ্ছি মাধ্যাকর্ষণ তরঙ্গে। আমাদের অনুভূতির সূক্ষ্মতা সেই পর্যায়ে না হওয়ার কারণে এই তরঙ্গের বর্ষণ অনুভব করিনা। যেমন করিনা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক তরঙ্গের বর্ষণ। সর্বস্থানে, সর্বক্ষণে বর্ষিত হচ্ছে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক তরঙ্গ।

জয়ন্ত হয়ত ভাবছ তবে শক লাগছে না কেন? ভাবছ কি?

জয়ন্তের জবাব ‘‘না দাদা শক্ তো লাগছে না অথবা হয়ত বা শকের তীব্রতা নগন্য, তাই উপলব্ধি করছি না।

ঠিকই বলেছ জয়ন্ত। অত্যন্ত ক্ষীণ শক্তির তরঙ্গ যেগুলি মহাকাশের বিভিন্ন বস্তুর থেকে পৃথিবীর বুকে আছড়ে পড়ছে অহরহ। ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোরস মাধ্যাকর্ষণ বলের ন্যায় ইনভারস্ স্কোয়ার ল (Inverse squire Law) মেনে চলে। দূরত্ব দ্বিগুণ হলে বলে শক্তি চার গুণ হ্রাস পায়।

ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে আপনি বললেন জয়ন্ত এই হল মাধ্যাকর্ষণ বলের এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ।”

২) ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোরস : জয়ন্ত ঝুকে পড়ে জিজ্ঞেস করে ‘‘দাদা আমার একটা প্রশ্ন ছিল আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপারে।”

আমার personal ব্যাপারে জয়ন্ত? তথাস্তু বন্ধু! পারমিশন গ্রানটেড। বল কি তোমার প্রশ্ন?

ধন্যবাদ ধর্মাবতার। প্রশ্নটি হল কেন কসমোলজি আপনাকে এত আকর্ষিত করে?

আপনি হাত জোড় করে বললেন ‘‘যদি অনুমতি দাও উত্তরটা প্রথমে ইংরেজীতে দিই?”

জয়ন্ত : As your lordship pleases।

আপনি : Light is the symbol of truth. কোটেশনটা ধার করা। কে লিখেছিল মনে নেই। কোটেশনকে বাড়িয়ে যদি বলি—

“Light is the symbol of truth.
However numerous flashes of truths are lost in the
darkness of the unexplored and the unknown.
Cosmology tries to aquire a glimpse of these
truths from the vast ocean of darkness.
That is why I subscribe to Cosmology.
জ্ঞানত সত্য এবং সত্যের প্রতিবিম্বই আলোর পরিচিতি।
অন্ধকার আলোর বহিঃপ্রকাশের অন্তরায়।
কসমোলজি অন্ধকারের আবরণ দূর করার চেষ্টা করে।
কসমোলজি জ্ঞানের আলোকে প্রকাশ করে।
আর জ্ঞানই হল এই অনন্ত বিশ্বে ভবিষ্যতের
মানবকুলের বিদ্যমান থাকার একমাত্র উপায়।

আপনি বললেন ‘‘চলো বল নিয়ে আমাদের আজকের আলোচনা জারি রাখা যাক।

দেখ জয়ন্ত যে কোন ইলেকট্রিকালী চার্জ পদার্থ তার চতুঃপার্শ্বে একটি ইলেকট্রিক্যাল ক্ষেত্র রচনা করে। যেমন একটি চুম্বক তার চারপাশে একটি ম্যাগনেটিক ক্ষেত্র রচনা করে। ক্ষেত্রের বিশদ আলোচনা, ষষ্ঠ অধ্যায়ে, ৬৬ পৃষ্ঠায় ছবি)। আর যখন কোন ধাতব ম্যাগনেটিক পদার্থ যেমন একটি লোহার টুকরো বা একটি আলপিন ঐ ক্ষেত্রের মধ্যে উপস্থিত হয় তখন চুম্বক আর লোহার টুকরো বা আলপিনটির মধ্যে একটি বলের সঞ্চার হয়।

ম্যাগনেটের মত ইলেট্রিকের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ঘটনা ঘটে। একই চার্জ (পজেটিভ পজেটিভ অথবা নেভেটিভ নেভেটিভ) পরস্পরকে বিকর্ষিত করে। বিকর্ষিত ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোরস।

একটি পরমাণুর কেন্দ্রে পজেটিভভাবে চার্জ প্রোটন কণা এবং কেন্দ্রটিকে আবর্তিত সবসংখ্যক নেভেটিভভাবে চার্জ ইলেকট্রন কণা পরমাণুটিকে চার্জ শূন্য অবস্থায় রাখে। এই প্রোটন ইলেকট্রনের মধ্যে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোরস একটি পরমাণুকে অক্ষুণ্ণ রাখে।

আবার একটি পরমাণুর ইলেকট্রন কণা অপর একটি পার্শ্ববর্তী পরমাণুর প্রোটন কণার দ্বারা আকর্ষিত হয়। এবং তদ্বিপরীত। এই কারণেই অনেক পরমাণু সংগঠিতভাবে অনু এবং অন্যান্য পদার্থ গঠন করে। পার্শ্ববর্তী পরমাণুর ইলেকট্রন প্রোটনের আকর্ষণের কারণ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোরস। সঠিকভাবে বলা উচিত রেসিডুয়াল ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোরস।
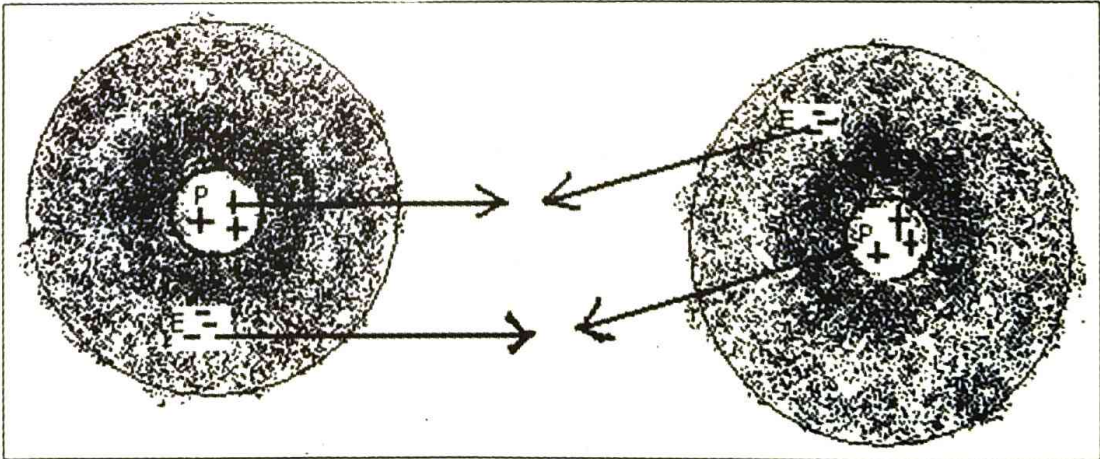
দুটি পরমাণুর পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ

ভেবে দেখ জয়ন্ত, যদি প্রোটন আর ইলেকট্রনের বিপরীত চার্জ না থাকত তবে পরমাণু গঠিত হত না, অনু গঠিত হত না, কোন পদার্থেরও উৎপত্তি হত না। ব্রহ্মান্ড বলে আমরা যা চিনি তার কোন অস্তিত্বও থাকত না।

অতএব বলত জয়ন্ত আমি যদি বলি "ব্রহ্মান্ডের অস্তিত্বের মূলে দুটি ভিন্ন

কণার বিপরীত চার্জ, তুমি কি আমায় কাটগড়ায় দাঁড় করাবে?"

মৃদু হেসে "দুবার ফাঁসি, তিন বার জেল" জয়ন্তের উত্তর।

কেন? কেন? কেন? আপনার জিজ্ঞাসা।

জয়ন্ত : কারণ কলিযুগে সত্য বাক্য উচ্চারণ দন্ডনীয় অপরাধ।

আপনি : সত্যনাশ? কি বল? জয়ন্ত।

চলো এগোনো যাক।

জয়ন্ত, প্রাত্যহিক কাজের জন্য প্রায় সর্বক্ষেত্রে এই বলটি কাজ করে। মাধ্যাকর্ষণ বলও করে তবে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোরসের মত সব জায়গাতে নয়। আমাদের চলাফেরা, শোওয়া, বসা, খাওয়া দাওয়া, খেলাধুলা এমনকি নিশ্বাস নেওয়া সমস্ত কিছুতেই এই বলটি কাজ করে। অধিকাংশ জীবিত পদার্থকে পরিচালনা করে তার ব্রেন। পরিচালনা কাজটি সারা হয় ইলেকট্রিক সংকেতে বা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোরসের সাহায্যে।

কোন পদার্থের গঠন নির্ভর করে তার অনু, পরমাণুর সংগঠনে। এই সংগঠনের ব্যাপারটি সাধিত হয় ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোরসের দ্বারা। যৌগিক পদার্থের গঠনের মূলেও এই বল এমনকি সমস্ত, বা অধিকাংশ রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার পেছনেও এই বলটিই কাজ করে। মোবাইল ফোন, কম্পুউটার, জেনারেটার, ফ্রিজ, টিভি, রেডিও, X-ray, লেজার, সমস্ত প্রকার স্কানিং, ECG, এককথায় আধুনিক জীবনযাত্রা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে এই বলটির ওপর।

মনে রাখবে জয়ন্ত দুটি বস্তুর মধ্যে যখন ফোটন নামে ক্ষুদ্রকণার আদান-প্রদান হয় তখন এই বলটির সঞ্চার হয়। ইলেকট্রোম্যাগনেটিক বলের বাহন কণার নাম ফোটন। ফোটনের ভর শূন্য। ফোটনের চার্জ শূন্য। কিন্তু শক্তি বর্তমান। অগুন্তি ফোটন ক্ষুদ্রকণা গঠন করে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ক্ষেত্র। আর জয়ন্ত তুমি বললেও বলতে পার ফোটনের পিঠে চড়েই ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোরস কাজ করে। ফোটন কনাগুলিকে এই কারণে messenger particleও বলা হয়।

জয়ন্ত : ইলেকট্রিক শক লাগলেই বুঝবো ফোটন পিওনদার কাজ।

আপনি বললেন "যখন Airport এ security-তে Metal detector-এর দরজা দিয়ে পাস করবে, অথবা যখন (আশাকরি দরকার যেন না হয়) হসপিটালে কোন স্কান করাবে অমনকি তোমার পকেটে যে মোবাইল ফোনটি উঁকি মারছে, ঐটিতে ফোন করতে তখনও এই বলটিই কাজ করবে।

অতএব বুঝতেই পারছ কি বিশাল বিস্তৃতি এই বলটির।

দেখ জয়ন্ত গুরুদেব আইনস্টাইন বিংশ শতকের প্রথম দশকে জেনারেল

থিয়োরী অফ রিলেটিভিটি বলে যে নাটকটি রচনা করেছিলেন তার নায়ক ছিল আলো। Light. (জেনারেল থিয়োরীর বিশদ আলোচনা ৪২ পৃষ্ঠায়)।

আলো ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোরস নয়। আলো ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন। তাড়িত চুম্বকীয় তরঙ্গে সঞ্চারিত রশ্মি। আলো একটি শক্তি।

এই রশ্মির উদ্‌ভবের পেছনে কাজ করে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোরস।

কিছুক্ষণ আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকার পর আপনি বললেন "বিশ্বের দ্বিতীয় শক্তিশালী বল ইলেকট্রোম্যাগনেটিক বল নিউক্লিয়ার স্ট্রং বলের ১ এর ১৩৭ ভাগ দুর্বল। ব্রহ্মান্ডের শেষ দিগন্ত অবধি-এর বিস্তার।

আপনি বললেন "দেখ জয়ন্ত আমি মনে করি মানব সভ্যতার অগ্রগতির কারণ এই বলটিকে সুবিধাজনক ভাবে ব্যবহার করা।

এই ব্যবহার করতে পরার পিছনে যাঁদের অবদান সেই মনীষীদের নাম আর সংক্ষেপে তাঁদের কাম উল্লেখ না করলে, এক অপরাধ বোধে জর্জরিত হতে হবে আমায়।

জয়ন্ত ইচ্ছে করলে আমার কথা শুনতে শুনতে তুমি টেলিস্কোপের মধ্যে দিয়ে গ্রহ বৃহস্পতির বন্দনা করতে পার। গাগনিক গোলকের (celestial sphere) অভ্যন্তরে (জয়ন্ত celestial sphere হল উল্টোনো বাটির মত যে নীল আকাশটি দেখছ বাটির অভ্যন্তর থেকে) বৃহস্পতির গতি Auto trekking করছে telescopeটি।

জয়ন্ত চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে বলে "দাদা আপনার জবাব নেই"।

জয়ন্ত টেলিস্কোপের eye piece-এ চোখ রাখার পর আপনি বললেন—

"Here we go.

১৭৭৭ খ্রিস্টাব্দকে আমি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোরসের আধুনিক পরিচয় করাবার Take off year ধরছি। যদিও এর আগে Static ইলেট্রিসিটির ব্যাপারে মানুষের কিছু ধারণা ছিল।

১৭৭৭ সালে ফ্রান্সের কুলম্ব সাহেব (Charles Augestin de coulamb ১৭৩৬-১৮০৬) ইলেকট্রিক চার্জের অস্তিত্বের কারণে ইলেকট্রিক ফোরসের উৎপত্তির ব্যাপারটি আবিষ্কার করেন।

১৮১৮ খ্রিস্টাব্দ। ডেনমার্কের বিজ্ঞানী ইলেকট্রিসিটি আর ম্যাগনেটিসমের সম্পর্কটি খুঁজে বের করেন। বিজ্ঞানী হানস্ খ্রিস্ট্রিয়ান ওরস্‌টেড (Hans christian oersted ১৭৭৭-১৮৫১)

১৮২৬ খ্রিস্টাব্দ। ফ্রান্সের বিজ্ঞানী মেরী অ্যামপেয়ার (Andre marie Ampere ১৭৭৫-১৮৩৬)

অ্যামপিয়ার সূত্র ব্যক্ত করলেন। চুম্বকিয় ক্ষেত্র এবং ইলেকট্রিক কারেন্টের সম্পর্কের সম্বন্ধীয় সূত্র।

১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দ। জার্মানির জর্জ সাইমন ওম (Geory Simon Ohm ১৭৭-১৮৫৪) বললেন V=IR। Ohm's Law। ভোল্টেজ, কারেন্ট আর রেজিসটেনস-এর মধ্যে সম্পর্ক।

১৮২১ খ্রিস্টাব্দ। ইংল্যান্ডের মাইকেল ফারাডে (Michael Faraday ১৭৯১-১৮৬৭) ইলেকট্রিসিটি এবং ম্যাগনেটিসম সম্পর্কে আরো বিস্তারিতভাবে অনেক নতুন তথ্য আবিষ্কার করেন। বললেন ইলেকট্রিক আর ম্যাগনেটিক ফিল্ড বা ক্ষেত্রের কথা।

১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দ। স্কট-ল্যান্ডের ভুবন বিখ্যাত বিজ্ঞানী জেমস্ ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল (James clerk Maxwell ১৮৩১-১৮৭৯) ইলেকট্রিসিটি এবং ম্যাগনেটিসম-এর সমস্ত কিছুই মাত্র ৪টি বিখ্যাত সমীকরণের মধ্যে আবদ্ধ করতে কৃতকার্য হন। প্রমাণ করেন আলো একটি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক তরঙ্গ।

শেষে বলি ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দ। জার্মানির হেনরিচ রুডল্ফ হার্ডজ (Heimrich Rudolf Hertz ১৮৫৭-১৮৯৪) পদার্থ বিজ্ঞানী, আকাশে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভের অস্তিত্বও আবিষ্কার করেন। আকাশে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ প্রচারিত করতেও কৃতাকার্য হন।

তাঁর এই আবিষ্কারে পরবর্তীকালে রেডিয়ো প্রচারণের প্রবর্তন আরম্ভ হয়।

জয়ন্ত ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোরস সম্বন্ধে এই হল আমার সংক্ষিপ্ত বিবরণ। তুমি দেখছি খুব মন দিয়ে কিছু দেখছ টেলিস্কোপে।

দেখছি বৃহস্পতি গ্রহটি কত চিত্তাকর্ষক দেখতে। কে বলবে গ্রহটি গ্যাসিও পদার্থে গঠিত আর কি ভীষণভাবে অশান্ত এর আবহাওয়া?

আর সেইরকম ভেবে কে বলবে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোরসের কি বিশাল প্রভাব আমাদের জীবনে, পৃথিবীর জীবনে? বলা যায় কি বিশ্বের জীবনে?

আপনি বললেন, নিশ্চয়ই যায় জয়ন্ত। একশবার যায়। এই বলটির অনুপস্থিতিতে অণু, পরমাণুর অস্তিত্ব থাকত না। অর্থাৎ বিশ্বটি হত এক পদার্থহীন, বস্তুহীন, তারাহীন, নেবুলাহীন এক শূন্য বিশ্ব। এই বলটির অস্তিত্বের কারণেই কবি বলতে পেরেছেন :

"মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে"

নিউক্লিয়ার স্ট্রং ফোরস : আপনি বললেন "জয়ন্ত বসে বসে কোমরে খিল ধরে গেল। এস এই ছাদ থেকে চারদিকের কিছুটা সবুজের সমারোহ দেখা যাক। অধিকাংশই তাল আর নারকেল গাছ। নজর করলে কয়েকটা নিম

আর অর্জুন গাছও চোখে পড়বে।

ভাল করে খেয়াল করলে এখান থেকেই আকাশের বুকে আমাদের তারামন্ডলী মিল্কিওয়েটিও দেখতে পাবে। ঐ দেখ ঈষাণ নৈরিৎ কোণ বরাবর যে অতি হাল্কা সাদা মেঘের চওড়া রেখাটি দেখছ ঐটিই হল আমাদের অতি আপন "আকাশ গঙ্গা" তারামন্ডলী। সকালবেলায় না তোলা বিছানায় এলোমেলোভাবে পড়ে থাকা লম্বা সাদা চাদরের মত।

আপনার দিকে তাকিয়ে জয়ন্ত বড় বড় চোখে বলে "দাদা"?

জয়ন্তকে একটা wink করে আপনি বললেন "O.K. তোমায় একটা ভিন্ন উপমা বলি?

অনেক ওপর দিয়ে জেট প্লেন উড়ে যাওয়ার প্রায় আধঘন্টা পর প্লেনটি হতে নির্গত সাদা জেটের ধোঁয়া যেমন অতি হাল্কাভাবে ছড়িয়ে পড়ে আকাশের বুকে একটা চওড়া সাদা রাস্তার মত কিছুটা সেই রকম।

পূর্বদিনের মানুষের দেওয়া নাম "মিল্কিওয়ে"। আকাশের বুকে দুধের রাস্তা। সেই সময় তারামন্ডলী ব্যাপারটি আবিষ্কৃত হয় নি।

কোন এক পরিষ্কার আমাবস্যার রার্তে কোন এক অন্ধকার জায়গা থেকে যেখানে লাইট-পলিউশন বা আলো দূষণ নেই যেমন লোকালয় থেকে দূরে কোন এক সমুদ্রের ধারে, এই আকাশ গঙ্গার অপরূপ রূপসী রূপটি দেখতে পাবে। না দেখা থাকলে দেখার চেষ্টা কোরো। এক বিরল অনুভূতি হবে জয়ন্ত। আকাশ গঙ্গাকে আমরা edge on ভাবে দেখতে পাই। অর্থাৎ ধার থেকে দেখতে পাই। মনে আছে তো আকাশগঙ্গা একটি spiral গ্যালাক্সি? চ্যাপ্টা আকৃতির? "Face on" বা সামনের থেকে দেখার জন্যে কয়েক লক্ষ্য আলোকবর্ষ দূরে যেতে হবে আমাদের। অসম্ভব। মহাকাশ বিজ্ঞানীরা খুঁজে বের করেছেন কয়েকটি আকাশগঙ্গার অনুরূপ তারামন্ডলী যারা আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। এদের পর্যবেক্ষণ করে বিজ্ঞানীরা পরোক্ষভাবে মিল্কিওয়ের কেন্দ্র স্থল তার পাশ্ববর্তী অঞ্চল পর্যবেক্ষণ করেন।

জয়ন্তর প্রশ্ন : আমি কি ঠিক শুনলাম দাদা? আপনি কি আলো দূষণ বললেন? বায়ু দূষণ, নদী বা সমুদ্র দূষণ এমনকি পর্বতারোহীদের পরিত্যাজ্য জিনিষে হিমালয়ের দূষণ শুনেছি। কিন্তু আলোর দূষণ?

ঝাঁ চকচকে লাসভেগাস, নিউইয়র্কের মত কলকাতাকেও Flooded with light করার প্রচেষ্টা। কলকাতার আকাশে কটা তারা দেখতে পাও জয়ন্ত? পঞ্চাশটা? আশিটা? মেরে কেটে একশটা। লাসভেগাসে নিউইয়র্কে বড় জোর চল্লিশটা।

জয়ন্ত রাত্রের আকাশে যে তারাগুলি দেখা যায় তার প্রায় সবই আমাদের আকাশভগঙ্গার তারা। কয়েকটা গ্রহ, কিছু প্রতিবেশী তারামন্ডলী, কিছু অতি ক্ষীণ ভাবে দৃশ্যমান তারা, যারা অন্য দূরবর্তী তারামন্ডলী। এই সব মিলিয়ে রাত্রের আকাশ। অন্য তারামন্ডলীর তারাদের পৃথক পৃথকভাবে পরিলক্ষিত করা ভাল শক্তিশালী টেলিস্কোপের পক্ষেও দুরূহ কাজ।

কোন এক পরিষ্কার আমাবস্যার রাত্রে এস। বিভিন্ন তারামন্ডলী দেখাব তোমায়। দেখবে তারামন্ডলীর মধ্যে কত বৈচিত্র। ১ হাজার নয়। ১শ হাজার নয়। ১শ কোটি বা ১ হাজার কোটিও নয় জয়ন্ত। ১০ হাজার কোটি তারামন্ডলীর অবস্থান আমাদের জ্ঞাত বিশ্বে। বৈচিত্র থাকবে না?

বৈচিত্র থাকবে। থাকবে পদার্থবিদ্যার আইন মান্য করে। জয়ন্ত এই আইনগুলিই আমাদের সম্পদ। চেষ্টা চলেছে নতুন আইনের অন্বেষণের। সম্পদ বাড়াতে হবে না?

তুমি তো জান মানবকুলের শক্তিমান মানব ভীম, হনুমান (আদি মানবেরা হনুমানদের সমগোত্রীয় ছিল বলা যায়)। তেমনি বলের মধ্যে শক্তিশালী Strong force। এস জয়ন্ত তোমায় এবার Strong force-এর সঙ্গে সংক্ষেপে আলাপ করিয়ে দিই।

কোয়ানটাম মেকানিকস-এর কথা বলার সময় তোমায় কেওয়র্কদের সম্বন্ধে বলেছিলাম। মনে আছে তো জয়ন্ত? (Q.M.-এর আলোচনা অষ্টম অধ্যায়ে)

জয়ন্ত : জী হুজুর।

আপ ডাউন, রোগা রোগা।
বাকিরা মোটা মোটা।

রোগারা বাঁচে। মোটারা মেদ ঝরিয়ে রোগাতে রূপান্তরিত হয়।—কি ঠিক তো?

মৃদু হেসে আপনার জবাব "ফানটাবুলাস তোমার শক্তি" I mean স্মরণশক্তি।

জয়ন্ত : দাদা ফানটাবুলাশ?

আপনি : ফানটাসটিক আর ফ্যাবুলাস। বলেছিলাম তোমায় জয়ন্ত যে এই কেওয়ার্কগুলোর ইলেকট্রোম্যাগনেটিক চার্জ আছে। এছাড়াও ওদের আরো একরকম চার্জ আছে। colour কালার চার্জ। কালার চার্জ যুক্ত ক্ষুদ্রকলাদের মধ্যে যে বলটি কাজ করে তাকেই বলা হয় নিউক্লিয়ার স্ট্রং ফোরস।

স্ট্রং ফোরস ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোরসের থেকে ১৩৭ গুন শক্তিশালী।

স্ট্রং ফোরস মাধ্যাকর্ষণ থেকে ৬×১০^{৩৯} (৬-এর পর ৩৯টি শূন্য) গুণ শক্তিশালী।

স্ট্রং ফোরস নিউক্লিয়ার Weak উইক ফোরসের থেকে ১০ লক্ষ্য গুণ শক্তিশালী।

একাধিক কেওয়ার্কের দ্বারা গঠিত হারডন ক্ষুদ্রকণার অভ্যন্তরে কেওয়ার্কগুলিকে একত্রে ধরে রাখে স্ট্রং ফোরস।এই ফোরসটির বাহন কণার যথার্থ নাম গ্লুয়ন। কেওয়ার্কদের গ্লু করে বা চিটিয়ে রাখে।

গ্লুয়ন কণাদেরও কালার চার্জ আছে।

মনে রাখবে সম্মিলিত কেওয়ার্ক দ্বারা গঠিত ক্ষুদ্র কণাদের কালার চার্জ শূন্য। ওরা colour neutral। কাছাকাছি অবস্থিত কেওয়ার্ক কণাগুলি নিজেদের মধ্যে অসংখ্য গ্লুয়ন কণা আদান-প্রদান করে সর্বক্ষণ। ফলে তৈরি হয় কালার ফোরস ফিল্ড। অত্যন্ত শক্তিশালী এই ফোরস ফিল্ড। কেওয়ার্কদের একত্রে ধরে রাখে (রঙিন ছবি ১নং দেখুন)।

কেওয়ার্করা কখনও একাকী থাকতে পারে না। কারণ টান পড়লেই কালার ফোরসের শক্তি বেড়ে যায়। কেওয়ার্কদের পৃথক হওয়ার চেষ্টা প্রতিহত করে।

জয়ন্ত ধর তুমি আর তোমার বন্ধু একটা বেশ বড় মোটাসোটা লোহার স্প্রিং-এর দুদিকে দুজনে মিলে টান দিয়ে স্প্রিংটিকে লম্বা করতে চাইছ। স্প্রিংটি যত বেশী লম্বা হবে তত বেশী জোরে তোমাদের টানতে হবে লম্বা করার জন্যে। স্ট্রং ফোরসও অনুরূপভাবে অধিক শক্তিশালী হয়ে কেওয়ার্কদের পৃথকিকরণকে রোধ করে।

এই কারণেই একটি পরমাণুর কেন্দ্রে দুটি পজেটিভ চার্জ প্রোটন কলার মধ্যে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক বিকর্ষিত বল থাকা সত্ত্বেও ওরা পৃথক হয়না। ১৩ কোটি গুণ অধিক শক্তিশালী স্ট্রং ফোরস প্রোটন কণাদের পরমাণুর কেন্দ্রে একত্রে ধরে রাখে। পরমাণুকে অক্ষত রাখে।

জয়ন্ত তোমার কোন প্রশ্ন আছে কি?

জয়ন্তের প্রশ্ন : দাদা এই যে colour ফোরস-এর সঙ্গে রঙের কোন সম্বন্ধ আছে নাকি?

আপনার উত্তর : না জয়ন্ত। ভিন্ন ধরনের colour charge এর কারণে হারডন কণার অভ্যন্তরে কেওয়ার্কদের আচরণ বিশ্লেষণ করার জন্যে বিজ্ঞানীরা ভিন্ন কালারের নামে চার্জের প্রকার ভেদ করেন। এর সঙ্গে রঙের কোন সম্পর্ক নেই।

জয়ন্ত এই হল স্ট্রং ফোরসের এক অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পরিচয়। এই ফোরসটি আমরা অনুভব করি না অথবা এর ক্রিয়াকলাপ পর্যবেক্ষণও করি না। কারণ এটি কাজ করে পরমাণুদের অভ্যন্তরে।

অনুরূপভাবে নিউক্লিয়ার উইক ফোরসটিও কাজ করে পরমাণুদের অভ্যন্তরে।

জয়ন্ত, এবার ব্রহ্মাণ্ডের চারটি মৌলিক বলের একটি, আমাদের আলোচনার শেষ বল নিউক্লিয়ার উইক বলটির সঙ্গে তোমার সংক্ষিপ্ত পরিচয় করিয়ে দেব।

চেয়ারে বসতে বসতে আপনি বললেন "জয়ন্ত বোস। তোমায় একটা দারুণ ছবি দেখাই। গতকাল হব্‌ল ওয়েব সাইট থেকে প্রিন্ট করা"। টেবিলের উপর রাখা ছবিটি জয়ন্তের হাতে দিলেন। এম-৫১ (M-51), সঙ্গে এক সাথী নক্ষত্রমন্ডলীর ছবি (রঙিন ছবি নং ৩ দেখুন)।

জয়ন্তের প্রশ্ন : দাদা M Stands for?

আপনার উত্তর : মেসিয়ার নম্বর। নক্ষত্রমন্ডলীদের ক্রমিক নম্বর। প্রায় ৩০ বছর ধরে (১৭৫৮-১৭৮৪) ফ্রান্সের মহাকাশ বিজ্ঞানী চরলস মেসিয়ার (charles Messier ১৭৩০-১৮১৭) তারামন্ডলীদের ক্যাটালগ করেছিলেন। সেই সময়কার কমজোরী টেলিস্কোপ দিয়ে। অসাধারণ কাজ।

ছবিটি দেখে মনে হচ্ছে না জয়ন্ত যে মা গ্যালাক্সিটি তার বাচ্চাটির হাত ধরে বিশ্ব মঞ্চে ঘুরতে বেরিয়েছেন?

৩ কোটি ১০ লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে এম ৫১ গ্যালাক্সির ছবিটি হবল টেলিস্কোপের তোলা। চলতি নাম হোর্য়ালপুল গ্যালাক্সি। বাংলায় "জলঘূর্ণি তারামন্ডলী" নামটা তোমার পছন্দ জয়ন্ত? মাঝগঙ্গায় ছোট ছোট জলঘূর্ণি নিশ্চয়ই দেখেছ। চিন্তা করে দেখ ঠিক একই রকম দেখতে নয় কি?

বিশাল বাহুগুলি দেখছ ঐগুলি বলা যায় তারা তৈরীর কারখানা। পুরো নক্ষত্রমন্ডলীটির ব্যাস প্রায় ১ লক্ষ আলোকবর্ষ। অতএব বুঝতেই পারছ কত লম্বা ঐ বাহুগুলি।

ভাল করে খেয়াল করে দেখলে, দেখবে এম ৫১ নক্ষত্রমন্ডলীটি পার্শ্ববর্তী ছোট্ট তারামন্ডলী NGC 5195 কে স্পর্শ করে নেই। ছোট্ট নক্ষত্রমন্ডলীটি এম ৫১-র পেছনে অবস্থান করছে। গা ঘেসে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। চেষ্টা করছে কয়েক লক্ষ বছর ধরে।

ছোট তারামন্ডলীর অত্যন্ত নিকট অবস্থানের কারণে মাধ্যাকর্ষণ বলের শক্তিশালী মাধ্যাকর্ষণ ঢেউ এম-৫১ নক্ষত্রমন্ডলীর হাইড্রোজেন গ্যাসকে সংকুচিত করে। (খয়েরী অংশগুলি হল হাইড্রোজেন গ্যাস আর ধুলো) জন্ম

নিতে থাকে অসংখ্য নতুন তারা। হাজার কোটি সংখ্যায়। (লাল অংশগুলিতে জন্ম হচ্ছে নতুন তারাদের)।

জয়ন্ত নীল অংশগুলিতে বসবাস করে নবীন তারার দল। যৌবনের দ্যুতিতে টইটম্বুর। বড় বড় নতুন তারাদের বিচ্ছুরিত রশ্মি এবং ক্রমে সুপারনোভা বিস্ফোরণের শকওয়েভ সরিয়ে দেয় পার্শ্ববর্তী ধুলো, অবশিষ্ট গ্যাস। বিশ্বগগনে আত্মপ্রকাশ করে উজ্জ্বল নীল তারা। এক নয়, দুই নয়, হাজার কোটি তারা। ভাব জয়ন্ত কি বিশাল বৈচিত্র্যময় এই বিশ্ব। আমাদের জ্ঞানের চৌহদ্দিতে অসীমত্বের অঙ্গিকার, জয়ন্ত? কি বল তুমি?

তুমি তো জান জয়ন্ত অসংখ্য তারা সমষ্টিগতভাবে একটি গ্যালাক্সি গঠন করে। অবশ্য তারা ছাড়াও গ্যাস এবং ধুলোর মিশ্রণে তৈরী বিভিন্ন প্রকার নেবুলাও বিরাজ করে গ্যালাক্সির অভ্যন্তরে।

আমি বলি জয়ন্ত

"তারাই হল তারা
আলো দেয় যারা"

জয়ন্তকে আপনার প্রশ্ন "আলো বলতে তুমি কি বোঝ?"

উত্তরে জয়ন্ত বলে : "আলো হল শক্তি"

সঠিক উত্তর জয়ন্ত। তারা হতে এই শক্তি বিচ্ছুরিত হয়। প্রশ্ন হল। তারারা কোথায় পায় এত শক্তি? তারাদের অভ্যন্তরে এই বিশাল শক্তি কিভাবে উৎপাদিত হয়?

জয়ন্ত বলে "দাদা আপনিই বলেছিলেন তাদের শক্তি হল আণবিক শক্তি।

ঠিক তাই বন্ধু। ফিউসন প্রক্রিয়ায় আণবিক শক্তি উদ্‌পাদিত হয় তারাদের মধ্যে। হাইড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রে অবস্থিত একটি প্রোটন কণা রূপান্তরিত হয় নিউট্রন কণায়। চারটি হাইড্রোজেন পরমাণুর চারটি প্রোটন ক্ষুদ্রকণা একটি হিলিয়াম পরমাণুতে (২টি প্রোটন এবং ২টি নিউট্রন হিলিয়াম ৪এ কেন্দ্রে অবস্থান করে) রূপান্তরিত হয় নিউক্লিয়ার ফিউসন প্রণালীতে। ফিউসন পদ্ধতিটি সংঘটিত হওয়ার জন্য দরকার প্রচন্ড উত্তাপ এবং বিশালভাবে ঘনীভূত গ্যাসের পর্যাপ্ত সরবরাহ।

নিউক্লিয়ার উইক ফোরসের কারণেই পরমাণুর মধ্যে ক্ষুদ্রকণার রূপান্তরটি সম্ভব হয় (প্রোটন রূপান্তরিত হয় নিউট্রনে)। এবং এই রূপান্তকরণের ফলে উদ্ভব হয় প্রচন্ড শক্তি।

হাইড্রোজেন বোমার শক্তির পেছনেও একই কারণ।

এছাড়াও তেজস্ক্রিয় পদার্থ যেমন ইউরেনিয়াম আপনা আপনি তেজস্ক্রিয়

রশ্মি বিচ্ছুরণ করে। ইউরেনিয়ামের পরমাণুর কেন্দ্রের নিউট্রন ক্ষুদ্রকণা প্রোটন ক্ষুদ্রকণায় রূপান্তরিত হয়। এই রূপান্তরিত হওয়ার সময় একটি ইলেকট্রন কণা এবং একটি ইলেকট্রন এন্টিনিউট্রিনো কণা বিচ্ছুরিত হয়। বেটা-ডিকে বলা হয় এই রূপান্তরটি।

খেয়াল কর জয়ন্ত, নিউট্রন এবং এন্টিনিউট্রিনো পারটিকেলগুলির চার্জ শূন্য। অতএব ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোরসের অনুপস্থিতি। আবার ইলেকট্রন এবং এন্টিনিউট্রিনো colorless। অর্থাৎ স্ট্রং ফোরসের অনুপস্থিতি। বাকি দুটি মৌলিক বলের মধ্যে গ্রাভিটি, উইক ফোরসের তুলনায় অত্যন্ত দুর্বল। অতএব রাজ্য কার? রাজ্য উইক ফোরসের। উইক ফোরস ইউরেনিয়ামকে ক্রমে ক্রমে হিলিয়াম অতঃপর দস্তাতে পরিবর্তিত করে। করে কচ্ছপের চলার গতিতে। কয়েক লক্ষ বছরে।

উইক ফোরসের বাহন কণা তিনটি। দুটি বিপরীত চার্জবিশিষ্ট বলা হয় W এবং W^- এবং তৃতীয়টি চার্জ শূন্য বাহন কণা। বলা হয় Z^0।

এই বাহন কণাগুলির বৈশিষ্ট এই যে এগুলি অন্য বলের বাহন কণার মত শূন্যভর বিশিষ্ট (ফোটন-গ্রাভিটন) অথবা অত্যন্ত কম ভরের বাহন কণা (গ্লুয়ন, ভর ০.১ Gev-র অধিক) মত নয়। গুরুভর কণা এই w এবং z বাহন কণা গুলি। এদের ভর ৮০ Gev-র অধিক। (Gev ১৭২ পৃষ্ঠায়)।

একটি বাহনকণার আদান প্রদানের কারণে দুটি ক্ষুদ্র কণার মধ্যে উইক ফোরসের উদ্ভব হয় এবং যেহেতু এই বাহনকণাটি গুরুভর বাহন কণা, উইক ফোরসের কর্ম্মক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য সবথেকে কম।

জয়ন্ত ১৯৭৯ সালে তিনজন পদার্থ বিজ্ঞানী নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। পুরস্কৃত হন কারণ এনারা প্রমাণ করেন ইলেট্রো ম্যাগনেটিক ফোরস এবং নিউক্লিয়ার উইক ফোরস দুটি ভিন্ন ফোরস নয়। মূলতঃ এই দুটি ফোরস একই ফোরসের দুটি ভিন্ন রূপ। দুটি ফোরসের নতুন নামকরণ হয় ইলেকট্রো উইক ফোরস।

ভাবতে আশ্চর্য লাগে বিশ্ব জন্মের ঠিক পরবর্ত্তী সময়ে বিশ্বের উত্তাপ ছিল অনেক বেশী। তখন ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোরস আর নিউক্লিয়ার উইক ফোরস মিলিতভাবে একটি মাত্র ফোরস ছিল। ঐ উত্তাপে হিগ্‌সফিল্ড ছিল প্রচণ্ডভাবে অস্থির। তান্ডব নৃত্যরত। ফলে ফোটন, w এবং z পারটিক্যালের মধ্যে ভরের তারতম্য ছিল না।

জয়ন্ত এর পর তোমায় যখন ফোরস ফিল্ডের কথা বলব তখন এই ব্যাপারটি বিস্তারিত ভাবে বলব।

দেখ জয়ন্ত আধুনিক কসমোলজিসটদের অনুমান সদ্য প্রসূত বিশ্বে চারটি নয় ছিল একটি মাত্র বল। অল্পক্ষণ পরেই প্রথম গ্রাভিটি, মাধ্যাকর্ষণ বলটি বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বমহিমায় আত্মপ্রকাশ করে বিশ্ব দিগন্তে। ক্রমে ক্রমে অপর তিনটি বলও মাধ্যাকর্ষণের দেখান পথে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজ নিজ কর্ম্মক্ষেত্রে অধিস্থিত হয়।

যেহেতু একই বলের থেকে চারটি মৌলিক বলের উৎপত্তি অতএব এই চারটি বলই একই বলের ভিন্নরূপ এই মতবাদ, যুক্তিপূর্ণ মতবাদ।

জয়ন্ত, বিজ্ঞান যুক্তিতে বিশ্বাসী নয়। গ্রহণযোগ্যতা এবং স্বীকৃতির একমাত্র উপায় পরীক্ষিত প্রমাণ।

unified field theory (ইউনিফায়েড ফিল্ড থিয়োরী) বাক্যটি কি শুনেছকি কোন দিন? এই Term টি coin করেছিলেন আর কেউ নয় মহামানব এ্যালবার্ট আইনস্ট্রাইন। জীবনের শেষ ৩০টি বছর তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল চারটি জাগতিক বলকে একই ফোরস ফিল্ডের অন্তর্ভুক্ত করা। চারটি বলকে একত্রীকরণ করা।

বাস্তবায়িত হয় নি তাঁর প্রচেষ্টা। The great man-এর অন্তর্ধানের ৫০ বছর পরেও তাঁর শেষ ইচ্ছে পুরনে ব্যর্থ তাবৎ মানবকুলের বিজ্ঞানীরা। আংশিক সাফল্য এনেছেন তিন Nobel Laureate বিজ্ঞানী। সেলডন গ্লাসহো (Sheldon Glashow), অবডস সালাম (Abdus Salam) আর স্টিভেন ওয়েনবার্গ (Steven Weinberg)। একত্রে প্রমাণ করেছেন ইলেকট্রোম্যাগনেটিক আর ইলেকট্রো উইক ফোরসে ভিন্ন দুটি রূপ আসলে প্রহেলিকা। ততধিক উত্তপ্ত অবস্থায় এই দুটি ফোরসই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট বিসর্জন দেয়। এক এবং অভিন্ন ভাবে অবস্থান করে। ভিন্ন দুটি ফোরসের অভিন্ন রূপের নাম হয় ইলেকট্রো উইক ফোরস। ১৯৭৯ সালে নোবেল পান এই তিন বিজ্ঞানী।

দেখ জয়ন্ত তত্ত্বীয় ভাবে বলা যাবে আরো অধিক উত্তাপে অথবা আরো অধিক শক্তিশালী ক্ষেত্রে চারটি মৌলিক বলের একত্রিকরণ সম্ভব। আধুনিক প্রযুক্তি বিদ্যায় এই বিশাল উত্তাপ বা শক্তি উৎপন্ন করা সম্ভব নয়। এই জন্যেই GUT (Grand Unified Theory) বা "ঐক্যবলের সমীকরণ" অথবা TOE (Theory of everything) বাংলায় হয়ত বলতে পারি "সবকিছুর সমীকরণ" (একই ব্যাপারের ভিন্ন নাম) অপেক্ষায় রয়েছে পরীক্ষিত প্রমাণের।

চারটি মৌলিক বলের ঐক্যসাধন বৈজ্ঞানীকদের কাছে সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ। দুটি থিয়োরী এই ব্যাপারে অগ্রগামী। সুপার স্ট্রিং থিয়োরী আর লুপ কোয়ানটাম গ্রাভিটি।

আশাকরা যায় ভবিষ্যতে আমরা চার কে এক করতে পারব। মায়ার প্রকৃতির আরো একটি অবগুণ্ঠন অপসারিত করতে কৃতকার্য হব।

পদার্থবিজ্ঞান ব্যাপারটা খুব একটা পছন্দের ব্যাপার নয় জয়ন্ত। নয় কি? তোমার কি মত?

জয়ন্তের সংক্ষিপ্ত উত্তর সহমত।

জয়ন্ত তাহলে খেলোয়াড়ের ৪টি বলের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার উপরান্তে চল তাঁদের খেলার মাঠ তোমায় দেখিয়ে দিই।

জয়ন্ত বলে ওঠে। দাদা মাঝে মাঝে তোমার হেঁয়ালিতে আমি দিশেহারা হয়ে যাই। কোন খেলোয়াড়? কোথাকার মাঠ? যাদুশিরমণী দাদা আমার, তোমার হেঁয়ালি ভেঙ্গে এই অধমকে যদি একটু দয়া কর?

ষষ্ঠ অধ্যায়

বলের ক্ষেত্র

বলেদের খেলার মাঠ ব্যাপারটা জয়ন্ত না বোঝায় আপনি হাসলেন।

মৃদু হাসিতে আপনার জবাব "দুই আর দুয়ে চার ব্যাপারটা বুঝলে না বন্ধু? চোখের আলোয় খেলোয়াড়দের দেখনি মানলাম। কিন্তু হৃদয়ের আলো দিয়েও কি তাঁদের দেখনি বন্ধু? মনে আছে কি তোমার আজকের আলোচনাটা কী?

জয়ন্তের উত্তর : "বলের খেলা—খেলার বল নয়"

আপনি : আর বল বলতে?

জয়ন্ত : চার মৌলিক বল।

আপনি : এঁরা খেলবে কোথায়?

জয়ন্ত : নিশ্চয়ই কোন মাঠে।

আপনি : Bull's eye my friend। অব্যর্থ নিশানা।

চল এবার বলি তোমার চার বলের খেলার ক্ষেত্রের কথা। বিজ্ঞানের ভাষায় ফোরস ফিল্ড (force field)।

আইনস্টাইনের তখন পাঁচ বছর বয়স। বাবার কাছে পেয়েছিলেন একটি পকেট কম্পাস। জন্মদিনের উপহার।

শিশু আইনস্টাইন অবাক হয়ে কম্পাসের কাঁটা দেখতেন তার ঘুরপাক খাওয়ার তালে তালে। পরবর্ত্তী জীবনে তাঁর অসামান্য জিজ্ঞাসু মনটির বীজ হয়ত বা রোপিত হয়েছিল এই সময়।

বয়স সন্ধীকালে তাঁরই স্বীকৃতি

"I have no special talent
I am only passionately curious."

তুমি কি জান জয়ন্ত আইনস্টাইনের ব্রেনটি সংরক্ষিত করা আছে? আধুনিক প্রযুক্তিতে বিশ্লেষিত, পরীক্ষায় প্রমাণিত ব্রেনটি অন্য নরমস্তিষ্কের তুলনায় ভিন্ন।

কেন ভিন্ন? কে দেবে এর জবাব?

দেবে বিজ্ঞান। আগামী দিনের বিজ্ঞান। চল জয়ন্ত জারী রাখা যাক আমাদের

বলের ক্ষেত্রের আলোচনা।

ভূগর্ভের গলিত লোহা পৃথিবীর আবর্ত্তনের ফলে আবর্তিত হয়। উৎপাদিত হয় চৌম্বকীয় ক্ষেত্র। পৃথিবীর চতুঃপার্শ্বে অবস্থান করে ক্ষেত্রটি। বর্মের মত অবস্থান করে। সূর্য্যের তেজস্ক্রিয় কণার ঝড় হতে, তেজস্ক্রিয় কসমিক ক্ষুদ্রকণার
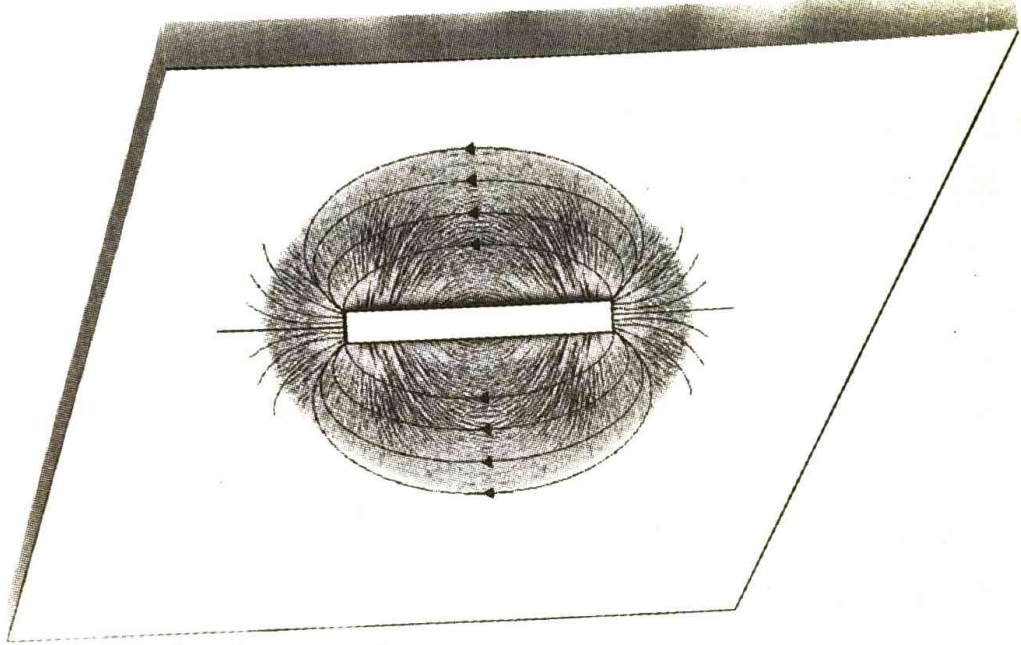
ম্যাগনেটিভ ফিল্ড : একটি বার চুম্বকের চারিদিকে লোহার গুড়ো ছড়িয়ে টেবিলটিকে সামান্য নাড়িয়ে দিলে লোহার গুঁড়ো গুলি বার চুম্বকের দু পাশ ধনুকের মত আকার নেয়।

হাত হতে রক্ষা করে পৃথিবীর যাবতীয় প্রাণীদের, উদ্ভিদদের। এক কথায় যারই প্রাণ আছে এ রকম সমস্ত কিছুই তাদের অস্তিত্ব রক্ষায় ঋণী পৃথিবীর চুম্বকীয় ক্ষেত্রের কাছে।

পৃথিবীর চতুঃপার্শ্বে চৌম্বকীয় ক্ষেত্রের অবস্থানের ফলে একটি চুম্বকের কাঁটা চুম্বকীয় উত্তর দক্ষিণ পোল ছাড়া সর্ব্বস্থানে, সর্ব্বক্ষণে কেবল উত্তর দক্ষিণ দিক নির্দেশ করে।

একটি বার ম্যাগনেটের চারদিকে লোহার গুড়ো ছড়িয়ে দিলে, গুড়োগুলি একটি বিশেষ আকৃতিতে সজ্জিত হয়। জয়ন্ত বিশেষ আকৃতিটি হল বার ম্যাগনেটটির ম্যাগনেটিক ফিল্ডের পরিধি।

ঠিক একই ভাবে ইলেকট্রিক ফিল্ড ও অবস্থান করে যে কোন ইলেকট্রিক্যালি চার্জ পদার্থের চতুঃপার্শ্বে।

ম্যাক্সওয়েল সাহেব প্রমাণ করেছিলেন, ইলেকট্রিক্যাল আর ম্যাগনেটিক ফিল্ড এক অপরের পরিপূরক। যুক্ত নামকরণ হয়েছিল ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ফিল্ড।

মরমে মরে যাই জয়ন্ত যখন দেখি এই সব মহা মনিষীরা সাধারণের মাঝে সেই ভাবে পরিচিত নয়। তথাকথিত শিক্ষিতদের মধ্যেও কজন জানে জেমস ক্লার্ক মাক্সওয়েলের নাম?

এই ফিল্ডের ব্যাপারে প্রথম চিন্তা ভাবনা করেছিলেন আর অন্য কেউ নয় জয়ন্ত। নরশ্রেষ্ঠদের একজন সেই স্যার আইজাক নিউটন। সমস্ত মানবকূল না জানি কত ভাবে ঋণী এই মহান মনিষীর কাছে।

নিউটন তাঁর মাধ্যাকর্ষণ বলের বিশ্লেষণ করার সময় চিন্তা করেছিলেন একটি ফিল্ডের কথা যার অভ্যন্তরে বলটি কাজ করে।

কোন প্রকার সরাসরি স্পর্শ ছাড়াও দুটি গুরুভর বস্তু পরস্পরের প্রতি বল প্রয়োগে সক্ষম। বল প্রয়োগের মাধ্যম মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্র। Gravitational field। মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্রের অভ্যন্তরে অবস্থিত বস্তুই কেবল মাধ্যাকর্ষণ বলের দ্বারা প্রভাবিত হয়।

ইংল্যাণ্ডের আর এক মহান বিজ্ঞানী মাইকেল ফ্যারাডে (Michael Faraday ১৭৯১—১৮৬৭) ফিল্ড বিষয়টির এক পূর্ণাঙ্গ রূপ দিয়েছিলেন। তখন ১৮২১ সাল। আবিষ্কার করেন ইলেকট্রিক ফিল্ডের উপস্থিতি।

এর ঠিক দু বছর আগে ১৮১৮ সালে ডেনমার্কের বিজ্ঞানী হ্যানস্ ক্রিশ্চিয়ান ওরস্টেড (Hans Christian oersted ১৭৭৭—১৮৫১) আবিষ্কার করেছিলেন চুম্বকীয় ক্ষেত্র। Magnetic field।

বেশ কয়েকশ পরীক্ষা নিরিক্ষা করার পর ফ্যারাডে সাহেব প্রমাণ করেন ইলেকট্রিক আর ম্যাগনেটিক ফিল্ড এক অপরের পরিপূরক। ইলেকট্রিক কারেন্ট ম্যাগনেটিক ফিল্ড উৎপন্ন করে। ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইলেকট্রিক কারেন্ট উৎপন্ন করে।

ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ডের ব্যাপারে সর্ব্বশেষ বক্তব্য রাখলেন স্কটল্যান্ডের প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী জেমস্ ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল (James clerk Maxwell ১৮৩১—১৮৭৯)। বিজ্ঞানে তাঁর অবদান অসামান্য। অবদান এতটাই যে যতই উল্লেখ করা হোক না কেন তা যথেষ্ট নয়। শনি গ্রহের রিংগুলি টুকরো, টুকরো পাথরের সমন্বয়ে গঠিত এই সত্যটি তিনি প্রমাণ করেন। সলিড রিং ভেঙ্গে পড়ত আর তরল রিং বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। স্থায়িত্তের জন্য টুকরো টুকরো পাথরের তৈরী রিং একমাত্র উত্তর। ১৯৭০ এবং ১৯৮০ সালে পাওনিয়ার এবং ভয়েজার কৃত্রিম উপগ্রহ তাঁর বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করে।

চারটি মাত্র সরল সমীকরণের মাধ্যমে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ডের পূর্ণ পরিচয় উনমোচন করতে এবং আলো যে

ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ সেটিও প্রমাণ করেছিলেন। অসামান্য আবিষ্কার জয়ন্ত। অসামান্য আবিষ্কার।

এই আবিষ্কারের সাহায্যেই মহামান্য আইনস্টাইন আবিষ্কার করেছিলেন তাঁর অনন্য কীর্তি স্পেশাল থিয়োরী অফ রিলেটিভিটি আর জেনারেল থিয়োরী অফ রিলেটিভিটি।

আইনস্টাইন তত্ত্বীয়ভাবে প্রমাণ করেছিলেন যে কোন সচল ভর মহাকাশীয় বস্তুর অবস্থানের ফলে বিশ্বের আকাশ ও সময়ের কাঠামোটিতে মাধ্যাকর্ষণ তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। অদ্যপি এই মাধ্যাকর্ষণ তরঙ্গ পরীক্ষিতভাবে প্রমাণ করা সম্ভব হয় নি। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে প্রমাণ করা সম্ভব হবে।

ইলেকট্রোম্যাগনেটিসম এর জন্যে ম্যাক্সওয়েল সাহেব যে কাজ করে ছিলেন আইনস্টাইনও সেই কাজই করলেন মাধ্যাকর্ষণের জন্যে।

তুমি বোধহয় জান জয়ন্ত এই আলো তথা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক তরঙ্গের প্রবাহের মাধ্যম হিসাবে অনুমান করা হয়েছিল ইথারের অস্তিত্ব। সমস্ত বিশ্বব্যাপী ইথারের অস্তিত্ব। লুমিনিফেরাস ইথার (Luminiferous aether)। অদৃশ্য, অস্পৃশ্য, অনাঘ্রাত, আনাস্বাদিত অনন্ত ইথার।

হঠাৎ করে আপনি জয়ন্তকে প্রশ্ন করলেন "জয়ন্ত তুমি কি এই ইথারের সঙ্গে নিউটনের স্বতন্ত্র আকাশের (absolute space) সাদৃশ্য লক্ষ্য করছ না? দুটিই তো অনুমান ভিত্তিক।

পরবর্তীকালে এই দুটি মতবাদ ই ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত। ভ্রান্ত প্রমাণ করেছিলেন সেই মহামানব নরশ্রেষ্ঠ এ্যালবার্ট আইনস্টাইন। বলেছিলেন প্রমাণ নেই কারণ তার অস্তিত্ব নেই।

স্ট্রং ফোরসের ফিল্ডের ব্যাপারে তোমায় একটু আগেই বল্লাম জয়ন্ত। color ফোরস ফিল্ড কেওয়ার্ক একত্রে ধরে রাখে।

কোয়ান্ট্যাম বিশ্বে সবকিছুই ভীষণ রকম অস্থির। অবশ্য সেই অর্থে সমস্ত বিশ্বই প্রচণ্ড ভাবে অস্থির। বিগ ব্যাঙ অস্থিরতায় এর সূচনা। অস্থির এর জীবন কাল। ঘটবে অস্থিরতায় পরিসমাপ্তি।

কোয়ান্টাম বিশ্বের অস্থিরতার এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ ক্ষুদ্র কণাদের ক্ষয়প্রাপ্তি হওয়া এবং ক্ষুদ্র কণাদের ধ্বংস হওয়া। Decay and anihilation of particles। সূর্য্যের এবং তারাদের আণবিক পক্রিয়ার কারণ পারটিক্যালের ক্ষয়প্রাপ্তি। পারটিক্যাল ডিকে ব্যাপারটির পেছনে স্ট্রং এবং উইক ফিল্ডের গুরুত্ব অপরিসীম।

জয়ন্ত আমি আরো দুটি ফিল্ডের কথা উল্লেখ করব। আধুনিক বিশ্বতত্ত্ব পর্য্যালোচনায় ফিল্ডের গুরুত্ব কেন্দ্রস্থ স্থান গ্রহণ করে।

জয়ন্ত স্কুলে পড়েছ নিশ্চই কোন পদার্থের ভর এবং ওজন (Mass and weight) এই দুটি এক নয়। ভর পদার্থের নিজস্ব জিনিস। ওজন মাধ্যাকর্যণের ওপর নির্ভরশীল।

ভরকে এভাবেও বলা যায়। দেখ জয়ন্ত বল (Force) একটি পদার্থের গতিকে ত্বরাণ্বিত করে। বল একটি স্থির পদার্থকে গতিশীল করে। পদার্থটি বলটিকে বাধা দেয় তাকে গতিশীল করতে অথবা তার গতিকে ত্বরান্বিত করতে। এই বাধাকেও আমরা পদার্থটির ভর বলতে পারি জয়ন্ত। বাধা দেওয়ার পরিমাণটাই পদার্থের ভর।

পক্ষান্তরে ওজন নির্ভর করে পদার্থের অবস্থানের ওপর। সেই স্থানের মাধ্যাকর্যণের আকর্যণের ওপর। পৃথিবীর মাধ্যাকর্যণের আকর্যণ চাঁদের মাধ্যাকর্যণের বেশী। এই কারণে পৃথিবীতে তোমার ওজন চাঁদে তোমার ওজনের থেকে বেশী।

অতএব ভর স্থির। ওজন স্থির নয়। ওজন নির্ভর করে মাধ্যাকর্যণ আকর্যণের ওপর। নিউটনের সূত্র অনুসারে গুরুভর বস্তুর মাধ্যাকর্যণ আকর্যণ অধিক। জয়ন্ত তোমার ওজন পৃথিবী—৭০ কেজি।

চাঁদে—মাত্র ১১.৬ কেজি

গ্রহ বৃহস্পতিতে—১১৭ কেজি

সূর্যে—১৪৯৫ কেজি।

জয়ন্ত বলে "দাদা নিখরচাতেও আমি সূর্যে যেতে রাজী নই। বসতে পারবনা। হাঁটতে পারব না।"

আপনি বললেন "জয়ন্ত সাদা বামন তারাতে (White dwarf Ster) তোমার ওজন হবে ৯১,০০০,০০০ কেজি। আর জয়ন্ত বলে "দাদা এরপরও আর?

শোন বন্ধু শোন নিউট্রন তারাতে নিউট্রন ক্ষুদ্রকলায় রূপান্তরিত জয়ন্তের ওজন হবে ৯৮০০,০০০,০০০ কেজি। বা ৯৮০ কোটি টন।

যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটির উত্তরের জন্য বিগত কয়েক দশক ধরে বহু বিজ্ঞানী নিরলস গবেষণায় রত সেই প্রশ্নটি হল পদার্থের মধ্যে ভরের সঞ্চার এবং তার কারণ। কিসের গুনে বা কার প্রভাবে পদার্থের মধ্যে, অণু পরমাণু, ক্ষুদ্রকণাদের মধ্যে ভরের সঞ্চার হয়? কি কারণে টপ এবং বটম কেওয়ার্ক, W এবং Z বোসন কণা গুরুভার ক্ষুদ্রকণা?

১৯৬০ সাল। স্কটল্যাণ্ডের এডিনবার্গ ইউনিভারসিটির পদার্থ বিজ্ঞানী পিটার ডাব্লু হিগ্‌স এই প্রশ্নের উত্তরে অবতারণা করলেন এক নতুন ফিল্ডের। হিগ্‌স ফিল্ড। হিগ্‌স-বোসন ক্ষুদ্রকণায় রচিত হিগ্‌স ফিল্ড।

আদ্যাপি হিগ্‌স ফিল্ড এবং হিগ্‌স-বোসন ক্ষুদ্রকণার অস্তিত্ব পরীক্ষিত ভাবে প্রমাণিত নয়। আশাকরা যায় দুচার বছরের মধ্যেই সুইজারল্যাণ্ডের CERN এ নির্ম্মিয়মান LHC (Large hardon collider), অত্যন্ত শক্তিশালী পারটিক্যাল একসেলরেটার মেশিনে এদের অস্তিত্ত্ব প্রমাণিত হবে।)

হিগ্‌স ফিল্ডের বিস্তার দিগন্তের সর্ব্বত্র। যে সব ক্ষুদ্রকণাদের গতি হিগ্‌স ফিল্ডের দ্বারা প্রতিহত হয় সেই সব ক্ষুদ্রকণার মধ্যে ভরের সঞ্চার হয়। যে ক্ষুদ্রকণার গতি যত অধিক প্রতিহত হয় সেই ক্ষুদ্রকণার ভরও তত অধিক হয়। যে ক্ষুদ্রকণার গতি হিগ্‌স ফিল্ডের দ্বারা প্রতিহত হয় না সেই ক্ষুদ্রকণার ভর শূন্য। যেমন ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোরসের বাহন কণা ফোটন। হিগ্‌স ফিল্ডে ফোটনের গতি প্রতিহত হয় না। ফোটনের ভর শূন্য। আপ এবং ডাউন কেয়ার্কের গতি কম প্রতিহত হয়। আপ এবং ডাউন কেওয়ার্কের ভর স্বল্প। টপ, বটম, W,Z ক্ষুদ্রকণাদের গতি প্রচণ্ড ভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয় হিগস ফিল্ডের দ্বারা। এই কারণেই এই সব ক্ষুদ্রকণারা গুরুভর ক্ষুদ্রকণা।

এবার জয়ন্ত তোমায় আরো একটি ফিল্ডের কথা বলে আজকের আলোচনার ইতি টানব। কোয়ানটাম ফিল্ড।

অনুমান করা হয় বিগব্যাঙে বিশ্বের উদ্ভব হয়েছিল পূর্ণ শক্তি হিসেবে। জন্মক্ষণে বিশ্বের ঘনত্ব ছিল ঘনত্ত্বের শেষ সীমায়। উত্তাপ ছিল উত্তাপের শেষ সীমায়। এই চরম অবস্থায় পারটিক্যাল বা ক্ষুদ্রকণার উৎপত্তি সম্ভব ছিল না। অতি অল্প সময় পরেই শক্তি হতে উৎপত্তি হয়েছিল বিভিন্ন মৌলিক ক্ষুদ্রকণা। particals। Fundamantal particles) কেওয়ার্কস, লেপটন, বোসন ইত্যাদি।

কোয়ানটাম ফিল্ড থিয়োরী (QFR) শক্তি হতে ক্ষুদ্রকণার উৎপত্তির ঘটনাটির যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা করে।

দেখ জয়ন্ত বাস্তব ক্ষুদ্রকণার অস্তিত্বে নয়। QFT মতানুসারে বাস্তব ক্ষুদ্রকণাদের ফিল্ডের অস্তিত্ব। উদাহরণ দিয় বলি। ইলেকট্রন ফিল্ড সমস্ত বিশ্বজুড়ে বিরাজমান। এই ফিল্ডের উত্তেজনায় (excitation) ইলেকট্রন কণার উৎপত্তি হয়। শক্তি পদার্থে রূপান্তরিত হয়। এই কারণেই বিশ্বব্যাপি সমস্ত ইলেকট্রন কণা সর্ব্বতভাবে সমরূপ। অনুরূপভাবে সব মৌলিক কণার উৎপত্তির কারণ Matter field এর অস্তিত্ব।

আপনি জয়ন্তকে প্রশ্ন করলেন "জয়ন্ত কোয়ানটাম, কোয়ানটিসাইজড,

কোয়ান্টা এই সমস্ত শব্দগুলি কি তোমার কোন জটিল বিষয়ের শব্দ বলে মনে হয়?

জয়ন্তের উত্তর "না বললে দাদা মিথ্যে বলা হবে।" মনে হয় এই সব ব্যাপারগুলি বুদ্ধিমান বৈজ্ঞানিক, কৃতি ছাত্র, নামী অধ্যাপক, এঁনারাই ব্যবহার করেন।

আপনি বললেন "কোন কোন ক্ষেত্রে কোয়ানটাম মেকানিকস্ এর গভীর তত্ত্ব এবং তার গণিত জটিল। এই ব্যাপারে তোমার বক্তব্য সঠিক। যদিও এর মৌলিক ব্যাপারগুলি আদৌ জটিল নয়।

দেখ জয়ন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুর মূলে শক্তি (energy)। খুব সম্ভবত বিগব্যাঙের সময়, অর্থাৎ বিশ্ব জীবনের আরম্ভ, আকাশ আর সময়ের শুভারম্ভ হয়েছিল শক্তি রূপে।

কোয়ানটাম হল শক্তির একটি মান। একটি মাত্রা। যে মান বা মাত্রা দিয়ে শক্তিকে পরিমাপ করা হয়।

আলো হল শক্তি। আলোর বাহন কণা ফোটন। একটি ফোটনের শক্তিকে বলা হয় এক কোয়ানটা আলো।

অন্যান্য ফিল্ডের তুলনায় কোয়ানটাম ফিল্ড স্বতন্ত্র। অন্যান্য ফিল্ডের ন্যায় কোয়ানটাম ফিল্ড অবিচ্ছিন্ন বা একটানা নয়। এর প্রসার বিচ্ছিন্ন। ক্ষেপে ক্ষেপে। আমাদের নাড়ির স্পন্দনের অনুরূপ। কোয়ানটাম ফিল্ডে বিস্তার বিশ্বের সর্বত্র।

হেইসেনবার্গের আনসারটেনটি প্রিন্সিপালের অনুসারে কোন ফিল্ডের মান এবং সেই ফিল্ডটির পরিবর্তনের মান দুটিকে একই সঙ্গে নিদৃষ্ট করা সম্ভব নয়। একটির মান নিদৃষ্ট করা হলেই অপরটি তাৎক্ষণিক ভাবে অনিদৃষ্ট হয়ে পড়ে।

অতএব জয়ন্ত কোন এক মূহুর্তে যখন ফিল্ডের মান শূন্য, সেই মূহুর্তে আমরা কি বলতে পারি, না ফিল্ডের পরিবর্তনের হার প্রচণ্ডভাবে চঞ্চল? শূন্যকে ঘিরে ফিল্ডের ওঠা নামার হার তীব্র? এই আছে, এই নেই এই রকম এক অবস্থা। নিশ্চয়ই বলা যায় ফিল্ডের হার কখনই শূন্য নয়। বিশ্বের কোন স্থানই প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণভাবে শূন্য নয়। এইটিকে বলা Vacume fluctuation, ভাকিউম চাঞ্চল্য। ভাকিউম চাঞ্চল্য পরীক্ষিত ভাবে প্রমাণিত। ১৯৪৮ সালে হলাণ্ডের বিজ্ঞানী হেনড্রিক ক্যাসিমির (Hendrik Casimir) প্রমাণ করেন সম্পূর্ণ শূন্য স্থানে (Vacume) দুটি পাতলা ধাতুর পাত কোন রকম বলের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

বুঝলে জয়ন্ত কোয়ানটম বিশ্বে সব কিছুই নৃত্যরত। অহরহ নৃত্যরত।

মহামানব আইনস্টাইনের প্রবর্ত্তিত শব্দ Unified field theory (একত্রিত ক্ষেত্রের সমীকরণ) মতে ব্রহ্মাণ্ডের জন্মক্ষণে অস্তিত্বও ছিল একটি মাত্র ফিল্ড। যথোপযুক্ত নাম তার Primary field বা প্রাথমিক ক্ষেত্র।

অতঃপর জন্মক্ষণের মাত্র $১০^{-৩২}$ সেকেণ্ড পর ব্রহ্মাণ্ডের স্ফিতি (Infletion) ব্যাপারটি সংঘটিত হয় মাত্র $১০^{-৩৫}$ সেকেণ্ডে। ব্রহ্মাণ্ড একটি সম্মানিত আকার ধারণ করে। এর ঠিক $১০^{-২০}$ সেকেণ্ড তখন প্রথম ইলেকট্রোউইক ক্ষেত্রটি প্রাথমিক ক্ষেত্র হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এর $১০^{-৪}$ সেকেণ্ড পরে অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড যখন মাত্র $১০^{-৬}$ সেকেণ্ডের শিশু তখন ব্রহ্মাণ্ডের প্রথম কেওয়ার্ক ক্ষুদ্রকণার উদ্ভব হয়। গঠিত হয় প্রোটন-নিউট্রন-ইলেকট্রন। আর ব্রহ্মাণ্ডের আয়ু যখন ১০০ সেকেণ্ড বিশ্বের প্রথম অণু হাইড্রোজেন, হিলিয়াম আর লিথিয়াম বিশ্বগগনে আত্মপ্রকাশ করে। গ্রাফিটেশনাল ক্ষেত্র আর লিথিয়াম বিশ্বগগনে আত্মপ্রকাশ করে। গ্রাভিটেশনাল ক্ষেত্র পৃথক হয়ে স্বমহিমায় অধিষ্ঠিত হয় বিশ্বের দরবারে।

জয়ন্ত এই হল বিশ্বের প্রথম ২ মিনিটের ইতিহাস। কসমোলজি বিজ্ঞানে অত্যন্ত মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ ২ মিনিট।

সপ্তম অধ্যায়

শ্বেত বামন তারা ; নিউট্রন তারা ; কৃষ্ণগহ্বর

পৌষমাস।

জয়ন্ত আর আপনি শান্তিনিকেতন থেকে ১২ কি: মি: দূরে বনলক্ষ্মী বলে একটি রিসোর্ট এ গেছেন। উদ্দেশ্য রাত্রে তারায় ভরা আকাশ দেখা।

বনলক্ষ্মীর দক্ষিণে ধুধু প্রান্তর।

আমাবস্যার নিশুতি রাত।

মাঝ মাঠে ছোট কোলাপসিবল ইজি চেয়ারে আধশোয়া অবস্থায় উপবিষ্ট আপনি।

চোখের সামনে লক্ষ তারায় সজ্জিত আকাশ। চর্তুদিকে ইলেট্রিক আলো বিহীন নিশ্ছিদ্র পূর্ণ অন্ধকার। নিস্তব্ধ নিথর ভবানী। এই নিস্তব্ধতা কৃত্রিমভাবে শব্দরোধের নিস্তব্ধতা নয়। এই নিস্তব্ধতা কোনরকম শব্দের অনুপস্থিতির অকৃত্রিম, নৈসর্গিক নিস্তব্ধতা। অন্তর স্পর্শ করার নিস্তব্ধতা।

আপনার জীবনে এই হেন পরিবেশের অভিজ্ঞতা এই প্রথম। মায়াচ্ছন্ন হয় আপনার মন। ব্রহ্মাণ্ডের অসীমত্তার উপলব্ধিতে বিমোহিত হন আপনি।

জয়ন্তের ফিস্‌ফিস্‌ কণ্ঠস্বরে বাস্তবে ফিরে আসেন আপনি। ''দাদা কাউকে কিছু না বলে...কি চিন্তায় যে ফেলেছিলেন আপনি।

পরে কথা হবে বন্ধু ''বিচার হবে পরে। প্রকৃতির অনন্য রূপ অবলোকনের সময় এখন। মায়ের কোলে বসে পড়। চোখ রাখ অন্তরীক্ষে। আপনা হতেই রুদ্ধ হবে কণ্ঠস্বর।

পরের দিন সকাল বেলায় প্রাতরাশের পর আপনি আর জয়ন্ত বনলক্ষ্মী আম্রকুঞ্জে পিঠে রোদ লাগিয়ে বসে আছেন। আপনাদের morning session আরম্ভ করলেন আপনি।

''জয়ন্ত আজ এই ঝলমলে শীতের দিনে এসো কৃষ্ণ গহ্বরের বিষয়ে আলোচনা করা যাক। কৃষ্ণ গহ্বরের ব্যাপারে তোমার বিশেষ কৌতূহল আমি লক্ষ্য করেছি। রহস্য মানুষকে আকৃষ্ট করে। রহস্যের বাতাবরণের মোড়া কৃষ্ণ গহ্বর। কৌতূহল হবারই কথা।

একাধারে যেমন ভীতিপ্রদ, ভয়ঙ্কর, অন্যদিকে এমন এক অদ্ভুত বস্তুর অস্তিত্বই অচিন্তনীয়। হাজার কোটি সূর্যের সম শক্তিশালী আনুপাতিক ভাবে বলা হয় শীর্ণ কায়া (মহাকাশে অধিকৃত স্থানের পরিপ্রেক্ষিতে) অথচ সম্পূর্ণ ভাবে অদৃশ্য।

তোমায় এখন আমি ব্ল্যাক হোলের কথা বলব। ব্ল্যাক হোলের বাংলা নাম কৃষ্ণ গহ্বর।

উজ্জীবিত জয়ন্ত নড়েচড়ে বসে। বলুন বলুন দাদা ঐ সেইই মহাশ্চর্য্য মহাকাশীয় বস্তুর কথা। ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বাধিক ভক্ষকের কথা। কত দিনের স্বপ্ন আমার।

আপনি— রেডি জয়ন্ত?

জয়ন্ত —ইয়েস and গো

ইসৎ হেসে আপনি Here we go.

দেখ জয়ন্ত যাবতীয় মহাকাশীয় বস্তুর মধ্যে ব্ল্যাক হোল স্বতন্ত্র। বিশ্বগগনে হাজার হাজার ব্ল্যাক হোলের অস্তিত্ব আজ সুনিশ্চিত ভাবে প্রমাণিত। এদের পরিচয়? অলভ্য। অলভ্য, কারণ আমাদের জ্ঞানের বিস্তৃতির সীমাবদ্ধতা। আশা আমার আগামী দিনের মানুষের প্রসারিত জ্ঞান প্রবেশ করবে ব্ল্যাক হোলের গভীর অভ্যন্তরে। জানব আমরা ব্রহ্মাণ্ডের উৎস, ব্রহ্মাণ্ডের বর্তমান, ব্রহ্মাণ্ডের ভবিষ্যত।

জয়ন্তের প্রশ্ন : দাদা আপনার কথার অর্থ এই কি? ব্ল্যাক হোলের পরিচয়ের অর্থে ব্রহ্মাণ্ডের পরিচয়?

বলতে পারে কিছুটা তায়। মানুষের জ্ঞানের একটি বিশেষ প্রতিবন্ধকতার কারণে ব্ল্যাক হোলের অন্দর মহলের পরিচয় এবং বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের জন্মক্ষণে তার পরিচয় আমাদের কাছে অলভ্য। এর জন্যে দরকার কোয়ানটাম মেকানিকস্ এবং জেনারেল রিলেটিভিটির যুগ্ম প্রয়োগ। বাধ সাধছে গণিত। চেষ্টা চলেছে অবিরাম। আসছে নতুন নতুন থিয়োরী। সুপার স্ট্রিং থিয়োরী, কোয়ান্টাম গ্রাভিটি ইউনিফায়েড ফিল্ড থিয়োরী, গ্র্যাণ্ড ইউনিফিকেশন থিয়োরী, এই ব্যাপারে অগ্রগামী।

ব্ল্যাক হোল তার পার্শ্ববর্তী সমস্ত কিছুকে (তারা, নক্ষত্রমণ্ডলী, নেবুল ইত্যাদি যাবতীয় মহাকাশীয় বস্তু) নিজের দিকে আকর্ষিত করে নিক্ষেপ করে তার অতল গহ্বরে। নিশ্চিহ্ন করে দেয় একের পর এক বিশাল বিশাল সব তারাদের, এমনকি বিশাল বিশাল সম্পূর্ণ নক্ষত্রমণ্ডলীকে। কি পরিণতি হয় ঐ সব ভোজ্য দ্রব্যের?

কি অবস্থায় অবস্থান করে ঐ সব মহাকাশীয় বস্তু ব্ল্যাক হোলের ঐ ক্ষুদ্র পরিসরে?

জয়ন্ত অবিজ্ঞাত এই সব প্রশ্নের উত্তর। প্রশ্নগুলি বহু বিজ্ঞানীর গবেষণার বিষয় বস্তু। কঠিন এ কাজ। কারণ ব্ল্যাক হোলের অসীম মধ্যাকর্ষণ শক্তি।

ব্ল্যাক হোলের গণ্ডি অতিক্রম করে কোন কিছুই এমনকি আলো পর্যন্ত বহিঃগমনে অক্ষম। কোন প্রকারের সঙ্কেতও বহিঃগমনে অক্ষম।

এই কারণেই ব্ল্যাক হোলের অন্দরমহল আজও রয়েছে রহস্যাবৃত।

ব্ল্যাক হোল সরাসরি দৃশমান নয়। বলা যায় সার্থক নামকরণ। পরোক্ষভাবে এদের অস্তিত্ব প্রমাণিত। প্রমাণিত বহুবার, বহুস্থানে, বহুকারণে।

কিছুক্ষণ মৌন থাকার পর আপনি জয়ন্তকে প্রশ্ন করলেন "জয়ন্ত (escap velscity) এসকেপ ভেলোসিটি ব্যাপার কি জান?"

জয়ন্ত জবাব— "দাদা velocity বা গতি কি? জানি। কিন্তু escape বা লুকোনো গতি?

আপনি বললেন আরে নানা এখানে escape অর্থে লুকোনো বা পলায়ন করা নয়। অর্থ এখানে মুক্তি বা নিষ্কৃতি। যথোচিত শব্দ মুক্তি। Escape velocity মানে মুক্তির গতি।

জয়ন্ত Fill up the gaps কর। ইংরেজীতে একটা প্রবাদ What goes up.... ড্যাস, ড্যাস, ড্যাস মৃদু হেসে জয়ন্তের উত্তর Elimentary sir। What goes up, must come down।

Bravo my firend। কিন্তু প্রবাদটি "যাহাই উপরে যায় তাহাই নিচে নামে" সর্ব্বদাই সত্য নয়। পৃথিবীর মুক্তির গতির (escape velocity) অধিক গতিতে কোন বস্তুকে মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত করা হলে বস্তুটি পুনরায় ভূপৃষ্ঠে প্রত্যাবর্তন করে না। বিলিন হয়ে যায় মহাকাশে।

এই কারণে মহাকাশচারী রকেট পৃথিবীর মুক্তির গতির অধিক গতিতে উৎক্ষিপ্ত হয়।

পৃথিবীর মুক্তিগতি (escape velacity) ১১.২ কিঃমিঃ প্রতি সেঃ বা ৪০, ০০০ কিঃ মিঃ প্রঃ ঘঃ।

সূর্যের ভর পৃথিবীর তুলনায় অনেক বেশী। অতএব সূর্যের মাধ্যাকর্ষণের আকর্ষণ অনেক বেশী। অতএব সূর্যের পৃথিবীর তুলনায় মাধ্যাকর্ষণের মুক্তির গতি ও অনেক বেশী। সূর্যের মুক্তির গতি ৬১৮ কিঃ মিঃ প্রঃ সেঃ।

আপনি বললেন "জয়ন্ত তোমার মনে হতে পারে হয়ত। ব্ল্যাক হোলের বিবরণে আমি কেন মুক্তির গতি সম্বন্ধে এত কথা বলছি?

ব্ল্যাক হোলের ব্ল্যাক হওয়ার কারণ এর মুক্তির গতি অসীম। Infinity

জয়ন্ত ধর পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ যদি ২গুণ হয়ে যায়। তোমার, আমার, সবেরই ওজনও ২ গুণ হবে। হাঁটা চলায় অসুবিধে হবে। ৫ গুণ মাধ্যাকর্ষণে হাঁটা চলা তো দূরের কথা, শুয়ে বসে থাকতেও অসুবিধে হবে। ২০ গুণ মাধ্যাকর্ষণে অধিকাংশ প্রাণীর প্রাণহানী ঘটবে। বাড়ী, ঘর দুয়ার, গাছ পালা সমস্ত ভেঙ্গে পড়বে। মাধ্যাকর্ষণ ১০০০০গুণ বেড়ে গেলে, পাহাড় পর্ব্বত সমেত সমস্ত কঠিন পদার্থ ধুলিকণায় রূপান্তরিত হবে। আমাদের সাধের চাঁদ মামা পৃথিবীর আকর্ষণে আছড়ে পড়বে পৃথিবীর বুকে। পৃথিবী সম্পূর্ণভাবে সমতল হয়ে যাওয়ার ফলে জলাবৃত্ত হবে ধরাধাম। বর্দ্ধিত মাধ্যাকর্ষণের ফলে পৃথিবীর মুক্তির গতি হবে ১৬০০ কিঃ মিঃ প্রঃ সেঃ।

এই ভাবে বাড়তে বাড়তে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ যদি ১০ কোটি গুণ বৃদ্ধি পায় তখন পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের মুক্তির গতি হবে ৩ লক্ষ ৫০ হাজার কিঃ মিঃ প্রঃ সেঃ। অর্থাৎ আলোর গতি ৩০০০০ (তিন লক্ষ) কিঃ মিঃ প্রঃ সেকেণ্ডের অধিক। এই অবস্থায় একটি বিশেষ ঘটনা ঘটবে। বলতে পার জয়ন্ত ঘটনাটি কি? আপনার প্রশ্ন।

জয়ন্তের উত্তর : দাদা বক্তা আপনি। আমি শ্রোতা।

শোন তবে এই অবস্থায় আলোর বাহন কণা ফোটনের গতি পর্য্যন্ত রুদ্ধ হবে পৃথিবীর বিশাল মাধ্যাকর্ষণের আকর্ষণে। পৃথিবী হতে আলোর বা কোন কিছুরই বহিঃগমন সম্ভব হবে না। আলোর অবর্তমানে বহিঃবিশ্বের কাছে পৃথিবী হয়ে যাবে এক মহাকাশীয় অদৃশ্য বস্তু। ব্ল্যাক হোল।

বাস্তবে অবশ্য কোন গ্রহই ব্ল্যাক হোলে রূপান্তরিত হয় না। কেবল মাত্র সূর্য্য হতে ৬ গুণ এবং তার অধিক বৃহৎ নক্ষত্ররা তাদের নক্ষত্র জীবনের উপরান্তে ব্লাক হোলে রূপান্তরিত হয়। কারণ? পরে বলছি বন্ধু।

জয়ন্ত চল দেখা যাক কি ভাবে সঙ্কোচিত হয় এই অতি আশ্চর্য্য রূপান্তর করণ।

ব্ল্যাক হোলের বিবরণে আপনা আপনি এসে পড়ে আরো দুই প্রকার মহাকাশীয় পদার্থ। স্বেত বামন তারা (White dwarf Star) এবং নিউট্রন তারা (Neutron star)। অনন্য বৈশিষ্ট্যের জন্যে স্বতন্ত্র ভাবে উল্লেখের দাবিদার এরাও।

জয়ন্ত আমি আগেই বলেছি "সমস্ত নক্ষত্রের গঠনের মূলে হাইড্রোজেন গ্যাস। বলা উচিত অধিকাংশ নক্ষত্রের গঠনের মূলে H_2 gas। সূর্যের ৯২ শতাংশই H_2 gas। তারাদের প্রজ্জ্বলিত রাখে এই H_2 gas। ইন্ধন হাইড্রোজেন

গ্যাস। তারাদের আদি পর্ব নিহারিকা। মহাকাশীয় ধুলিকনা এবং গ্যাসিও পদার্থে (মুখ্যত হাইড্রোজেন গ্যাস) সন্মিলিত নিহারিকা।

মাধ্যাকর্ষণের কারণে নিহারিকার সঙ্কোচন হয়। সঙ্কোচনের ফলে উত্তাপের সৃষ্টি হয়। প্রচণ্ড ভাবে উত্তপ্ত হয় হাইড্রোজেন গ্যাস। আরম্ভ হয় হাইড্রোজেন গ্যাসের আণবিক প্রক্রিয়া। দাহিত হতে থাকে H_2। H_2 রূপান্তরিত হয় হিলিয়াম গ্যাসে।

এই আণবিক প্রক্রিয়ার বিকর্ষিত বল প্রতিহত করে মাধ্যাকর্ষণের আকর্ষিত বলকে। রুদ্ধ হয় মাধ্যাকর্ষণের সঙ্কোচন। পরিস্থিতিতে আসে সাময়িক স্থায়িত্ব। আরম্ভ হয় একটি নক্ষত্রের জীবন।

জয়ন্তের প্রশ্ন— "দাদা সাময়িক স্থায়িত্ব কেন?

আপনার উত্তর "জয়ন্ত এখন নিশ্চিত ভাবে প্রমাণিত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কোন কিছুই স্থির নয়। চিরস্থায়ী নয়। ভর অনুপাতে নক্ষত্রের এক নিদৃষ্ট আয়ুষ্কাল বর্তমান।

সূর্যের আয়ুষ্কাল আরো ৫০০ শ কোটি বছর। এর উপরান্তে নিঃশেষিত হবে ইন্ধন হাইড্রোজেন গ্যাস। স্তব্ধ হবে আণবিক প্রক্রিয়া। নিশ্চিহ্ন হবে মাধ্যাকর্ষণের সংকোচনকে প্রতিহত করার কোন বল। পুনরায় আরম্ভ হবে মাধ্যাকর্ষণের সঙ্কোচন। Gravitaional Collaps।

এই পর্যন্ত সমস্ত নক্ষত্রের জীবনকাল অভিন্ন। পরবর্তী পরিণতি নির্ভর করে নক্ষত্রের ভর তথা ঘনত্বের উপর। সম্ভাব্য পরিণতি তিন প্রকার।

ফোড়ন ফাটে জয়ন্ত "দাদা, মরণোত্ত্বরে তারাদের তিন অবস্থা?

আপনার জবাব "মরণোত্ত্বর কথাটা এখান ঠিক খাটে না জয়ন্ত। বলতে পার তারাদের আসল জীবনের পর। নক্ষত্র বলতে আমরা যা বুঝি সেই জীবনের অবসান একথা নিশ্চয়ই ভাবে বলা যায়।

বনলক্ষ্মীর এক কর্মী চা দিয়ে যায় আপনাদের। চায়ে চুমুক দিয়ে আপনি জারী রাখেন আপনার বক্তব্য।

যা বলছিলাম। পরিণতি তিন প্রকার—

১) তারার স্বেত বামন তারায় (white dwarf star) রূপান্তরকরণ।

২) তারার নিউট্রন তারায় রূপান্তরকরণ।

৩) তারার ব্ল্যাক হোলে রূপান্তরকরণ।

স্বেত বামন তারা (White dwarf star) : মহাকাশের তারাদের মধ্যে স্বেত বামন তারা বা white dwarf তারা অত্যন্ত অনুজ্জ্বল এবং অত্যন্ত

অস্পষ্ট। এর ক্ষুদ্র আয়তন এর কারণে। এই তারাদের মহাকাশে চিহ্নিত করা কঠিন। আমাদের সূর্যের পরিণতিও শ্বেত বামন তারা।

জ্বালানী হাইড্রোজেন গ্যাসের নিঃশেষিত হওয়ার পর সূর্য বা ঐ আয়তনের অন্যান্য সব তারাদের মাধ্যাকর্ষণীয় সংকোচন আরম্ভ হয়। ফলে তারার মধ্যভাগে প্রচণ্ড তাপের সৃষ্টি হয়। এই প্রচণ্ড উত্তাপ অবশিষ্ট কিছু হাইড্রোজেন গ্যাসের পুনরায় আণবিক প্রক্রিয়া আরম্ভ করে তারাটির বহিঃভাগে। ফলে তারাটির আয়তনের বৃদ্ধি ঘটে প্রায় ১০০ গুন। এই অবস্থায় তারাটিকে বলা হয় Red giant star বা লাল দৈত্য তারা (রঙিন ছবি নং ৪)। কয়েক কোটি বছর পর লাল দৈত্য তারার বহিঃভাগের সমস্ত হাইড্রোজেন জ্বালানী নিঃশেষিত হয় এবং আনবিক প্রক্রিয়াও বন্ধ হয়। এই সংকোচনের পরিসমাপ্তি ঘটে যখন তারাটির আয়তন মূল তারাটির আয়তনের (অর্থাৎ সূর্যের বর্তমান আয়তনের) দশ লক্ষ গুণ ক্ষুদ্র হয়ে যায়। এখন এই তারাটিকেই বলা হয় স্বেত বামন তারা বা while Dwarf star (রঙিন ছবি নং ৫)।

একটি বিশেষ আয়তনের পর কি কারণে শ্বেত বামন তারার সংকোচন রোধ হয় এই ব্যাপারটি রহস্যাবৃত ছিল বিজ্ঞানীদের কাছে বেশ কিছু কাল। এর কারণ সংকোচনের ফলে তারাটি ঘণীভূত হয় প্রচণ্ড ভাবে। তারাটির অবশিষ্ট পদার্থের ইলেকট্রন কণা অধিক শক্তিশালী কক্ষে বিচরণ করতে বাধ্য হয়। ফলে একটি বিকর্ষিত বলের সৃষ্টি হয় যা মাধ্যাকর্ষণের আকর্ষণকে প্রতিহত করে। শ্বেত বামন তারা স্থিতিশীলতা লাভ করে।

শ্বেত বামন তারার আয়তনের পরিমাণের একটি লক্ষণ রেখা বর্তমান। যদি এর ভর সূর্যের ভরের থেকে ১.৪ গুন বেশী হয় তবে এই তারা ক্রমে ক্রমে নিউট্রন তারায় (Neutron star)-এ রূপান্তরিত হয়। এই সংক্ষাটি প্রসিদ্ধ জন্মগত ভাবে ভারতীয়, আমেরিকার নাগরিক সুব্রমনিয়াম চন্দ্রশেখরের আবিষ্কার। গণ্ডীটির নামকরণ করা হয়েছে চন্দ্রশেখর লিমিট।

(Neutron Star) নিউট্রন তারা— জয়ন্ত এবার তোমায় ব্রহ্মাণ্ডের পূর্ণাঙ্গ এবং সর্ব্বাধিক মসৃণ মহাকাশীয় গোলকটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব।

প্রায়ই কলকাতার ঘনবসতি নিয়ে আলোচনা হয়। সমালোচনা হয় কলকাতা ক্রমে ক্রমে কংক্রিটের জঙ্গলে পরিণত হচ্ছে এই নিয়ে। অথচ বিজ্ঞানের মতে কলকাতা এখনও ৯৯.৯৯৯৯৯৯৯ ভাগ পদার্থ শূন্য Yes ৯৯.৯৯৯৯৯৯৯ ভাগে কোন রকম পদার্থের অস্তিত্ব শূন্য। Empty space। জয়ন্ত ভাবছ আমার মাথার গণ্ডগোল হয়েছে। আবোল তাবোল বকছি। আমাদের চিফমিনিষ্টার বড় বড় ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট industrialistদের ইন্ড্রাস্ট্রি স্থাপনে জায়গার জন্যে হিমসিম

খাচ্ছেন। আর বিজ্ঞান বলছে অধিকাংশ জায়গাই ফাঁকা? কেবল কলকাতা কেন? সমস্ত বিশ্বের ক্ষেত্রে এই মতবাদ প্রযোজ্য। পদার্থ মাত্র ০.০০০০০০০১ ভাগ। বাকী সব শূন্য জায়গা। Empty space।

জয়ন্ত তুমি হয়ত বলবে, তুমি কেন? অনেকেই বলবেন মানতে পারলাম না এই অবিশ্বাস্য বক্তব্য। এই বক্তব্যের সমর্থনে প্রমাণ কোথায়? যুক্তি কোথায়? উদাহরণ কোথায়? প্রমাণ পরমাণুর গঠনে। যুক্তি পরমাণুর পরিচয়ে। উদাহরণ পরমাণুদের অস্তিত্বে।

গ্রীস দেশের স্বর্ণযুগে সেখানকার বুদ্ধিজীবী মানুষেরা পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশের ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করেছিলেন। কোন সেই ক্ষুদ্রতম অংশ যার সমষ্টিতে সমস্ত পদার্থ গঠিত? অণু, পরমাণুর জ্ঞান গ্রীসিয়ান বুদ্ধিজীবীদের উপলব্ধি ছিল না। ভারতীয় ঋষি মুনিদের ছিল। লিপিবদ্ধ করে গেছেন তাঁরা তাঁদের অভিমত। লিখে গেছেন তাঁরা অণু পদার্থের সেই ক্ষুদ্রতম অংশ যার আর অধিক বিভাজন সম্ভব নয়।

আধুনিক বিজ্ঞানের মতে পরমাণু সমন্বয়ে গঠিত অণু। পরমাণুর মধ্যভাগে অবস্থিত দুই প্রকারের কণা। Neutron আর Proton কণা। এক বা একাধিক Neutron কণা। এক বা একাধিক প্রোটন কণা। এদের বলা হয় Nucleus বা পরমাণুর কেন্দ্রীয় অংশ। আর এই কেন্দ্রীয় অংশটিকে পরিক্রমা করে ইলেকট্রন কণার দ্বারার গঠিত মেঘ, ইলেকট্রন মেঘ (electron cloud)। কেন্দ্রীয় অংশটিতে পরমাণুর ৯৯.৯ শতাংশ ভর বর্তমান। যদি বা এতই ক্ষুদ্র এই কেন্দ্রীয় অংশটি যে পরমাণুর আয়তনের ০.০০০০০০০১। শতাংশ এর আয়তন। ইলেকট্রন ক্লাউডের কক্ষের প্যাটার্নের উপর নির্ভর করে পরমাণুর আয়তন। এই ইলেকট্রনের কক্ষ আনুপাতিক ভাবে কেন্দ্রীয় অংশ হতে বহু দূরে অবস্থিত।

এই কারণে একটি পরমাণুর শূন্য অংশ বা empty space ৯৯.৯৯৯৯৯৯৯ শতাংশ। বাস্তব জীবনে এই শূন্য স্থান দৃষ্টি গোচরও হয় না বা উপলব্ধি করাও যায় না। বুঝলে জয়ন্ত?

ধরো এক খণ্ড সলিড ঘন পাথর। হাত দিয়ে পাথরটিকে স্পর্শ করা হল। পাথরটি কোটি কোটি পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত। হাতটি স্পর্শ করে পাথরটির উপরিভাগ আবর্ত্তিত ইলেকট্রন কণাগুলিকে। সঠিকভাবে উল্লেখ করা হলে বলা উচিৎ হাতের উপরিভাগের ইলেকট্রিনগুলি স্পর্শ করে। স্পর্শ করে লেখাও ভুল কারণ ইলেকট্রন কণা পরস্পরকে স্পর্শ করে না। নেগেটিভ ভাবে চার্জ ইলেকট্রন কণা পরস্পরকে বিকর্ষণ করে। এই অর্থে জগতের কোন কিছুই আর

কিছুকে স্পর্শ করতে পারে না। ব্যতিক্রম নিউট্রন তারা (Neutron star)। নিউট্রন তারায় কণারা পার্শ্ববর্ত্তী কণাদের স্পর্শ করে। নিউট্রন তারা কেবল নিউট্রন কণার সমন্বয়ে গঠিত। ইলেকট্রন এবং প্রোটন কণার অস্তিত্বও অবর্তমান।

চিন্তা করো সল্টলেক স্টেডিয়ামের আয়তনের একটি পাথরের পাহাড়। ধরা যাক, পাহাড়টির চারপাশে কোন ভাবে যদি প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করা হয়। দেখা যাবে এই প্রচণ্ড চাপের ফলে পাহাড়টি প্রথমতঃ দ্বিখণ্ডিত হয়ে অতঃপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভগ্নাংশে রূপান্তরিত হয়। চাপের বৃদ্ধি কারণে পাহাড়টির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ ধুলিকণায় রূপান্তরিত হয়। আরো চাপ বৃদ্ধির ফলে ধুলিকণার পরমাণুর বিভাজন ঘটে। পরমাণুর ইলেকট্রন কথা কক্ষ্যচ্যুত হয়ে কেন্দ্রস্থ প্রোটন কণার সঙ্গে মিলিত হয়। পজিটিভ ভাবে চার্জড প্রোটন কণার এবং নেগেটিভ চার্জড ইলেকট্রন কণার প্রতিক্রিয়ায় উভয় কণার স্বতন্ত্র সত্ত্বার বিলুপ্তি ঘটে। উভয় কণার নিজস্বঃ ইলেকট্রিক চার্জের অবলুপ্তির ফলে উভয়েই রূপান্তরিত হয় নিউট্রন কণায়। নিউট্রন কণা ইলেকট্রিক ভাবে নিউট্রন। কোন প্রকার চার্জের অস্তিত্ববিহীন কণা নিউট্রন কণা। পাহাড়টির ভগ্নাবশেষ নিউট্রন পাহাড়ের আয়তনে হ্রাস ঘটে। একটি বালুকণার আয়তন গ্রহন করে নিউট্রন পাহাড়টি। আয়তন হ্রাসের কারণ পরমাণুর ৯৯.৯৯৯৯৯৯৯ শতাংশ শূন্য অংশের বিলুপ্তি। এই বালুকণা আয়তনের নিউট্রন পাহাড়টির ভর হয় প্রারম্ভিক সল্টলেক স্টেডিয়ামের সাইজের পাথরের পাহাড়টির ভরের সমান। কয়েক হাজার কোটি টন। Yes জয়ন্ত সত্যি সত্যি একটি বালুকণার ওজন কয়েক হাজার কোটি টন। উচ্চ চাপে আয়তনের হ্রাস হয়। ওজনের পরিবর্ত্তন হয় না।

বিশ্বাস কর জয়ন্ত "নিউট্রন তারার একটি বালুকণার ওজন কয়েক হাজার কোটি টন।

বিশ্বাস কর জয়ন্ত "প্রাকৃতিতে এমনই চূড়ান্ত চাপের সৃষ্টি হয়। চন্দ্রশেখর লিমিট (১.৪ গুন সূর্যের আয়তন) এর অধিক আয়তনের তারারা তাদের আয়ুষ্কালের অন্তে সাদা বামন তারায় রূপান্তরিত হয় না। এদের পরিণতি ভিন্ন পথ ধারণ করে। বৃহৎ তারা স্বল্প আয়ু। ক্ষুদ্র তারা দীর্ঘ আয়ু। কারণ বৃহৎ তারার কেন্দ্রস্থলে তারাটিকে জীবিত রাখার জন্যে অনেক অধিক হাইড্রোজেন জ্বালানীর দহনের প্রয়োজন হয়। হাইড্রোজেনের ভাণ্ডার ও নিঃশেষিত হয় ততধিক দ্রুততায়। পারমাণবিক প্রক্রিয়ায় (atomic fusion) হাইড্রোজেন ক্রমে ক্রমে হিলিয়াম, কার্বন, এবং কার্বন ও রূপান্তরিত হয় অজৈব ভারী পদার্থে যেমন কার্বন → নিয়ন → ম্যাগনেসিয়াম → সিলিকন → লোহা → সোনা, রুপো ইত্যাদি।

মাধ্যাকর্ষণের ক্রমবর্দ্ধমান চাপকে প্রতিহত করার জন্য আর কোন জ্বালানী অবশিষ্ট থাকে না। আরম্ভ হয় গুরুভার অজৈব পদার্থের পারমানবিক বিভাজন। মাধ্যাকর্ষণ থেকে হাজার হাজার কোটি গুন বলবান পারমানবিক স্ট্রং ফোরস নতি স্বীকার করে প্রচণ্ড মাধ্যাকর্ষণ সংকোচনের কাছে। পারমানবিক উইক ফোরসের প্রতিরোধ খণ্ডন করে ইলেট্রন কণা সকল মিলিত হয় proton করার সঙ্গে। এই মিলনে সৃষ্টি হয় নিউট্রন কণা। মূল তারাটির পরিসমাপ্তি ঘটে Neutron তারায়। তারাটির সমস্ত পদার্থ রূপান্তরিত হয় নিউট্রন কণায়। পরমাণুর বিভাজনের ফলে পরমাণুর সঙ্কোচন হয়। বিলুপ্ত হয় পরমাণুর ৯৯.৯৯৯৯৯৯৯৯ শূন্য অংশ। সদ্য প্রসূত নিউট্রন তারাটির আয়তন হয় মাতৃতারার হাজার কোটি কোটি গুন ক্ষুদ্র। সাধারণত একটি নিউট্রন তারার আয়তন কেবল ১৫ থেকে ২৫ কি.মি. ব্যাসের একটি গোলক। জীবনান্তে সূর্যের ১০-১৫ গুন বৃহৎ তারার অকল্পনিয় পরিণতি।

সদ্যজাত নিউট্রন তারার নিউট্রন কণা সকলের সংগঠিত হওয়ার ফলে প্রচণ্ড sock wave এর সৃষ্টি হয়। (অকস্মাৎ আয়তনের সংকোচনে বৃদ্ধিতে শক ওয়েভের (Sock wave) উৎপত্তি হয়। শক ওয়েভের খণ্ডনে শব্দের উৎপত্তি ঘটে।) ফলে নিউট্রন তারাটিতে একটি প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হয়। এই বিস্ফোরণকেই বলা হয় বিখ্যাত "সুপার নোভা বিস্ফোরণ"। ক্ষণস্থায়ী এই বিস্ফোরণ। অসাধারণ এর তীব্রতা। একটি সম্পূর্ণ তারামণ্ডলীকে মৃয়মান করতে সক্ষম এই বিস্ফোরণ। বিস্ফোরণে নিউট্রন তারার অবশিষ্ট সব অজৈব গুরুভার পদার্থ সোনা, রুপো, লোহা, ক্যালসিয়াম ইত্যাদি বিচ্ছুরিত হয়।

ক্রমে ক্রমে এই সব পদার্থ মিলে যায় মহাকাশীক গ্যাসের সঙ্গে। অলঙ্কারের সোনা, রুপো এমন কি শরীরে হাড়ের ক্যালসিয়ামের উৎপত্তি সুপারনোভা বিস্ফোরণের কারণে।

নিউট্রন তারায় রুপান্তকরণে মূল তারার ভরের বা ওজনের সামান্যই পরিবর্ত্তন হয়। ফলে নিউট্রন তারার একটি বালুকণার ওজন হয় কয়েক হাজার কোটি টন। একচামচ নিউট্রন তারার অংশ পৃথিবীকে সম্পূর্ণভাবে বিদীর্ণ করতে সক্ষম। ভাবা যায়? (রঙিন ছবি নং ২)।

নিউট্রন তারায় অত্যন্ত প্রখর চৌম্বকিয় ক্ষেত্র বর্তমান (Magnetic field)। চৌম্বকিয় ক্ষেত্রের অভ্যন্তরে ঘুর্ণীয়মান নিউট্রন তারা অকল্পনীয় পরিনামে ইলেকট্রিক ভোলটেজ উৎপন্ন হয়। বলা যায় নিউট্রন তারা বিশ্বের সর্ববৃহৎ ইলেকট্রিক জেনারেটার। বজ্রপাতের ভোল্টেজ থেকে কয়েক হাজার কোটি গুন তীব্র এই ভোলটেজ। ফলে X-রে রশ্মি উৎপন্ন হয়। নিউট্রন তারার প্রচণ্ড

চৌম্বকিয় ক্ষেত্রের ফলে মহাকাশে X-রে রশ্মির বিচ্ছুরণ হয় একটি নির্দিষ্ট দিশায়। পৃথিবী থেকে এই বিচ্ছুরণ দৃষ্ট হয় স্পন্দিত ভাবে। সমুদ্রের তীরবর্তী লাইট হাউসের আলোর মত। স্পন্দনের মাত্রা সেকেণ্ডে কয়েক বার হওয়াও সম্ভব। এই প্রকার বিশেষ স্পন্দিত নিউট্রন তারাকে বলা হয় পালসার তারা। PULSAR।

জয়ন্ত এবার বলি তারাদের তৃতীয় পরিণতি—

ব্ল্যাক হোল (BLACK HOLE)—বিশ্বের যাবতীয় মহাকাশীয় বস্তুর মধ্যে সর্ব্বাধিক রহস্যময়, ভীতিপ্রদ এবং অপরিচিত বস্তু ব্ল্যাক হোল। বিশ্বের কাছে সরাসরি দৃশ্যমান নয় কিন্তু মহাকাশের মঞ্চে এদের উপস্থিতি নিসংশীয় ভাবে প্রমাণিত। প্রমাণিত এদের আচরণে। প্রমাণিত এদের কৃতকর্ম্মে। প্রমাণিত এদের পাশ্ববর্ত্তী মহাকাশীয় বস্তুর ওপর এদের প্রভাবের।

দুই দশক পূর্বেই ইংলিশ জিওলজিস্ট জন মাইকেল প্রচণ্ড মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বিশিষ্ট এক মহাকাশীয় বস্তুর সম্ভাব্য অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনুমান করেছিলেন। যার escape velocity আলোর গতির অধিক। আলোর বহিঃগমনের পথ রুদ্ধ।

১৯১৬ সালে জার্মানীর পদার্থ বিজ্ঞানী কার্ল সওজারচাউল্ড Karl schwarzschild আইনস্টাইনের জেনারেল থিওরী ব্যবহার করে প্রমাণ করেছিলেন প্রচণ্ড মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বিশিষ্ট কোন মহাকাশীয় বস্তু পার্শ্ববর্ত্তীয় আলো আকাশের কাঠামোটিকে সংকুচিত করে বিন্দুতে পরিবর্তীত করতে সক্ষম। এই বিন্দুর নামকরণ করেন Singularity। বাংলায় বলা যায় "অনন্য বিন্দু"।

১৯৬০ সালে বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেন ব্ল্যাক হোলের কেন্দ্রস্থলে singularity অবস্থান।

ব্ল্যাক হোল শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন আমেরিকার বিজ্ঞানী জন হুইলার।

১৯৯৪ সালের পূর্ব্বে ব্ল্যাক হোলের অস্তিত্বের প্রমান করা সম্ভব হয়নি। মহাকাশীয় হ্যাবল টেলিস্কোপ দ্বারা প্রথম প্রমাণিত হয় ব্ল্যাক হোলের অস্তিত্ব। নিসংশীয় ভাবে প্রমাণিত হয় M ৮৭ গ্যালাস্কির কেন্দ্রে সূর্যের ৩০০০ গুণ ভর বিশিষ্ট ব্ল্যাক হোলের অবস্থান। এখন প্রমাণিত হয়েছে বিশ্বের প্রায় সমস্ত তারামণ্ডলীর কেন্দ্রে একটি প্রকাণ্ড ব্ল্যাক হোল অবস্থান করে।

ভর অনুসারে বিশ্বে তিন প্রকার ব্ল্যাক হোলের অস্তিত্ত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়।

১) STELLAR BLACK HOLES —কয়েকশ সূর্যের ভর বিশিষ্ট Black holes।

২) MID SIZE BLACK HOLES মধ্যকৃতি ব্ল্যাক হোল। কয়েক শত হতে

কয়েক হাজার সূর্যের ভর বিশিষ্ট ব্ল্যাক হোল।

৩) SUPER MASSIVE BLACK HOLES গুরুভার বিশিষ্ট ব্ল্যাক হোল।

অনন্য বিন্দু বা Singularityতে তত্ত্বীয় ভাবে পদার্থের অসীম (Infinite) সংকোচন হয়। কারণ মাধ্যাকর্ষণ আকর্ষণ হয় অসীম। আকাশ আর সময়ের সঙ্কোচন হয় অসীম। বলা যায় আকাশ আর সময় বলতে যা বুঝি তার কোন অস্তিত্ব থাকে না। সময়কে পৃথক ভাবে চিন্তা করলে বলা যায় সময়ের গতি স্তব্ধ হয় জয়ন্ত "পুরুরাজের জ্বরাভীত হওয়ার প্রয়োজন হত না। চিরযৌবন লাভ করতে পারতেন ব্ল্যাক হোলের মধ্যে অবস্থানে। অবশ্য দৈব বলে অসীম মাধ্যাকর্ষণকে প্রতিহত করার পর।" আধুনিক প্রযুক্তি বিজ্ঞানে অন্যান্য বলগুলিকে shield করা বা প্রতিহত করা সম্ভব হলেও মাধ্যাকর্ষণ বলকে প্রতিহত করা সম্ভব নয়।

আইনস্টাইনের G T R-এর মতে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত ভর বিশিষ্ট বস্তু পারিপার্শিক সময় ও আকাশের কাঠামোটিকে মোচড় দেয়। লঘুভর বিশিষ্ট বস্তু মানুষ, জন্তু ইত্যাদির অবস্থানের ফলে এই মোচড় অত্যন্ত নগণ্য। সূর্য বা অন্যান্য তারাদের ক্ষেত্রে এই মোচড়টি লক্ষণীয়।

জান জয়ন্ত? ব্রহ্মাণ্ডের সময় আর আকাশের কাঠামোটি বিভিন্ন ভর বিশিষ্ট বস্তুর অবস্থানের ফলে অসমতল। মোচড়ান। এই মোচড়ান আকৃতিকেই আইনস্টাইন বলেছিলেন মাধ্যাকর্ষণ। সময় আর আকাশের কাঠামোর Geometric পরিবর্তনটিকেই বলা হয় মাধ্যাকর্ষণ। মোচড়ান অংশটি আলোর রেখাকে আলোর গতিপথকে বক্র করে। গুরুভর মহাকাশীয় বস্তু, "অধিক মোচড়।" অধিক মাধ্যাকর্ষণ। লঘুভর মহাকাশীয় বস্তু, "কম মোচড়।" কম মাধ্যাকর্ষণ।

সূর্যের ৫ গুনের অধিক আয়তনের তারাদের জীবনান্তে মাধ্যাকর্ষণ সংকোচনের ফলে নিউট্রন তারায় পরিবর্তিত হয়। এই পরিবর্তনের পরিসমাপ্তি ঘটে না নিউট্রন তারায়। নিউট্রন তারার ভর সূর্যের ভরের কয়েক শত গুন অধিক। অথবা কয়েক হাজার গুন অধিক, অথবা কয়েক কোটি গুণ অধিক হওয়াও সম্ভব। নির্ভর করে মূল তারাটির ভরের ওপর।

নিউট্রন তারাও সময় আর আকাশের কাঠামোকে মোচড় দেয়। অনেক বেশী এই মোচড়।

মূল তারাটির পরিসমাপ্তি নিউট্রন তারায় স্তব্ধ হয় না। মাধ্যাকর্ষণ সংকোচন জারী থাকে। এই তীব্র সংকোচন প্রতিহত করার ক্ষমতা কোন কিছুর পক্ষেই অথবা কোন প্রকার পারমানবিক বলের পক্ষেই সম্ভব হয় না। অতঃপর বৃহৎ মূল তারাটি তীব্র সংকোচনের ফলে বিন্দুতে পরিণত হয়। তত্ত্বীয় ভাবে বিন্দুর

ভর অসীম। Infinity। মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অসীম। Infinity। বিশাল তারাটির মাধ্যাকর্ষণ সঙ্কোচনের ক্রমপর্যায়ে পাশ্ববর্ত্তী সময় ও আকাশের কাঠামোটি ক্রমশ ক্রমশ অধিক মোচড়ান আকৃতি ধারণ করে। অতঃপর সময় আর আকাশের কাঠামোটিতে একটি ভাঙ্গন ধরে। একটি গহ্বরের সৃষ্টি হয়।

ব্রহ্মাণ্ডের কয়েক কোটি ব্ল্যাক হোলের মতই জন্ম নেয় আরো একটি ব্ল্যাক হোল।

ব্ল্যাকহোলের মুখের অংশটির আয়তনকে বলা হয় ইভেন্ট হরাইজন (EVENT HORIZON)। বাংলায় বলা যায় ঘটনার লক্ষণ রেখা। বিশ্বের যে কোন পদার্থের ঐ লক্ষণরেখাটিকে অতিক্রম করার অর্থ পদার্থটির ব্ল্যাক হোলের ঐ অনন্ত গহ্বরে বিলীন হয়ে যাওয়া।

আপনি বললেন, ‘‘জান জয়ন্ত বাস্তবে হয়ও তাই। বলা উচিত হচ্ছেও তাই। একটি অতি বৃহৎ ব্ল্যাক হোল (Supermasive black hole) অহরহ গ্রাস করে চলেছে তার পারিপার্শ্বিক তারাদের (রঙিন ছবি ৬ ও ৭ দেখুন)।

ব্লাকহোলের অভ্যন্তরে কি হয় ঐসব তারাদের? এর উত্তর আজ পর্যন্ত মানুষের জ্ঞানের উপরান্তে।

জয়ন্ত, বর্তমান মহাকাশ বিজ্ঞানীদের কাছে যে দুটি মহাকাশীয় ঘটনা রহস্যের বেড়াজালে আবদ্ধ তার একটি হল ব্ল্যাক হোলের অন্তঃপুরের পরিচয়। অপরটি হল বিগ ব্যাঙ বিশ্বের জন্মক্ষণে বিশ্বের পরিচয়। অসীম ক্ষুদ্র পরিসরে অসীম ঘনত্ত্বের পদার্থের কি পরিস্থিতি? জানা নেই বিজ্ঞানীদের এর উত্তর।

ব্ল্যাক হোলের অসীম মাধ্যাকর্ষণ বলের কারণে আলোরও বহিঃমুখী গতি রুদ্ধ। আলোর বাহন কণা ফোটন ঐ বিশাল মাধ্যাকর্ষণের বেড়া টপকে বাইরের জগতে বেরিয়ে আসতে অক্ষম। এই কারণেই ব্ল্যাক হোল ব্ল্যাক। কাল। সরাসরি দেখা যায় না ব্ল্যাক হোল।

জয়ন্ত বোর হচ্ছো না তো? আপনার জিজ্ঞাসা।

না না কি যে বলেন দাদা। ভীষণ ভাবে উপভোগ করছি আপনার কথা। কতদিনের শখ ছিল আপনার কাছে শুনবো বিশ্ব পরিচয়। বলুন দাদা। প্লিজ বলুন।

আপনি খুশি হয়ে বললেন বেশ শোন তবে এই ব্ল্যাক হোলের জন্ম বৃত্তান্ত।

ব্ল্যাকহোলের জন্ম:—

জীবনান্তে আমার সূর্য হতে ৫ গুণ বা তার অধিক বড় তারাদের শেষ পরিণতি ব্ল্যাক হোল।

জয়ন্তের "interruption" দাদা বল বড় তারাদের মরনোত্তর সম্মানীয় পরিণতি?

যা বলেছ বন্ধু। তোমায় একশতে একশ। দেখ ব্ল্যাক হোলের একাধারে যেমন ধ্বংসের কারণ অন্যদিকে তেমনি সৃষ্টির উৎস। মন দিয়ে শোন আমার কথা।

ব্ল্যাক হোলের প্রকারভেদ করা হয়েছে। ভুল বললাম জয়ন্ত বলা উচিৎ আকারভেদ করা হয়েছে।

১। সূর্যের ভরের ৫ গুণ বা তার অধিকতর বিশিষ্ট তারাদের জীবনান্তে যে ব্ল্যাকহোলের জন্ম হয়, তাকে বলা হয় STLLAR BLACK HOLE বা নক্ষত্রীয় (সঠিক বাংলা হল কি?) ব্ল্যাক হোল।

২) সূর্য হতে ২০০ থেকে ১০০০ গুণ ভরের তারাদের জীবন দশার শেষ পরিণতি যে ব্ল্যাক হোলের জন্ম হয়, তাদের বলা হয় MID SIZE ব্ল্যাক হোল। বাংলায় বলা যায় কি মধ্যাকৃতি ব্ল্যাক হোল?

৩) জয়ন্ত শেষে বলি "আরো এক প্রকার বিশাল ব্ল্যাক হোলের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গেছে আমাদের ব্রহ্মাণ্ডে। নামকরণ করা হয়েছে সুপার ম্যাসিভ ব্ল্যাক হোল (Sups massive black hole)। অসীম ভরের ব্ল্যাক হোল।

এই অসীম ভরের ব্ল্যাক হোলের ভর সূর্যের ভরের ১০০০ গুণ হতে ১ কোটি গুণ অধিক।

আপনি বললেন "জয়ন্ত শুনলে তুমি হয়ত অবাক হবে যে এখন প্রমাণিত হয়েছে প্রায় প্রতিটি নক্ষত্রমণ্ডলীর কেন্দ্রে একটি সুপার ম্যাসিভ ব্ল্যাক হোল অবস্থান করে। আমাদের মিল্কিওয়ে নক্ষত্রমণ্ডলীর কেন্দ্রেও এমনই একটি অসীম ভরের ব্ল্যাক হোল বিরাজ করছেন। যদিও বেশ কয়েক লক্ষ বছর যাবৎ ওটি আছে সুপ্ত অবস্থায়।

জয়ন্তর প্রশ্ন "দাদা সুপ্ত অবস্থায়? ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না"।

আপনার উত্তর "ঐ বিশাল ব্ল্যাক হোলগুলির রাক্ষুসে ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্যে ভোজ্য হিসাবে প্রয়োজন কমপক্ষে ১০টি সূর্যের প্রতি বছর। সব সময় এ পরিমাণ মহাকালীন বস্তু অবস্থান করে না ঐ দৈত্য ব্ল্যাকহোলের মাধ্যাকর্ষণ গণ্ডির অভ্যন্তরে।" এই সময় দৈত্য ব্ল্যাকহোলগুলি থাকে সুপ্ত অবস্থায়। যখন পুনরায় পর্যাপ্ত সংখ্যায় মহাকাশীয় বস্তুর উপস্থিতি হয় দৈত্য ব্ল্যাকহোলটির মাধ্যাকর্ষণের গণ্ডির অভ্যন্তরে। জেগে ওঠে ব্ল্যাক হোলটি। আরম্ভ হয় ধ্বংসের ভয়ঙ্কর তাণ্ড।

কোন কোন নক্ষত্রমণ্ডলীর কেন্দ্রে অবস্থান করে একটি নয়। জয়ন্ত দু দুটি

সুপার ম্যাসিভ ব্ল্যাক হোল। পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ঘটে যায় বিশাল সংঘর্ষ। সংঘর্ষের ফলে প্রলয়ের কথা চিন্তা করলেও শিহরিত হতে হয় জয়ন্ত।

NGC 6240 এমনই একটি নক্ষত্রমণ্ডলী। ৩০০০ আলোক বর্ষ দুরে অবস্থিত। এর কেন্দ্রে দুটি সুপার ম্যাসিভ ব্ল্যাক হেল সংঘর্ষের পথে ধাবিত।

এই দৈত্য ব্ল্যাক হোলের জন্ম হয় যখন

(১) দুটি MID SIZE BLACK HOLE মধ্যাকৃতি ব্ল্যাকহোলের মিলন হয়।

(২) মধ্যাকৃতি ব্ল্যাকহোল ক্রমাগত পারিপার্শ্বিক তারাদের গ্রাস করার ফলে এর আয়তন বৃদ্ধি পায়। ক্রমে ক্রমে একটি অতি বৃহৎ ব্ল্যাক হোলে পরিণত হয়।

(৩) ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির প্রথম অবস্থায় মহাকাশীয় গ্যাসিও পদার্থের মাধ্যাকর্ষণ সঙ্কোচনের ফলে অতি বৃহৎ ব্ল্যাক হোলের জন্ম হয়।

জয়ন্ত কোয়াসারের নাম শুনেছ কি?

QUASAR:- (QUASI STELLER RADIO SOURCE) ব্লাক হোলের বিবরণে কোয়াসারের নাম অনুল্লোখিত থাকল বিবরণটি অসম্পূর্ণ থেকে যায়। কোয়াসার এক অসীম ভর বিশিষ্ট বিশাল আয়তনের মহাকাশীয় বস্তু। (অবস্থান করত ব্রহ্মাণ্ডের শৈশব অবস্থায় অর্থাৎ প্রথম জীবনে)

ব্রহ্মাণ্ডের বাল্য অবস্থায় অতিবৃহৎ ব্ল্যাক হোলের জন্মের পর ব্ল্যাক হোলের অসীম মাধ্যাকর্ষণের আকর্যণে পারিপার্শ্বিক মহাকাশীয় গ্যাসিয় পদার্থ বৃত্তাকারে আবর্তন করতে থাকে ব্ল্যাক হোলটিকে। এই গ্যাসিয় পদার্থের কণাদের পারস্পারিক ঘর্ষণের ফলে অত্যন্ত উচ্চ চাপের সৃষ্টি হয়। এই প্রচণ্ড উত্তাপের ফলে বিভিন্ন প্রকার ইলেকট্রোম্যাগনেটিভ ওয়েভ যেমন Radio wave রেডিয়ো ওয়েভ X রে ওয়েভ আল্ট্রা ভায়োলেন্ট, ইনফ্রা রে এবং গামা রেতেও বিচ্ছুরণ হতে থাকে সর্ব্বক্ষণ। ফলে কোয়াসারটি মহাকাশে অন্যতম উজ্জ্বল পদার্থ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। কোয়াসারের উজ্জ্বল্য একটি সম্পূর্ণ তারামণ্ডলীর উজ্জ্বলও অধিক হওয়া সম্ভব। এই উজ্জ্বল্য বজায় রাখার জন্যে একটি অতি বৃহৎ ব্ল্যাকহোলের কম পক্ষে বছরে ১০টি সূর্যের ভরের সমান পদার্থের ভক্ষণের প্রয়োজন। ভাবতে পার জয়ন্ত কি দানবীয় ক্ষুধা কোয়াসারের? বছর দশটি সূর্য। সময়ে সময়ে কোয়াসার দর্শিত হয় না। কারণ এর উজ্জ্বলতা হ্রাস পায়। অনুমান করা হয় ব্ল্যাকহোলের পারিপার্শ্বে ভক্ষন করার মত গ্যাসিও পদার্থের অনুপস্থিতি। এই সময় কোয়াসার অদৃশ্য। পুনরায় যখন গ্যাসিও পদার্থ প্রবেশ করে ব্ল্যাক হালের মাধ্যকর্ষণ ক্ষেত্রের মধ্যে আরম্ভ হয় ভক্ষণ। আরম্ভ হয় গ্যাসিও কণাদের ঘর্ষণ, ফলে উত্তাপ, ফলে আলোর বিকিরণ। কোয়াসারে

পুনরায় দর্শন। এই ভাবে বহু কোয়াসার কখনও অদৃশ্য কখনও দর্শিত।

হ্যাবল এবং অন্যান্য মহাকাশীয় দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে যে সবারই বয়স ১ হাজার কোটি বছরের অধিক। এর কারণ ১০০০ কোটি বছর ধরে অতি বৃহৎ ব্ল্যাক হোলের খাদ্যে (গ্যাসিও পদার্থ) অনটন। এই অনটনের ফলে কোয়াসার রূপান্তরিত হয় একটি সাধারণ তারামণ্ডলীতে। জন্মে নেয় একটি গ্যালাক্সি। এই তারামণ্ডলীর কেন্দ্রে অবস্থান করে ঐ অতি বৃহৎ ব্ল্যাকহোলটি। সদা ঘূর্ণীয়মান।

অনুমান করা হয় ব্রহ্মাণ্ডের ১০০ হাজার কোটি তারামণ্ডলীর অধিকাংশ জন্ম কোয়াসার মাধ্যমে। আমাদের মিল্কি ওয়ে তারা মণ্ডলীটির জন্মও অনুরূপ ভাবে।

জয়ন্ত আজকের আলোচনার এবার শেষ বিষয়।

ব্ল্যাক হোল রেডিয়েশন:— ব্ল্যাকহোল তার অভ্যন্তর থেকে সমস্ত কিছুর বহিঃগমনের পথ রুদ্ধ করে। ইংল্যাণ্ডের প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিন্স্ এবং বেকেনস্টাইন ১৯৭৫ সালে প্রমাণ করেন এই বক্তব্য সম্পূর্ণ ভাবে সত্য নয়। পারটিকেল ফিজিক্সের মতে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে সর্ব্বক্ষণ একটি (Virtual) ভাবচুয়াল (প্রকৃত কণার অনুরূপ অপ্রকৃত কণা) পারটিক্যাল অপর আর একটি ভাবচুয়াল পারটিক্যালের সংঘর্ষ হয়। ফলে উভয় পারটিক্যালেরই বিলুপ্তি হয়। বিলুপ্তি হয় তাৎক্ষণিক ভাবে।

স্টিফেন হক্‌িনস্ এবং বেকেনস্টাইন প্রমাণিত করেছেন সেই এই সংঘর্ষটি যদি ব্ল্যাকহোলের event horizon এর অভ্যন্তরে সংগঠিত হয় তখন দুটি প্যারটিক্যাল বিলুপ্ত হয় না। একটি ভাবচুয়াল পারটিক্যালকে ব্ল্যাক হোলটি ভক্ষণ করে। অপর ভাবচুয়াল প্যারটিক্যালটি প্রকৃত পারটিক্যাল ভাবে বিশ্বের আকাশ ও সময়ের কাঠামোটিতে নিক্ষিপ্ত হয় রেডিয়েশন হিসেবে। এই রেডিয়েশন স্পন্দিত রেডিয়েশন। অবিচ্ছিন্ন রেডিয়েশন নয়। রেডিয়েশনের ফলে ব্ল্যাক হোলের ভরের হ্রাস হয়। ধীরে ধীরে ক্রমান্বয়ে হ্রাস হয় ব্ল্যাক হোলের ভর।

হাজার হাজার কোটি বছর ধরে ক্রমান্বয়ে ভরে হ্রাসপ্রাপ্তি হওয়ার কারণে ব্ল্যাকহোলের জীবনদশার পরিসমাপ্তি হয়। ব্ল্যাক হোল চিরবিদায় নেয় ব্রহ্মাণ্ডের মানচিত্র থেকে। অবশিষ্ট থাকে প্রচুর পরিমাণে রেডিয়েশনের কারণে উদ্ভূত পারটিক্যাল।

কসমোলজিস্টদের অনুমান বিশ্ব জীবনের শেষ অধ্যায় হবে ব্ল্যাক হোলের রাজ্য। বিশ্বের সবকিছুই গ্রাস করবে হাজার হাজার ব্ল্যাক হোল। বিশ্বের আঙ্গিনায়

বিচরণ করে বাড়াবে কেবল মাত্র হাজার হাজার ব্ল্যাক হোল। কয়েক হাজার কোটি বছর পর হকিংস রেডিয়েশনের ফলে ব্ল্যাক হোলদের ও অবলুপ্তি হবে। সঙ্গে সঙ্গে অবলুপ্তি ঘটবে আমাদের বিশ্বের। বিশ্ব বলে আর কোন কিছুর অস্তিত্বও থাকবে না। কত বছর পর শেষ হবে বিশ্বজীবন? অনেক বছর পর। ১এর পর একশ শূন্যতে।

উঠে দাঁড়িয়ে বললেন "চল এবার ওঠা যাক অনেক বেলা হল। আশাকরি ব্ল্যাকহোলের সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করতে পেরেছ। জয়ন্ত ধর্ম্মে যেমন বলে সব কথার শেষ কথা কৃষ্ণ কথা, সেই রকম আমরাও কি বলতে পারি না যে সব গহ্বরের শেষ গহ্বর কৃষ্ণ গহ্বর?

একশ বার পারি দাদা। যেমন এও বলতে পারি সব বামনের শেষ বামন শ্বেত বামন তারা। তাবৎ নিউট্রনের শেষ নিউট্রন তারা। দারুণ কাটলো সকালটা। লক্ষ বার ধন্যবাদ আপনাকে।

আপনি বললেন আজকে বিশাল বিশাল মহাকাশীয় বস্তুর আলোচনা পর কলকাতায় ফিরে একদিন বলব বিশ্বের ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম কণিকাদের কথা। বলব কোয়ানটাম জগতের কথা। অতি বিচিত্র সেই জগতের কথা। বাস্তবের ঘেরা টোপে অবাস্তবের কথা। কোন কিছুই নির্দিষ্ট নয় যেখানে, সব কিছুই অনির্দিষ্ট জগতের কথা। সম্ভাব্য তথা প্রবাবিলিটির রাজ্যের কথা। কোয়ানটাম বিশ্বের অধিবাসী হলে বলতাম।

হয়ত কলকাতায় ফিরে, হয়ত একদিন, হয়ত বলব, বিশ্বের হয়ত ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম কণিকাদের কথা।

বিস্ফারিত চোখে জয়ন্তের জবাব। আজকের আলোচনা জন্যে নিদৃষ্ট ধন্যবাদ দাদা। নির্দিষ্ট বেলা হল। নিদৃষ্ট ক্ষিদে পেয়েছে। নির্দিষ্ট lunch খাওয়ার জন্যে চলুন নির্দিষ্ট ভাবে যাওয়া যাক নির্দিষ্ট খাবার ঘরের দিকে।

ছবি নং ১
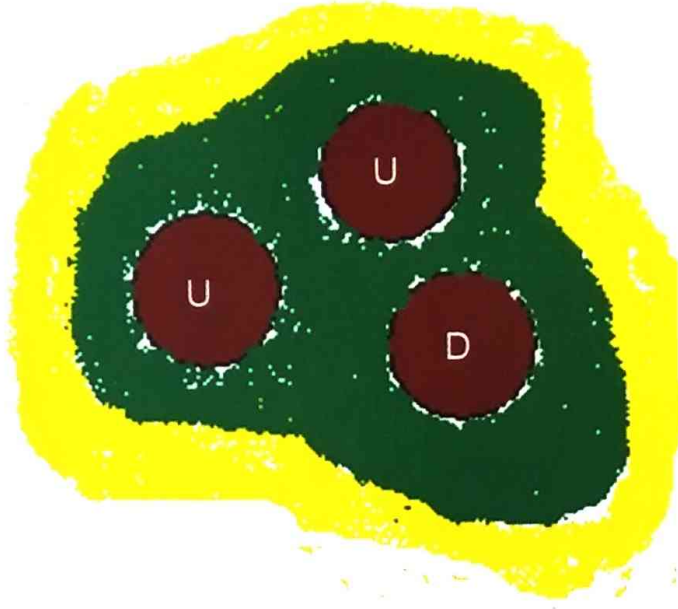
উইক নিউক্লিয়ার ফোর্স

প্রোটন কণার অভ্যন্তরে (২টি আপ এবং একটি ডাউনকণা দ্বারা গঠিত প্রোটন কণা) কালার ফোর্স ফিল্ড।

ছ
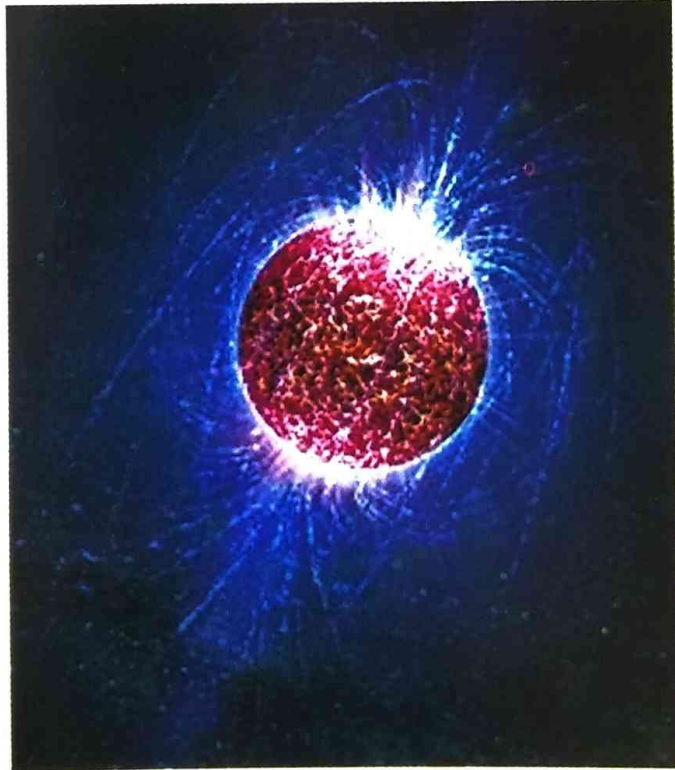
নিউট্রন স্টার

শিল্পীর তুলিতে প্রখর চুম্বকীয় ক্ষেত্র সহ।

ছবি নং ৩
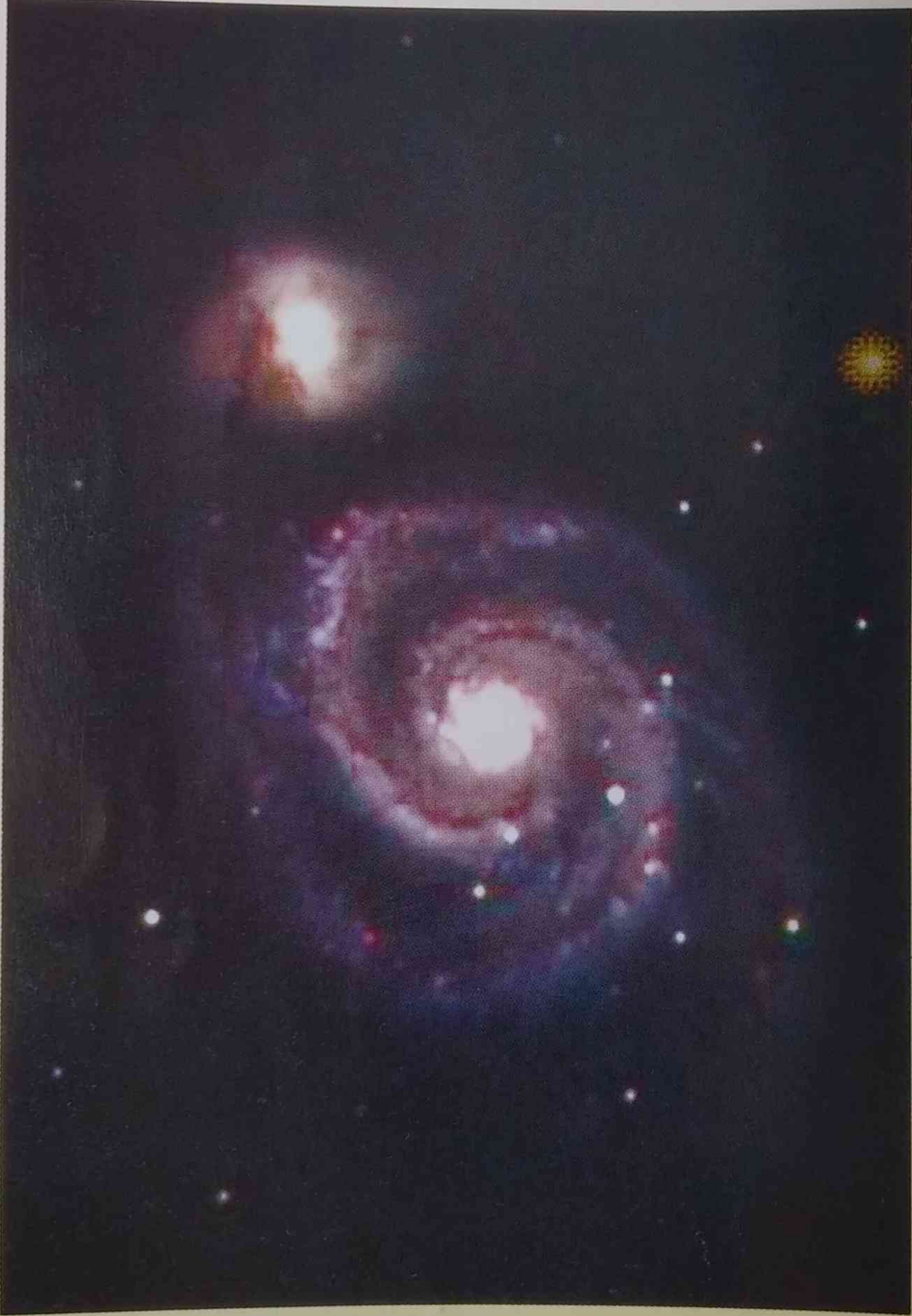
M-51, গ্যালাক্সি (*Whirpool galaxy*) দূরত্ব ৩ কোটি আলোকবর্ষ।
সঙ্গে একটি সাথী গ্যালাক্সি।

খয়েরি লাইনগুলি মূলতঃ হাইড্রোজেন গ্যাস এবং ধুলো। লাল অংশগুলি নতুন তারার জন্মস্থান হাজার কোটি সংখ্যায়। নীল অংশে নবীন তারাদের অবস্থান। কেন্দ্রে মূলত বৃদ্ধ তারাদের অবস্থান, কেন্দ্রে অবস্থিত বিশাল ব্ল্যাক হোলের অতল গহ্বরে নিশ্চিহ্ন হওয়ার মুখে।
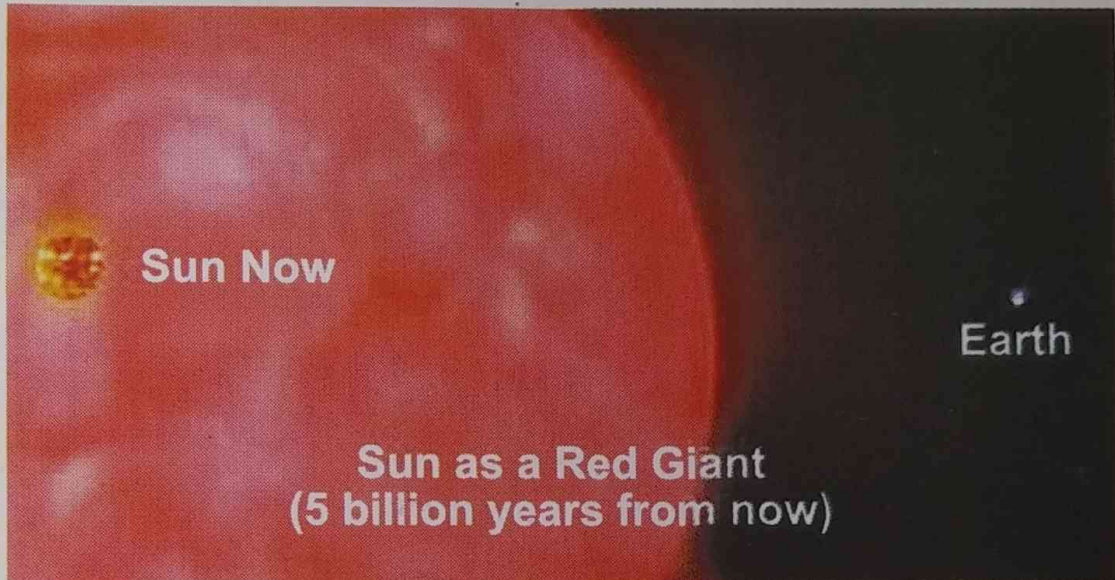
সূর্য ও লাল দৈত্য তারা

Sun and White Dwarf Star

ছবি নং ৬

ছবি নং ৭
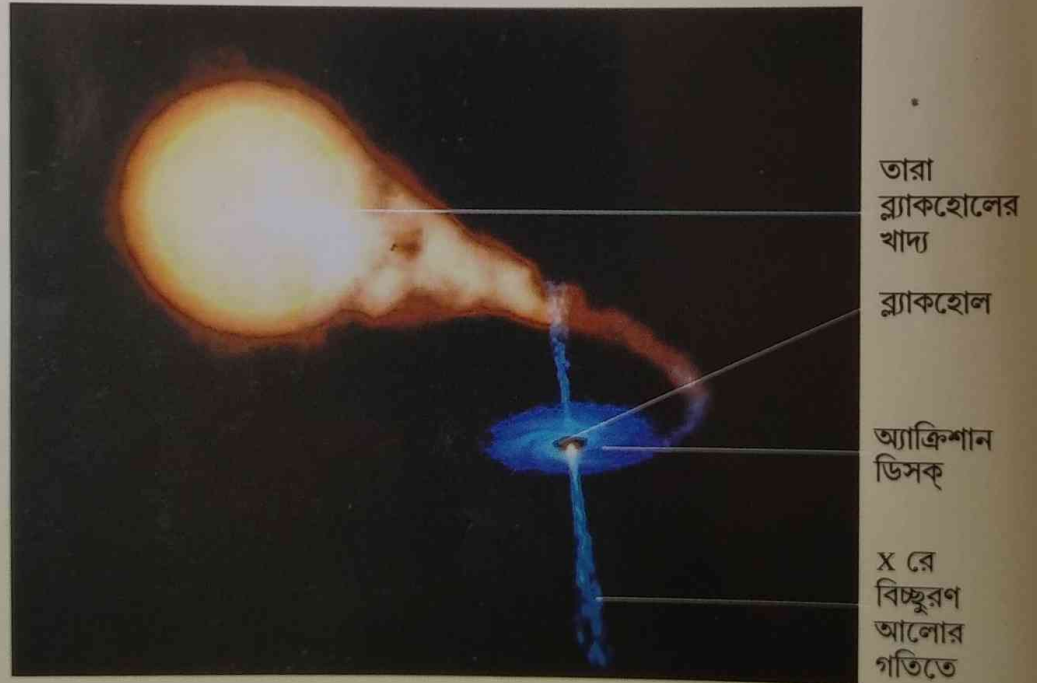
ব্ল্যাকহোলের অসীম মাধ্যাকর্ষণের ফলে আবর্তিত তারাটি ক্রমে ক্রমে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়। বিচূর্ণ অংশগুলি চাকতির আকারে ব্ল্যাকহোলকে প্রদক্ষিণ করে। চাকতিটির নাম অ্যাক্রিশান *(Accretion)* ডিসক্। ব্ল্যাকহোলের অন্তরভাগকে ক্রমে ক্রমে গ্রাস করে ব্ল্যাকহোল। অ্যাক্রিশান ডিসক্রে অভ্যন্তরে চূর্ণ-বিচূর্ণ ভগ্নাংশগুলির ঘর্ষণের ফলে প্রচণ্ড উত্তাপে X রে রশ্মি আলোর গতিতে ব্ল্যাকহোলের দু'দিক থেকে জেটের আকারে বিচ্ছুরিত হয়। এইভাবে একটি ব্ল্যাকহোল একের পর এক তারাকে গ্রাস করে চিরতরে অবলুপ্তি করে আমাদের বিশ্ব হতে।

ছবি নং ৮
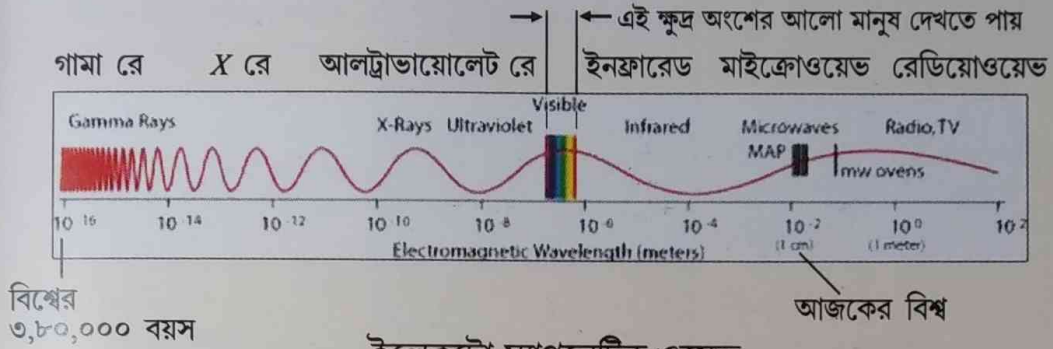
ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ওয়েভ

কৃত্রিম উপগ্রহ দ্বারা গৃহীত ছবি

পৃথিবীর ভিন্ন স্থানের তাপমাত্রার তারতম্য। এক দৃষ্টিতে ভিন্ন স্থানের একটি চিত্র পাওয়া যায়।

ছবি নং
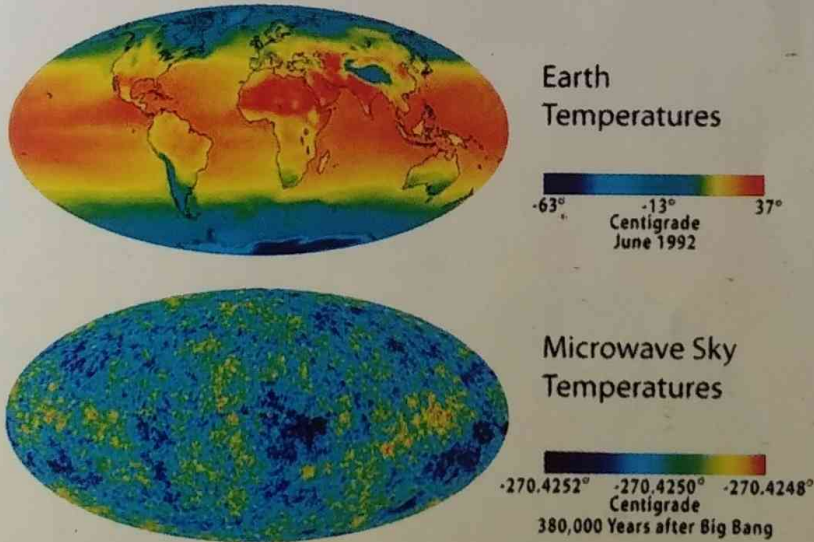
পৃথিবীকে প্রদক্ষিণরত WMAP উপগ্রহ দ্বারা গৃহীত ছবি। বিশ্বের মহাকাশের দিগন্তে সমরূপে বিস্তৃত কসমিক মাইক্রোওয়েভ ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশনের (CMB) চিত্র। বিশ্বের বয়স যখন মাত্র ৩,৮০,০০০ বছর মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গের যাত্রা আরম্ভ। লক্ষ্য করার বিষয় বিশ্বময় মহাকাশের তাপমাত্রা প্রায় সমান।

ছবি নং ১০

'মহাকাশের ছবি'

বিশ্বের বয়স ৩,৮০,০০০ বছর। অণু, পরমাণুর উৎপত্তি। আলোর পথচলা আরম্ভ। রঙের তারতম্য তাপমাত্রার সামান্য তারতম্যে।

গ্যাসীয় পদার্থের ঘনীভূত অবস্থা। মাধ্যাকর্ষণের কারণে ঘনত্বের তারতম্য।

বয়স ৫ লক্ষ থেকে ১৫ কোটি বছর।

প্রথম নক্ষত্রের জন্ম।

বয়স ২০ কোটি বছর।

ক্রমে ক্রমে বিশ্ব শীতল হয়। জন্ম হয় অসংখ্য নতুন তারা-তারামণ্ডলী।

বয়স ১২০ কোটি বছর।

আজকের বিশ্ব, বয়স ১৩৭০ কোটি বছর।

ছবি নং ১১
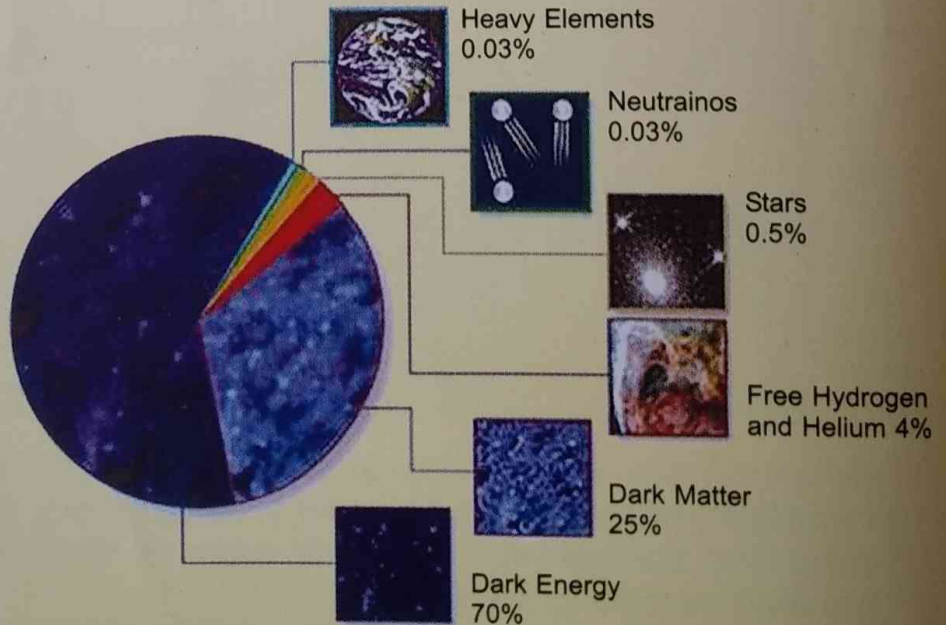
অন্ধকার বস্তু *(Dark Matter)* অন্ধকার শক্তি *(Dark Energy)*
ব্রহ্মাণ্ডের পদার্থ তালিকা।

ছবি নং ১২

স্পেকট্রোগ্রাফি

ছবি নং ১৩

স্টিং ও ব্রেন

ছবি নং ১৪

COLLISION BETWEEN "TWO BRANE PARALLEL UNIVERSE"
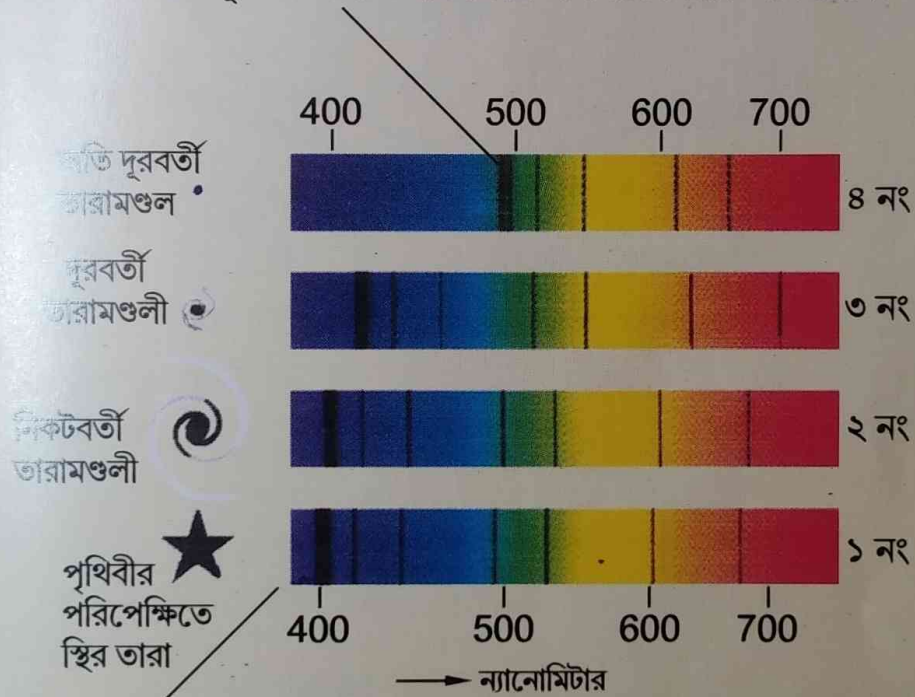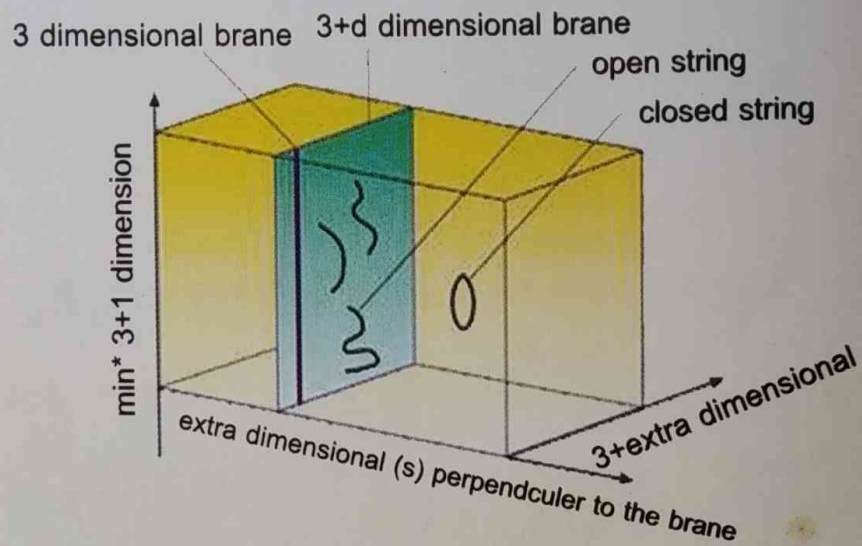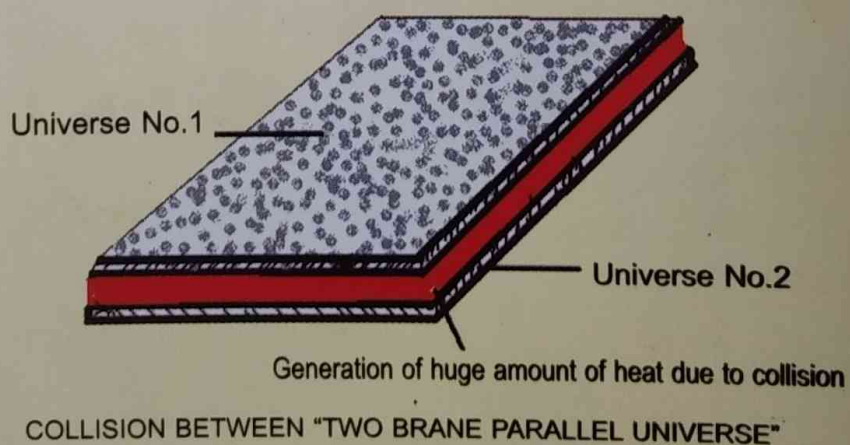
দুটি ব্রেন বিশ্বের সংঘর্ষ

অষ্টম অধ্যায়

বিচিত্র কোয়ানটাম জগৎ

কলকাতায় ফিরে আসার কয়েক মাস পর এক সন্ধেবেলায় "শুভ সন্ধ্যা দাদা। আশাকরি সব কুশল।" কথামত জয়ন্তর আগমন।

আপনার সম্ভাষন "সু স্বাগতম বন্ধু। তবে আজকের সু-টা মহাপুরুষের স্মরণে।"

আমাদের জাতির জনকের কথা সামান্য পরিবর্তন করে যদি বলতে অনুমতি দাও তবে বলি :—

"নিত্য জীবনের দৈনতা, দৈনতা নয়।
নিত্য জীবনের সমৃদ্ধি, সমৃদ্ধি নয়।

মহাপুরুষের উপদেশ বিস্মৃত হওয়াই হল আসল দৈনতা। মহাপুরুষের উপদেশ পালন করাই আসল সমৃদ্ধি।"

(N.B. মহাত্মা গান্ধীর কথা— "Misery, so called is no misery, neither riches, so called is riches. Forgetting (or denying) God is true misery. Remembering (or faith in) God is true riches.

জয়ন্ত এই বুদ্ধপূর্ণিমার সন্ধ্যায় ভাবছিলাম, বুদ্ধদেবের জীবনটাই তো সব থেকে বড় উপদেশ।

মহামানুষকে প্রণাম জানিয়ে চল আজকের আলোচনা আরম্ভ করা যাক।

আজ আমরা অণু, পরমাণু এবং আরো বিবিধ ক্ষুদ্র কণাদের রাজ্যে বিচরণ করব।

জয়ন্ত বাধা দিয়ে বলল, "বাধা দিলাম বলে কিছু মনে করবেন না দাদা। দুটো প্রশ্ন ছিল আমার।

জানি যে একাধিক পরমাণু গঠন করে বিভিন্ন অনু। যেমন দুটি হাইড্রোজেন এবং একটি অক্সিজেন পরমাণু সম্মিলিতভাবে গঠন করে জলের একটি অণু। কিন্তু ক্ষুদ্র কণা ব্যাপারটা? বুঝলাম না দাদা।

আমার দ্বিতীয় প্রশ্নটি হল ক্ষুদ্র জগত বলতে কত ক্ষুদ্র? একটা ধারণা যদি দেন।

আপনি বললেন ভালই প্রশ্ন করেছ জয়ন্ত। জলের পারমাণবিক গঠনের উদাহরণটিও উৎকৃষ্ট উদাহরণ। জলের আর এক নাম?

জীবন। মৃদু হাসিতে জয়ন্তের উত্তর। ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জীবনের গঠনের মূলে কার্বন পরমাণু। আর জীবনের উৎসের মূলে জল।

জলের একটি ফোঁটাকে ক্ষুদ্র, তস্য ক্ষুদ্র, তস্য তস্য ক্ষুদ্র, তস্য তস্য তস্য ক্ষুদ্র, এইভাবে বিভাজন করতেই থাকলে তুমি জলের অনুতে উপনিত হবে। অনুকে বিভাজন করলে পরমাণুতে উপনিত হবে। একাধিক পরমাণু গঠন করে একটি অণু। যেমন দুটি হাইড্রোজেন এবং একটি অক্সিজেন পরমাণু গঠন করে একটি জলের অণু।

জয়ন্ত তোমার হয়ত প্রশ্ন থাকতে পারে কত ক্ষুদ্র এই সব অণু, পরমাণু। একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর ব্যাস ৫×১০^{-৮} মিমি. অর্থাৎ ০.০০০০০০০৫ মি.মি.। "." এই ১ মি.মি. ব্যাসের বিন্দুটিতে ২ কোটি হাইড্রোজেন পরমাণুর অবস্থান সম্ভব। সাধারণ অণুবিক্ষণ যন্ত্রে এই পরমাণু দেখা সম্ভব নয়। স্ক্যানিং টানেলিং মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে পরমাণু দেখা যায়। এই অণুবিক্ষণ যন্ত্রে কোয়ানটাম মেকানিক্স এরই একটি সূত্র. Tunnelling of a particle কে ব্যবহার করা হয়।

জয়ন্ত তিনপ্রকার ক্ষুদ্র কণা একটি পরমাণু গঠন করে। পরমাণুর কেন্দ্রে প্রোটন। এক বা একাধিক পজেটিভ ভাবে চার্জ কণা প্রোটন। প্রোটনের সঙ্গে সহ অবস্থান করে চার্জহীন কণা নিউট্রন। (অবশ্য কোন কোন পরমাণুতে নিউট্রনের অণুপস্থিতি সম্ভব। যেমন হাইড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রে কেবল একটি প্রোটন কণা অবস্থান করে)। আর এই কেন্দ্রের বহুদূরে অবস্থান করে নেগেটিভ ভাবে চার্জ, কেন্দ্রটিকে আবর্তিত ক্ষুদ্র কণা ইলেকট্রন।

একটি পরমাণু ইলেকট্রন কণা এবং প্রোটন কণার সংখ্যা সমান। প্রোটন কণার পজেটিভ চার্জ সমসংখ্যক ইলেকট্রন কণার নেগেটিভ চার্জ পরমাণুকে রাখে চার্জ শূন্য অবস্থায়।

একটি পরমাণুর ৯৯.৯ শতাংশ ভর বহন করে কেন্দ্রস্থিত প্রোটন এবং নিউট্রন কণা। পরমাণুর কেন্দ্রকে বা হয় নিউক্লিয়াস। প্রোটন এবং নিউট্রনের ভর প্রায় সমান। নিউট্রনের ভর সামান্য অধিক।

একটি প্রোটনের ভর ১.৬৭২৬×১০^{-২৭} কেজি

একটি নিউট্রনের ভর ১.৬৭৪৯×১০^{-২৭} কেজি

একটি ইলেকট্রনের ভর $০.০০০৯৩৪৫৬৮৯১\times১০^{-২৭}$ কেজি একটি ইলেকট্রন কণার আয়তন প্রায় শূন্য। ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম বিন্দু সম এর আকার।

একটি পরমাণুর ৯৯.৯৯৯ শতাংশ শূন্য। কতটা শূন্য তোমায় একটা উদাহরণ দিয়ে বলি জয়ন্ত।

ধর আমাদের সল্টলেকের স্টেডিয়ামটি একটি পরমাণু। পরমাণুর কেন্দ্রের (Nucleus) (যেখানে প্রোটন আর নিউট্রন কণার সহঅবস্থান) আয়তন একটি আঙুর ফলের দানার সমান। আর স্টেডিয়ামের পরিধিতে প্রদক্ষিণরত ইলেকট্রন কণা। রচনা করে ইলেকট্রন মেঘ।

জয়ন্তের প্রশ্ন "দাদা ইলেকট্রন মেঘ?"

আপনার উত্তর "ঠিক তায় জয়ন্ত" নিউক্লিয়াসের চারদিকে প্রদক্ষিণরত ইলেকট্রন কণা ভিন্ন ভিন্ন স্তরে ইলেকট্রন মেঘ রচনা করে।

এই ভিন্ন ভিন্ন স্তরগুলি অনেকটা একটি পেঁয়াজের একটির অভ্যন্তরে অপর একটি খোলের অবস্থানের মত। ইলেকট্রন কণাগুলির অন্তঃনিহিত শক্তির মান অণুযায়ী নির্দিষ্ট সংখ্যায় অবস্থান করে ভিন্ন ভিন্ন স্তরে সজ্জিত ইলেকট্রন মেঘে অভ্যন্তরে। কোয়ান্টাম মেকানিক্স-এর সূত্র এই মতবাদই ব্যাক্ত করে। ইলেকট্রন মেঘের এক একটি খোলকে বলা হয় অরবিটাল (orbital).

জান জয়ন্ত ১৯২০ সালের নিকটবর্তী বছরগুলিতে বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেন পরমাণু এবং আরো বিভিন্ন ক্ষুদ্রকণাদের গতিবিধি, চালচলন, মতিগতি নির্ধারণে নিউটনের এমনকি মহামান্য আইনস্টাইনের সূত্রগুলিও অক্ষম। তৎকালীন বিজ্ঞানের কোন সূত্রই এই ব্যাপারে সম্পূর্ণভাবে অপ্রয়োজন। বিজ্ঞানীরা উপলব্ধি করেন প্রয়োজন এক গুচ্ছ নতুন সূত্র। কয়েক বছরের মধ্যেই বিজ্ঞানীদের নিবিড় তপস্যায় আর অসীম অধ্যবসায়ে আবিষ্কৃত হয় একগুচ্ছ সম্পূর্ণ নতুন সূত্র। মানুষের জ্ঞানের আকাশে উদয় হয় একগুচ্ছ উজ্জ্বল তারা। জন্ম নেয় কোয়ান্টাম মেকানিক্স।

বলা যায় ১৯২০ সালে জার্মানির তথা পৃথিবী বিখ্যাত বিজ্ঞানী ম্যাক্স প্লাঙ্ক কোয়ান্টাম মেকানিক্সের প্রথম সূত্রপাত করেন। অনন্ত বিশ্বের ক্ষুদ্রতম অংশের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্যে তিনিই প্রথম পদক্ষেপটি নিয়েছিলেন। বলেছিলেন একটি ক্ষুদ্র কণার অন্তঃনিহিত শক্তি মান (E) নির্ভর করে কণাটির স্পন্দনের ওপর (W) frequency-র ওপর। অত্যন্ত একটি সরল সূত্রের দ্বারা E=hw (h=প্লাঙ্ক কনস্ট্যান্ট=৬.৬২৬×১০$^{-৩৪}$) শক্তি এবং স্পন্দনের সম্পর্কটি নির্ধারণ করেছিলেন।

দেখ জয়ন্ত ক্লাসিকাল ফিজিক্সের সূত্রগুলি মূলত একক বিজ্ঞানীর প্রচেষ্টার ফল। কোপারনিকাস, গ্যালেলিও, আর্কিমেডিস, কেপলার, ফ্যারাডে, ম্যাক্সওয়েল, এভোগ্রাডো, রারপেউলি, নিউটন, আইনস্টাইন। মনুষ্য সমাজকে এইসব

বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানীদের দান মূলত প্রকট সাধনায় উপলব্ধ জ্ঞান।

তুমি তো জান জয়ন্ত আমার প্লে এন্ড পাস টাইম হল কসমোলজি। স্বভাবতই কসমোলজি সংক্রান্ত বিজ্ঞানীদের নামই প্রথম মনে আসে।

অপরদিনে কোয়ান্টাম মেকানিকস ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞানীদের পৃথক পৃথক আবিষ্কারের একটি সম্মিলিত উপলব্ধি যেমন :

১৯২৫ সাল। অস্ট্রিয়ার উলফ্‌গ্যাঙ্গ পোউলী (wolgang pauli) বল্লেন দুটি সম্পূর্ণভাবে সদৃশ ইলেকট্রন কণার পক্ষে একই অরবিট্যালে বসবাস করা সম্ভব নয়। এই আবিষ্কারটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। অণুর গঠনের কারণ ব্যাখ্যা করে। এ ছাড়া শ্বেত বামন তারা আর নিউট্রন তারার স্থিতিশীলতার ব্যাপারটিও পউলি Exclusion প্রিনসিপ্যাল সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করে। এই বক্তব্য অন্যান্য ফারমিওন্‌স কণাদের পক্ষেও প্রযোজ্য।

সঙ্গে সঙ্গে জয়ন্তর প্রশ্ন, ‘‘দাদা ফারমিওনস্‌ কণা?’’ আপনার উত্তর ‘‘জয়ন্ত সবুরে মেওয়া ফলে। সামান্য সবুর কর। পরে বলছি।’’

‘‘জি হজুর। আপ কি মহরবাণী।’’ জয়ন্তের প্রতিক্রিয়া।

আপনার বক্তব্য জারী রেখে আপনি বললেন—‘‘পউলির এই সূত্রটিকে বলা হয় পউলি এক্সক্লুসন প্রিনসিপ্যাল (Pauli Exclusion principle)। ১৯৪৫ সাল পাউলি পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।’’

জয়ন্ত এরপর তোমায় যার কথা বলব তিনি বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের একজন। জার্মানীর ওয়ারনার হেইসেনবার্গ (Werner Heisenberg)। কোয়ামটাম মেকানিক্‌সের অত্যন্ত গুরুত্তপূর্ণ সূত্র আনসারটেনটি প্রিনসিপ্যালের (Uncertainty principle) জনক। ১৯২৭ সাল তিনি বললেন ‘‘কোন এক মুহূর্তে যত বেশী নিশ্চিভাবে কোন ক্ষুদ্র কণার অবস্থান নির্ণয় করা যায় ততটাই অজ্ঞাত হয়ে পড়ে কণাটির ভরবেগ সম্বন্ধীয় তথ্য এবং তদ্বিপরীত।’’ For a particle the more precisely the position is determined the less precisely the momentum is known and vice versa.

জয়ন্ত চিন্তা কর তুমি দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়েতে গাড়ী চালাচ্ছ। গতির উচ্চ সীমা ৮০ কি.মি.। হাইওয়ে পেটরোল হাইওয়ের কোন এক জায়গাতে যন্ত্রের সাহায্যে নজরদারী করছিল গাড়ীর গতির ওপর। তোমার কাছে এসে চার্জ করল ‘‘আপনি গতি সীমা বেশী গতিতে গাড়ী চালাচ্ছিলেন।’’ আনসারটেনটি প্রিনসিপ্যালে মতে গতি নির্ণয় করা যন্ত্রটি যে নির্দিষ্ট স্থানে তোমার গাড়ীর গতি মেপেছিল ঠিক ঐ স্থানে তোমার গাড়ীর গতি ছিল ৭৯.৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯ কি. মি. প্রতি ঘন্টা এবং

৮০.০০০০০০০০০০০০০০০০০০১ কি. মি. প্রতি ঘন্টা মধ্যে অতএব হাইওয়ে পেটরোল পারে কি তোমায় চার্জ করতে?

এখন যদি তোমার এ গাড়ীর আয়তন হত একটি ইলেকট্রন কণার মত ক্ষুদ্র তবে আনসারটেনটি প্রিনসিপ্যাল বলে তোমার গাড়ীর গতি হত ঘন্টায় ১০০০ কি. মি.। হাইওয়ে পেটরোল তোমাকে ২ এমনকি ৩ গুণ ফাইন করলেও তোমার কিছু বলার থাকত না।

দেখ জয়ন্ত যে কোন পর্দার কোন একটি বিষয় নির্ণয় করার জন্যে পদার্থটিকে Disturb ডিসটারব্ করা ছাড়া উপায় নেই। হয় পদার্থকে স্পর্শ করা হয়। হয় বা কোন মাপার যন্ত্রের দ্বারা স্পর্শ করা হয় নতুবা পদার্থটিকে আলো ফেলা হয়। নতুবা পদার্থটিকে শব্দ তরঙ্গ দিয়ে ধাক্কা মারা হয়। ইত্যাদি ইত্যাদি।। যে কোন প্রকারেই পদার্থটি ডিসটারব্ হলেই পদার্থটির গতির পরিবর্তন হয়। আলো ফেলার জন্যে আলোর বাহন কণা ফোটন পদার্থটিকে ধাক্কা দেয়। গাড়ীর পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত মৃদু এই ধাক্কা। পরিণাম গাড়ীর গতিতে নগন্য পরিবর্তন। চিন্তা করে দেখ জয়ন্ত, একটি ক্ষুদ্র কণার পরিপ্রেক্ষিতে কিন্তু এই পরিবর্তন বিশাল।

অনুরূপভাবে জয়ন্ত, ধর তোমার গাড়ীটির গতি ছিল ঠিক ৮০ কি.মি. প্রতি ঘন্টায়। একই কারণে গতি নির্ধারণ করার ক্যামেরাটির অবস্থানও সুনিশ্চিতভাবে নির্ণয় করা অসম্ভব।

একটা ব্যাপার কি জান জয়ন্ত, আইনস্টাইন কোয়ান্টাম মেকানিক্সের অনেক সূত্র সম্বন্ধে খুব একটা প্রসন্ন ছিলেন না। যদিও তিনি ছিলেন Q. M.-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

আনসারটেনটি প্রিনসিপ্যালটি যে সর্বৈব সত্য নয়, প্রমাণ করার জন্যে আইনস্টাইন, পোডেলস্কি আর রোসেন এই তিন বিজ্ঞানী এক অতি চতুর পরীক্ষার কথা পেশ করেছিলেন। পরীক্ষাটি EPR Paradox বলে বিখ্যাত।

জয়ন্ত, তোমার বোঝার সুবিধার জন্যে আমি উপমাটি সোজাভাবে বলছি।

ধর তুমি আর তোমার এক বন্ধু গড়ের মাঠে পেছন করে দাঁড়িয়েছ। পূর্বনির্ধারিত নিয়ম অণুসারে দুজনে বিপরীত দিকে এক্কেবারে সমান গতিতে হাঁটতে আরম্ভ করলে। কিছুক্ষণ পরে আমি আমার গতি নির্ধারক ক্যামেরার সাহায্যে তোমার গতি নির্ণয় করলাম এক নির্দিষ্ট সময়ে। যেহেতু আমি তোমার বন্ধু হতে অনেক দূরে, আমার সঙ্গে তোমার বন্ধুর গতিও ছিল তোমার গতির সমান কেবল বিপরীত দিকে, আমি তোমার গতি নির্ধারণ করে পরোক্ষভাবে তোমার বন্ধুর নির্দিষ্ট গতি নির্ধারণ করলাম। তোমার গতির বদলে তোমার

নির্দিষ্ট অবস্থান নির্ণয় করে তোমার বন্ধুরও নির্দিষ্ট অবসান নির্ধারণ করতে পারতাম।

একইভাবে পরস্পরের বিপরীত দিকে সমগতিতে ধাবমান দুটি ক্ষুদ্র কণার নির্দিষ্ট গতি এবং নির্দিষ্ট অবস্থান বর্তমান, এটি প্রমাণ করা যায়।

আনসারটেনটি প্রিনসিপ্যাল নির্দিষ্ট নয়, ক্ষুদ্র কণার সম্ভাব্য গতি এবং সম্ভাব্য অবস্থানের কথা বলে।

আনসারটেনটি প্রিনসিপ্যালের মতে কোন এক নির্দিষ্ট সময়ে কোন এক ক্ষুদ্র কণার নির্দিষ্ট গতি এবং নির্দিষ্ট অবস্থান থাকা সম্ভব নয়।

জয়ন্ত তোমায় যে পরীক্ষাটির কথা বললাম চিন্তা করে দেখ আমি কিন্তু তোমার একসঙ্গে দুটি বিষয় নির্ধারণ করিনি। আমি হয় তোমার গতি নির্ধারণ করেছিলাম অথবা তোমার সঠিক অবস্থান নির্ধারণ করেছিলাম (কোন এক নির্দিষ্ট সময়ে)। এবং পরোক্ষভাবে তোমার বন্ধুর হয় গতি অথবা নির্দিষ্ট সময়ে তাঁর সঠিক অবস্থান নির্ধারন করা সম্ভব এইটাই প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলাম।

EPR কেবল বলতে চেয়েছিলেন তোমার এবং তোমার বন্ধুর অণুরূপ আচরণে দুটি ক্ষুদ্রকণার নির্দিষ্ট গতি এবং নির্দিষ্ট অবস্থান বাস্তব। দেখ জয়ন্ত এটা বাস্তব অবাস্তবের কথা। EPR বাস্তবকে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছিলেন।

জয়ন্ত কোয়ান্টাম মেকানিকস অনেক এমন কথা বলে আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় অবাস্তব। কোয়ান্টাম মেকানিকসের এই অবাস্তব ব্যাপারগুলি আইনস্টাইন মেনে নিতে পারেন নি।

কোয়ান্টাম মেকানিকস সব সময় সম্ভাব্য খেলায় অংশ নেয়। কোয়ান্টাম মেকানিক্সের পরিভাষায়—কোন একটা বলকে কুতুব মিনারের ওপর থেকে নিচের দিকে নিক্ষেপ করা হলে বলটির ভূমিতে কোন এক নির্দিষ্ট জায়গাতে (সোজা নিচে) পড়ার সম্ভাবনা ৯৯.৯৯৯ শতাংশ । দূরে অন্য আর এক জায়গাতেও পড়ার সম্ভাবনা বাকি ০.০০১ শতাংশ।

ক্লাসিকাল ফিজিক্সে যে কোন পদার্থের প্রারম্ভিক স্থিতির অবগতিতে পদার্থটির ভবিষ্যত স্থিতি নির্ধারণ করা সম্ভব।

কোন ফুটবলারের মারা সটের পরেই বলটিতে পায়ের দ্বারা আঘাত করা বলের (Force) এর পরিমাণ, বলটিতে ঠিক কোন স্থানে স্পর্শ করার স্থান, স্পর্শের সময় ফুটবলারের পায়ের দিশা, বলটির ওজন, বাতাসের বেগ এবং দিশা ইত্যাদি তথ্যগুলি জানা থাকলে ক্লাসিকাল ফিজিক্সের সূত্রের সাহায্যে বলটির অতিক্রম করার দূরত্ব এবং বলটির গতির সম্পূর্ণ ছবি (Trajectory) গণনা করে বলা সম্ভব।

এখানে সম্ভাব্য ব্যাপারটির স্থান নেই।

জয়ন্ত Q. M. ব্যবহার করা হয় কেবলমাত্র ক্ষুদ্র কণাদের গতিবিধি বিশ্লেষণ করার জন্য। আর বাস্তব ক্ষুদ্র কণাদের আচরণ, গতিবিধি সমস্ত ভীষণ রকম বিশৃঙ্খল। ভীষণ রকম অশান্ত, চঞ্চল। এই বিশৃঙ্খল অস্থিরতাকে বিশ্লেষণ করার একমাত্র উপায় সম্ভাব্যের খেলায় অংশ নেওয়া। Q. M. সবসময় তাই করে।

জয়ন্ত এরপর তোমায় একটা কথা বলব কোয়ানটাম মেকানিকস-এর সম্পর্কিত এমন একটা ঘটনা যে তোমার মনে হবে এ অসম্ভব, অবাস্তব, অবিশ্বাস্য। কিন্তু এটি সহজেই সম্ভব আর চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারা পৃথিবীর মত বাস্তব। অবিশ্বাসের কোন কারণ নেই। পরীক্ষিতভাবে এর সত্যতা বার বার প্রমাণিত। জ্ঞানী আইনস্টাইনও ব্যাপারটি নিয়ে সন্দিগ্ধ ছিলেন। তাঁর সময় পরীক্ষিতভাবে প্রমাণ করা সম্ভব হয়নি। প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতি তখন ততটা হয়নি। আইনস্টাইন বলেছিলেন "Spooky action at a distance।

"দূরবর্তী স্থানে ভূতুড়ে কান্ড"

ধর দুটি ক্ষুদ্র কণার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। অথবা সম্পর্ক ছিল। সোজা বাংলায় ধর দুটি ক্ষুদ্র কণা জড়াজড়ি অবস্থায় অবস্থান করছে। অতঃপর সম্পর্ক ছিন্ন করে ক্ষুদ্র কণাদুটি পরস্পর হতে দূরে, অনেক দূরে, এমনকি কয়েক কোটি আলোকবর্ষ দূরে (হয়ত বা ভিন্ন ভিন্ন নক্ষত্রমন্ডলীতে) অবস্থান করছে। জয়ন্ত এবার মন দিয়ে শোন কি বলছি।

জয়ন্ত বলল, "বলুন দাদা। আপনি বলুন। আমার শ্রবনইন্দ্রিয়তে এখন কেবল আপনার কথাই প্রবেশ করছে"।

মৃদু হেসে আপনি আপনার বক্তব্য জারী রাখলেন। বললেন কোয়ানটাম মেকানিক্স আলিঙ্গনরত দুটি ক্ষুদ্র কণার চরিত্র বিশ্লেষণে বলে (behaviour of two entangled particles) দৃশ্যত বিচ্ছিন্ন হলেও দুটি ক্ষুদ্র কণার সম্পর্ক ছিন্ন হয় না। Yes জয়ন্ত yes। লক্ষ্য কোটি যোজন দূরে অবস্থিত ক্ষুদ্র কণাদুটি পরস্পরের প্রতি অণুরক্ত থাকে। কেবল অণুরক্ত থাকে বলা হলে ভুল বলা হবে। পরস্পর পরস্পরকে অণুসরণ করে।

একটি ক্ষুদ্রকণার কোন প্রকার disturb হওয়ার ফলে কণাটির আচরণে কোন পরিবর্তন হলে অন্য ক্ষুদ্রকণাটিও আপনা আপনি নিজের ঐ আচরণটি বিপরীত দিকে পরিবর্তন করে। এইভাবে ভারসাম্য বজায় রাখে।

এই ব্যাপারটি জয়ন্ত মহামান্য আইনস্টাইনের স্পেশাল থিয়োরী অফ রিলেটিভিটির পরিপন্থী। গতির শেষ কথা আলোর গতি। স্পেশাল থিয়োরীর মতে বিশ্বের কোন কিছুর গতি আলোর গতিকে অতিক্রম করা সম্ভব নয়।

অতএব একটি ক্ষুদ্রকণা শত শত আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত অপর একটি ক্ষুদ্র কণা সম্বন্ধে তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষুদ্র কণিকাটির কোন পরিবর্তন কিভাবে অবহিত হয়? কেবল অবহিতই নয় নিজের আচরন এমনভাবে পরিবর্তন করে, তাৎক্ষণিকভাবে যাতে ভারসাম্যের তারতম্য না হয়।

জয়ন্ত এই কোয়ানটাম এনট্যাংগেলমেন্ট ব্যাপারটি পরীক্ষিতভাবে প্রমাণিত। একবার, দুবার, বহুবার, বহু ল্যাবরোটারিতে প্রমাণিত। আর ক্ষুদ্রকণাদের ওই অদ্ভুত আচরণ কেবলমাত্র দুটি কণার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এখনও পর্যন্ত পরীক্ষিতভাবে প্রমাণিত করা সম্ভব হয়েছে পাঁচ পাঁচটি আলিঙ্গত ক্ষুদ্রকণা পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে দূরবর্তী স্থানে অবস্থান করে তখনও যে কোন একটি ক্ষুদ্রকণার পরিবর্তিত আচরণ অপর চারটি ক্ষুদ্রকণা অণুসরণ করে। অণুসরণ করে তাৎক্ষণিকভাবে।

জয়ন্ত বোঝবার জন্য অতি, অতিরঞ্জিত করে তোমায় একটি কাল্পনিক ঘটনার উল্লেখ করছি।

ধরা যাক তোমার ঘরের আলমারির মাথার ওপর সম্পূর্ণভাবে সাদৃশ্য দুটি টেনিস বল জড়াজড়ি অবস্থায় রাখা আছে। একটি বল রাখলে তোমার টেবিলের ওপর। অপর বলটি পাঠিয়ে দিলে তোমার ভাইয়ের কাছে নিউ ইয়র্কে। (কি ভাবে পাঠালে সেটা এখানে অপ্রাসঙ্গিক)। ভাই তোমার কথা মত বলটি রাখলো একটা টেবিলের ওপর। তোমার ভাই-এর ওয়েব ক্যামেরার সাহায্যে তুমি তোমার ভাই-এর টেবিলে রাখা বলটি দেখতে পারছ তোমার কমপিউটারে।

তোমার টেবিলে রাখা বলটিতুমি হাত দিয়ে ঘুরিয়ে দিলে কোন এক দিকে। তুমি অবাক হয়ে তোমার কমপিউটারে দেখলে, সঙ্গে সঙ্গে তোমার ভাই-এর টেবিলে রাখা বলটিও বিপরীত দিকে ঘুরতে আরম্ভ করল। ঘুরতে আরম্ভ করল কেবল নয়। ঘুরতে আরম্ভ করল আপনা আপনি। তোমার টেবিলের বলটিকে তুমি এবার বিপরীত দিকে ঘুরিয়ে দিলে। দেখলে NY-এর বলটিও আপনা-আপনি দিক পরিবর্তন করে বিপরীত দিকে ঘুরতে থাকলো।

তোমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ধরা পড়ল এই অণুসরণটি একশ ভাগ নিখুত। কেবল তুমি তোমার স্টপ ওয়াচে সময় নিয়ে দেখলে N.Y-এর বলটি তোমার বলটিকে অণুসরণ করছে ঠিক ০.০৪২৫ সেঃ পর।

জয়ন্ত তোমার বিশ্লেষণ করার সহজাত ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে তুমি সহজেই এই বিলম্বে অণুসরণ করার কারণটি বুঝতে পারলে।

N.Y-এর তোমার ভাই-এর কম্পিউটার থেকে তোমার কম্পিউটারে ছবি আসছে ইনটারনেটের মাধ্যমে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভে। আলোর গতিতে

ইলেকট্রেম্যাগনেটিভ ওয়েভে গতি সেকেন্ডে ৩০০০০০, তিন লক্ষ্য কি. মি.। সঠিক সংখ্যাটি ২৯৯৯৭২ কি. মি.। এটলাস থেকে বের করলে কলকাতার থেকে N.Y-এর দূরত্ব ১২৭৬০ কি.মি.।

কালকুলেটারে ১২৭৬০ কে ২৯৯৯৭২ দিয়ে ভাগ করে তুমি বের করলে N.Y থেকে তোমার কম্পিউটারে ছবি আসতে সময় লাগে ০.০৪২৫ সেঃ।

তোমার গণনার সংখ্যা এবং তোমার স্টপ ওয়াচে সময় নেওয়ার সংখ্যা কাঁটায় কাঁটায় সমান। চাকতির সঙ্গে চাকতির মিল।

মনে মনে তোমার বিশ্লেষণ করার ক্ষমতার তারিফ করে আত্মতৃপ্তির হাসি হাসলে।

জয়ন্ত হঠাৎ তোমার মাথায় একটা প্রশ্ন জাগলো। ভাবলে তা হলে কি? পরক্ষণেই ভাবলে না না এ হতে পারে না। এ অসম্ভব।

ঠিক এই রকমই অসম্ভব ভেবেছিলেন EPR (আইনস্টাইন, পড়োনক্সি এবং রোসেন) ১৯৩৫ সালে।

তোমার সন্দেহ সম্পূর্ণ সত্য জয়ন্ত। N.Y-এর বলটি অনুসরণ করছিল তোমার টেবিলের বলটিকে কেবল আপনা আপনিই নয়। অনুসরণ করছিল তাৎক্ষণিকভাবে।

আইনস্টাইনের স্পেশাল থিয়োরী অফ রিলেটিভিটির অনুসারে আমাদের বিশ্বের গতির শেষ সীমা হল আলো গতি। কোন কিছুর পক্ষে এই গতিকে অতিক্রম করা অসম্ভব।

এই কারণেই আইনস্টাইন মন্তব্য করেছিলেন "Spooky action at a dirtarce"

"দূরবর্তী স্থানে ভূতুড়ে কান্ড"

জয়ন্ত চিন্তা করে দেখ কত আশ্চর্য ব্যাপার এই কোয়ানটাম এনটাংগেলমেন্ট।

জগতের যে কোনা স্বতন্ত্র বস্তুই তার চারিপাশের আকাশের উপস্থিতির স্বতন্ত্র। আমি আর তুমি স্বতন্ত্র কারণ আমাদের মধ্যবর্তী স্থানে আকাশের উপস্থিতি।

কোয়ানটাম এনটাংগেলমেন্টে দুটি বা অধিক ক্ষুদ্রকণার মধ্যবর্তী স্থানে আকাশের উপস্থিত সত্ত্বেও কণাগুলি স্বতন্ত্র নয়। আকাশ পরিহার্জ্য। ভাব জয়ন্ত, আকাশ পরিহার্জ্য?

কি কারণে ক্ষুদ্রকণাদের এ হেন আচরণ? আমি দুঃখিত জয়ন্ত। আমার জানা নেই। আজ অবধি পৃথিবীতে কোন মানুষেরই জানা নেই।

জয়ন্ত এবার তোমায় কোয়ানটাম মেকানিকস এর এনট্যাংগেনড entangled

পারটিকেলের সম্পর্কিত আরো একটি আজব ব্যাপার বলব। ব্যাপারটি আজ তোমার অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে। কে বলতে পারে পাঁচশ কি হাজার বছর পরে মানুষের নিত্য ব্যবহার্য জিনিস হবে এটি?

জয়ন্ত তুমি হয়ত জান প্রায় ৬ হাজার বছর পূর্বে মানুষ আবিষ্কার করেছিল গোল চাকা। বলতে পার মানুষের চিরকালের আকাঙ্ক্ষা 'তীব্র গতিশীল হওয়ার' প্রথম পদক্ষেপ। ক্রমে ক্রমে মানুষ আবিষ্কার করে ঘোড়ার গাড়ী, বাই সাইকেল, ট্রেন, মোটর গাড়ী, বিমান, রকেট ইত্যাদি ইত্যাদি। ক্রমান্বয়ে বর্দ্ধিত গতির যানবাহন।

মানুষ গতি চাই। তীব্র গতি। চাই আলোর গতিতে ভ্রমণ। চাই আলো হতেও দ্রুত গতিতে ভ্রমণ। চাই গতির শেষ সীমা... "তাৎক্ষণিক ভাবে অসীম দূরত্বের অতিক্রম।"

জয়ন্ত বলে ওঠে "থাম দাদা থাম। তোমার বলার মাত্রাটা খুব বেশী হয়ে যাচ্ছে। যত সব অলীক স্বপ্ন তোমার! আলোর গতিতে যাতায়াত। আলোর গতিকে অতিক্রম করে তাৎক্ষণিক ভাবে যাতায়াত। কি যে বল তুমি মাঝে মাঝে!

শোন বন্ধু শোন। ক্ষুদ্রদের দুনিয়ার কথা। আজব দেশের আজব কথা। এই কথা ইতিকথা নয়। এই স্বপ্ন অলীক স্বপ্ন নয়। এই কথা সব সত্যি কথা। এই স্বপ্ন সব বাস্তব স্বপ্ন। শোন তবে।

তোমার যে সব যানবাহনের কথা বললাম তার সবাই কিছু সময়ে কিছু আকাশ অতিক্রম করার ব্যাপার। মানুষের চিরকালের চেষ্টা সময়টিকে হ্রাস করে আকাশটিকে বর্দ্ধিত করতে। অর্থাৎ গতি বৃদ্ধি করা। মহামান্য আইনস্টাইনের স্পেশাল থিয়োরীর মতে আমাদের বিশ্বে গতি এক সীমারেখা বর্তমান। আলোর গতি মোটামুটি ৩০০০০০ (তিন লক্ষ) কি:মি: প্রতি সেকেন্ডে। এক সেকেন্ডে তিন লক্ষ্য কি: মি: আকাশ অতিক্রম করা। সময় এক সেকেন্ড। আকাশ তিন লক্ষ্য কি: মি:।

জয়ন্ত চিন্তা করে দেখ যতক্ষণ পর্যন্ত সময় এবং আকাশ থাক'বে ততক্ষণ গতির কোন সীমা কি? তা তত্বীয় ভাবে বলা অসম্ভব।

এবার যদি বলা হয় সময় এবং আকাশ এই দুটিকেই পরিহার করে ভ্রমন তাহলে? ঠিক তাই জয়ন্ত, তাহলে সেই ভ্রমণ হবে তাৎক্ষণিক ভ্রমণ। দূরত্ব এবং সময় এখানে অবান্তর।

ঠিক এই রকমই এক ভ্রমণ সম্ভব। তাৎক্ষণিক ভ্রমণ। ভূতের রাজার বরে গুপি, বাঘার যেখানে ইচ্ছে সেখানে যাওয়ার মত ব্যাপার। কোয়ানটাম

মেকানিক্‌স এই প্রকার তাৎক্ষণিক ভ্রমণের সম্ভাবনার কথা বলে। শুধু বলে নয় বন্ধু বিশ্বাস কর তাৎক্ষনিক ভ্রমন যে বাস্তব তা পরীক্ষিত ভাবে প্রমাণিত।

জয়ন্তর কাঁধে মৃদু থাপ্পড় মেরে আপনি বললেন, "Yes, yes, yes বন্ধু বিশ্বাস কর কোন রকম যানবাহন ছাড়া তাৎক্ষণিক ভ্রন আজ পরীক্ষিত ভাবে প্রমাণিত।"

এই প্রকার তাৎক্ষণিক ভ্রমনকে বলা হয় টেলিপোরটেশন Teleportation। আজকের প্রযুক্তিতে কেবলমাত্র আলোর বাহন কণা ফোটনের teleportation সম্ভব হয়েছে। সম্ভব হয়েছে লেজার রশ্মির teleportation। প্রযুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে স্বল্পদৈর্ঘ্যের টেলিপোরটেশন এবং অসীম দৈর্ঘ্যের টেলিপোর্টশনের মধ্যে তফাৎ সামান্য।

এখনও পর্যন্ত কোন পরমাণুকেও টেলির্পোটেশনের দ্বারা স্থানান্তরিত করা সম্ভব হয় নি। আজকের প্রযুক্তির দ্বারা এটি সম্ভব হয়নি। সম্ভব হবে। এ কেবল সময়ের অপেক্ষা।

জয়ন্ত, যে পদ্ধতির দ্বারা এখন টেলির্পোটেশন করা হয় তাতে টেলির্পোট করা বস্তুটি বিনষ্ট হয়ে যায়। সম্পূর্ণ সাদৃশ্য একটি বস্তুর উদ্ভব হয় অন্য একটি নিদৃষ্ট স্থানে।

জয়ন্ত চিন্তা করে দেখ ভবিষ্যতে কোন সময় যখন মানুষ টেলির্পোটেড হবে তখনও ঠিক একই ব্যাপার ঘটবে।

আপনি বললেন "জয়ন্ত ধর জন্তু জানোয়ার দেখার জন্যে আমি কলকাতার থেকে টেলির্পোটেড হয়ে কিনিয়ার কিলিমানজারের জঙ্গলে উদ্ভুত হলাম। উদ্ভুত হলাম তাৎক্ষণিক ভাবে। কলকাতায় আমি বিনষ্ট হয়ে গেলাম।

কিলিমানজারোর আমি কিন্তু বুঝতেও পারব না যে আমি হলাম নতুন আমি। নতুন আমির স্মৃতির, মনের, প্রানের কোন পরিবর্তন হবে না মূল আমির সঙ্গে। কিলিমানজারোর আমির সাধ আহ্লাদ, পছন্দ অপছন্দ, মায়া মমতা, প্রেম ভালোবাসা, শিক্ষা দীক্ষা, আচার ব্যবহার, গুন বদগুন, স্বাদ বিস্বাদ। সবই এক হবে কতলতার আমির সঙ্গে। স্বাদে, গন্ধে, আকারে আয়তনে কিলিমানজারের আমি হব কলকাতার আমি। অতএব ভেবে দেখ ক্ষতি হবে কি কিছু? বিমানে কিলিমানজারোর জঙ্গলে গিয়ে দেখা করলে তোমার মন কি খুঁত খুঁত করবে জয়ন্ত? ভাববে কি এটি আমার আসল দাদা নয়?

ক্ষুদ্র কণিকাদের জগতে প্রাকৃতিক ভাবে এই প্রকার টেলির্পোটেশন অণুষ্ঠিত হচ্ছে না বলা যায় কি? হয়ত হচ্ছে। অহরহ হচ্ছে।

আর হচ্ছে কোয়ানাম টানেলিং। Quantam turmelling।

জয়ন্তের প্রশ্ন "কি বললেন দাদা? কোয়ানটাম টানেলিং? মানে ক্ষুদ্র জগতের সুড়ঙ্গ?"

আপনার জবাব "আরে না না বন্ধু। আমি কোয়ানটাম টানেল বলিনি। বলেছি কোয়ানটাম টানেলিং।

যাতায়াতের পথে পাহাড়ের বাধা পেরনো যায় পাহাড়ের বুকে সুড়ঙ্গ কেটে। নদী বা সমুদ্রর বাধা পেরনো যায় নদীর বা সমুদ্রের তলা দিয়ে সুড়ঙ্গ কেটে।

ঠিক একই ভাবে যে পদ্ধতিতে ক্ষুদ্র কণারা বাধাকে অতিক্রম করে যাতায়াত করে তাকে বলা হয় কোয়ানটাম টানেলিং। যাতায়াত বলাটা ঠিক হল না। বলা উচিত বাধাকে অতিক্রম করা। চেপেচুপে ফাঁক ফোকর দিয়ে বাধাটির এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্তে পৌঁছে যাওয়া।

জয়ন্তের কাঁধে হাত রেখে আপনি বললেন "বন্ধু কোয়ানটাম টানেলিং পদ্ধতিতে তুমি ঐ কংক্রিটের দেওয়ালের মধ্যে দিয়ে অনায়াসে দেওয়ালের অপর দিকে চলে যেতে পার। যেন দেওয়ালটি কংক্রিটের নয় বাতাসের দেওয়াল। অবশ্য মনে রাখবে কোয়ানটাম মেকানিকস, সর্ব্বদা চান্সের বা সম্ভাবনার খেলায় অংশ নেয়। তোমার পক্ষে দেওয়ালটি ভেদ করে যাওয়ার সম্ভাবনা হয়ত ০.০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০১ শতাংশ। ক্ষুদ্র কণাদের ক্ষেত্রে এই সম্ভাবনা বাস্তবিক সম্ভাবনা।

ছোট্ট গ্রামের ছোট্ট ছেলে। তাকে যদি টেলিপোর্টি করে নিউইয়র্কের রাস্তায় নিয়ে যাওয়া হয় তখন তার মনের অবস্থার সঙ্গে তোমায় দেখে মনে হচ্ছে তোমারও সেই অবস্থা। জয়ন্ত, আমার কথা শুনে তুমি কি বিস্ময়ে একেবারে হতবাক?

ক্ষুদ্র কণাদের এই বিচিত্র আচরণের প্রমান তোমার জামার পকেট থেকে যে মোবাইল ফোনটি উঁকি মারছে সেটি। হসপিটালে, নার্সিংহোমের স্ক্যানিং মেশিনগুলি কাজ করে কোয়ানটাম মেকানিকস এর সূত্র অণুযায়ী। কোয়ানটাম মেকানিকস্ এর দৌলতেই আমরা পেয়েছি লেজার, ট্রানজিসটার, ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ, কোয়াটাম টানেলিং মাইক্রোস্কোপ, ১৮ লক্ষ বছরে ১ সেকেণ্ডর হেরফের হওয়ার মত নিখুঁত এ্যাটমিক ক্লক, আরো কত কি? কোয়াটাম কেমিস্ট্রি বিজ্ঞানীদের অণু, পরমাণুদের প্রকৃত পরিচয় দেয়। কোয়ামটাম মেকানিক্সেরই দান হল আধুনিক কম্পুইটার।

আধুনিক মহাকাশ গবেষণায় স্পেকট্রোস্কপি অপরিহার্য। আধুনিক স্পেকট্রোগ্রাফি সম্পূর্ণ রূপে কোয়ামটাম সূত্রের ওপর নির্ভরশীল।

ইঞ্জিয়ারিং শিল্পের বা ফলিত বিজ্ঞানের অভূপূর্ব উন্নতির অন্যম কারণ

কনট্রোল ইনজিনিয়ারিং-এর অসামান্য সাফল্য। আধুনিক কনট্রোল ইঞ্জিনিয়ারিং মুখ্যত কোয়ানটাম মেকানিক্সের ওপর নির্ভরশীল।

অদূর ভবিষ্যহৈ কোয়ামটাম মেকানিকস আমাদের উপহার দিতে চলেছে কোয়ানটাম কম্পুটার। কার্যগুনে এটাই কুশলী সেই সব কম্পুউটার যে এখনকার কম্পুউটারগুলির স্থান হবে আঁস্তাকুড়ে। ইনফরমেশন টেকনলজিতে আসছে যুগান্তকারী পরিবর্তন। ভবিষ্যতে মানুষের জীবন যাত্রা বহুলাংশে নির্ভর করবে কোয়ানটাম মেকানিক্সের সূত্রগুলির সফল ফলিত প্রয়োগের ওপর।

জয়ন্ত বলে ওঠে "দাদা পুচকেগুলোর কি প্রচণ্ড দাপট?"

যা বলেছ বন্ধু। তেনাদের স্পর্শ করা দায়। তেনাদের ঠিকানার হদিশ পাওয়া দায়।

কোন পিওনের পক্ষেও সম্ভব নয় তেনাদের ডাক বিলি করবার। কোথায় তেনাদের অবস্থান? হয়ত বা এইখানে। নয়ত বা সেইখানে। আবার হতে পারে ঐ দূরে ঐখানে।

বেচারী পিওন কোথায় বিলি করবে তাদের ডাক? বন্ধু আছে কি কোন উত্তর তোমার কাছে? নেই তো? পৃথিবীর তাবৎ বিজ্ঞানীদের কাছেও নেই। তাঁরাও পিওনকে বলবেন এখানে যাও। ঐ খানে যাও। না পেলে ঐ দূরে সেইখানে যাও।

তেনারা কিন্তু তাদের উপস্থিতি জানান দিতে ওস্তাদ। বিশ্বের যাবতীয় মহাকাশিয় ঘটনার পেছনে মূল কারণও আর কেউ নয় জয়ন্ত, বিচিত্র এই সব দেখতে না পাওয়া ক্ষুদ্র কণা।

এই ক্ষুদ্র কণাদের ধরা না যাওয়ার কারণ কি জান জয়ন্ত? কারণ, এরা "তরঙ্গ" কখনও বা এরা "পদার্থ'। দ্বৈত পরিচয় এদের।

সঙ্গে সঙ্গে জয়ন্তর প্রশ্ন—"দাদা তরঙ্গ আর পদার্থ কি এক হল? তরঙ্গ একটা continuous, অবিরাম, অবিচ্ছিন্ন, একটানা জিনিস। পদার্থ তো তা নয়। তবে?"

দেখ বন্ধু যে কোন ক্ষুদ্র কণার পরিপ্রেক্ষিতে "wave particle duality" "তরঙ্গ পদার্থের দ্বৈত অবস্থান"' একটি সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং ঘটনা। এই ঘটনা সহস্রবার পরীক্ষিত ভাবে প্রমাণিত।

জয়ন্ত বলতে পার তোমার ঐ বসার চেয়ারটিও সমষ্টিগত ভাবে (ক্ষুদ্র কণার) তরঙ্গ দ্বারা গঠিত।

সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে জয়ন্তের প্রশ্ন "পড়ে যাব না তো দাদা?"

আপনার আশ্বাস "বস বন্ধু বস। বললাম না ক্ষুদ্র কণারা কখনও তরঙ্গ

আবার কখনও পদার্থ। তোমার বসার চেয়ারটি কোটি কোটি, কোটি কোটি ক্ষুদ্র কণার সমষ্টিতে তৈরী। সবগুলি ক্ষুদ্রকণা একসাথে তরঙ্গায়িত হবে, ভাবলে কি ভাবে? অতএব, সোয়াস্তি বন্ধু। তুমি নির্ভয়ে তোমার আসন গ্রহন কর।

কোয়ামটাম মেকানিক্স ছাড়া মানুষের আধুনিক জীবন যাত্রা এমনকি ভবিষ্যতের জীবন চিন্তা পর্যন্ত করা যায় না। অসংখ্য অত্যন্ত প্রতিভাময় বিজ্ঞানী কোয়ানটাম মেকানিকস্ এর গবেষণায় মত্ত। মানুষের ভবিষ্যতের জীবনযারা নির্দ্ধারণ করবে এই কোয়ানটাম মেকানিক্স।

দেখ জয়ন্ত সুদক্ষ লেখকেরা যেমন মানুষের বিচিত্র চরিত্র নিয়ে খেলা করতে ভালবাসেন, গল্প, উপন্যাস রচনা করেন, প্রকৃতি ঠিক সেই রকম ক্ষুদ্র কণাদের বিচিত্র চরিত্র দিয়ে বাস্তব আর অবাস্তবকে রহস্যের পর্দ্দায় ঢেকে রাখে।

জয়ন্ত বিভিন্ন সূত্রের সাহায্যে মানব সমাজকে কোয়ানটাম রাজ্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন যে সব প্রাতঃস্মরণীয় বিজ্ঞানী তাদের মধ্যে, জার্মানীর ম্যাক্স প্লাঙ্গ (Max Plank), আমেরিকার এ্যালবার্ট আইনস্টাইন (Albert Einstein), অস্ট্রিয়ার উলফ্গ্রাঙ পউলি (pauli, wolfgang), ফ্রান্সের লুইস ব্রগলী (LOUIS DE BROGLIE) অস্ট্রিয়ার এরউইন সরজিনজার (Erwin Schrodinger) ইংল্যান্ডের পি. এ.ম. ডিরাক (P.A.M.Dirac), হল্যান্ডের এইচ. এ. লরেঞ্জ (H.A.Lorentz) ইটালির এনরিকো ফারমি (Enrico ermi), ডেনমার্কের নীলস বোর (Niels Bohr) ইত্যাদিদের নাম বিশেভোবে উল্লেখযোগ্য।

আমাদের বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিক সত্যেন্দ্র নাথ বোসের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে ঐ সব দিকপাল বৈজ্ঞানিকদের সভায়।

দেখ জয়ন্ত বিজ্ঞানের বিশ্বতত্ত্ব (cosmology) শাখায় যদি দুটি উপশাখার নাম উল্লেখ করতে হয় বে তার একটি আইনস্টাইনের স্পেশাল এবং জেনারেল থিয়োরী অফ রিলেটিভিটি আর অপরটি কোয়ানটাম মেকানিক্স।

দুটি থিয়োরীরই সীমাবদ্ধা বিশেষ ভাবে চিহ্নিত।

আইনস্টাইনের থিয়োরীগুলির ব্যবহার হয় ব্রহ্মাণ্ডের বৃহত কাঠামোগুলির বিশ্লেষণে। যেখানে প্রচণ্ড গতি, অনন্ত আকাশ, বিশাল ভরের অবস্থান। সূর্য, তারা, তারামণ্ডলী, তারামণ্ডলী গুচ্ছ, ব্ল্যাক হোলের গতিবিধি, ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, ব্রহ্মাণ্ডের সম্ভাব্য ভবিষ্যত ইত্যাদির বিশ্লেষণে আইনস্টাইনের রিলেটিভিটির দুটি থিয়োরী প্রয়োগ করা হয়।

অপরদিকে জগতের ক্ষুদ্রতম পদার্থের অণু, পরমাণু, ক্ষুদ্রকণা ইত্যাদির আচার ব্যবহার, গতিবিধি, এদের একক এবং সম্মিলিত শক্তি, এদের উৎপত্তি,

এদের বিনাশ এবং সর্ব্বপরি জগতের জীবনে এদের যে বিশাল প্রভাব এই সব ব্যাপারগুলির বিশ্লেষণে ব্যবহার হয় কোয়ানটাম মেকানিকস।

এই কণাটি মনে রেখ বন্ধু এই দুটি বিপরীত মেরুর সূত্রই আপন আপন ক্ষেযত্র বিপুল ভাবে সফল। এই সূত্রগুলির ব্যবহারে উপলব্ধ উত্তর সহস্রবার পরীক্ষিত ভাবে প্রমাণিত।

কিন্তু, শোন জয়ন্ত মন দিয়ে শোন, এখানে একটা বিশাল আকারের "কিন্তু" বর্তমান।

বিশাল কিন্তুটি হল—"এই যে দুটি অত্যন্ত সফল সূত্র, এদের যুগ্ম প্রয়োগে সর্বদা যে উত্তরটি পাওয়া যায় সেটি হল "ইনফিনিটি" বা গণনাতীত সংখ্যা। বলতে পার অর্থহীন সংখ্যা।

সমস্ত বিজ্ঞানীরা এই সংখ্যাটিকে এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করেন সব সময়। ব্রহ্মাণ্ডের সর্বাপেক্ষা শক্তিমান পথ অবরোধকারী। এগোনোর পথ চিরতরে রুদ্ধ। অতএব উপায়?

উপায় ফিরে যাওয়া অথবা অন্যপথ ধরা।

জয়ন্ত এই ভুবনের তাবৎ ঘটনার মধ্যে দুটি মাত্র ঘটনার দুটি মাত্র স্থানের অবস্থার পরিচয় জানতে প্রয়োজন হয় রিলেটিডিটি থিয়োরীদ্বয় এবং কোয়ানটাম মেকানিকসের থিয়োরীগুলির যুগ্ম প্রয়োগ।

আপনি জয়ন্তকে জিজ্ঞেস করলেন "বলতে পার জয়ন্ত? বিশেষ ঘটনাদুটি কি? ঘটনার স্থানদুটি কি?

না দাদা I haven't got a clue. হঠাৎ জয়ন্তর ইংরেজীতে উত্তর। মর্ডান ইংলিশ পড়ায় তো!

Elementary জয়ন্ত। পড় কালিদাস, পড়। তবেই না জানবে?

"দাদা তাই তো আপনার কাছে আশা"।

জয়ন্তের প্রসংশায় খুশি হয়ে আপনার জবাব "বেশ বেশ। আমার Reader's Digest-এর জ্ঞান আমি তোমার সঙ্গে share করতে সবসময় রাজী।

ঘটনা দুটি হল বিশ্বের জন্মক্ষণে বিশ্বের অবস্থা আর ব্ল্যাক হোলের কেন্দ্রের অবস্থা। প্রথমটির ক্ষেত্রে বিন্দু সমস্থানে বিশাল ভরের অবস্থান। অসীম ভর, বিশাল ভর। অতএব বিশ্লেষণে রিলেটিভিটি থিয়োরীর প্রয়োজন। আবার বিন্দুসম স্থল বা ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম বিন্দুর মত স্থান। অতএব বিশ্লেষণে কোয়ানটাম থিয়োরীর প্রয়োজন।

দরকার দুটি থিয়োরী যুগ্ম প্রয়োগ। যুগ্ম প্রয়োগ? নৈবচ নৈবচ। পথ অবরোধকারী ইনফিনিটি আছে না?

এই কারণেই জয়ন্ত, জন্মক্ষণে বিশ্বটির অবস্থা আর ব্ল্যাক হোলের কেন্দ্রের অবস্থা সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

বহু বিজ্ঞানী নিরলস তপস্যায় রত বিকল্প পথের সন্ধানে। লক্ষ্যে যে পৌঁছতেই হবে জয়ন্ত। আমার বিশ্বাস অদূর ভবিষ্যতেই অভীষ্ট এই কাজে বিজানীদের সাফল্য আসবে। বিশ্ব পরিচয়ের আরো একটি পাতা উল্টোনো সম্ভব হবে।

জয়ন্ত, অনেকক্ষণ কথা হল। এবার একটু Recess, বিশ্রাম।

নিচের থেকে পাঠান দুটো বড় গ্লাসে বরফ ঠাণ্ডা আমপোড়ার সরবৎ। বাড়ীর তৈরী এক প্লেট ঠাণ্ডা ছানার বরফি।

জয়ন্ত বলল, ‘‘বোশেখের এই গরমের সন্ধে। অমৃত অমৃত। চিনি নেই। জসিডীর আমবাগানায় একটা গাছের কাঁচা আম—‘‘মধুর মত।” ডিপফ্রিজারটায় ৬ মাস দিব্যি থাকে। অতএব—

আমার কলকচানি না শুনতে চাইলেও আমপোড়ার সরবতের লোভে চলে এস মাঝে মাঝে।

গ্লাসটা তুলে ধরে জয়ন্তের মন্তব্য ‘‘দাদা সরবৎটা উপরি পাওনা। মনটা কাঁদে আসলটার জন্যে।

সাধু সাধু বন্ধু সাধু।

চল, রসনার তৃপ্তির উপরান্তে ব্রতী হওয়া যাক মনের তৃপ্তির উদ্দেশ্যে।

জয়ন্ত এস তোমায় এবার ক্ষুদ্র জগতের অধিবাসীদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।

আপনি বললেন, “For a change তুমি আরম্ভ কর।”

হতভম্ব জয়ন্তের উত্তর : দাদা আমি?

Yes বন্ধু তুমি। তোমার মতে জগতের ক্ষুদ্রতম অধিবাসী কারা?

অণু? না না পরমাণু। কিছুক্ষণ চিন্তার পর জয়ন্তের উত্তর, ‘‘পরমাণুকেও তো বিভাজন করা যায়। ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন এই নিয়েই পরমাণু। অতএব এরাই জগতের ক্ষুদ্রতম পদার্থ। কি ঠিক বললাম তো দাদা?

আপনার জবাব ‘‘জয়ন্ত আধুনিক বিজ্ঞান বলে তোমার একটা উত্তর সঠিক। দুটো ভুল।

ইলেকট্রন— yes

প্রোটন, নিউট্রন— No

জয়ন্তের পুনরায় প্রশ্ন আমাকে ‘‘দাদা তবে কি প্রোটন আর নিউট্রনকেও বিভাজন করা সম্ভব?

সম্ভব বন্ধু নিশ্চয়ই সম্ভব।

১টা প্রোটন গঠন করে দুটো আপ Quarks আর একটা ডাউন Quarks

১টা নিউট্রন গঠন করে ২ টো ডাউন Quarks আর একটা আপ Quarks

জয়ন্ত বলল "দাদা কো কো কোয়ার্ক? আর আপ, ডাউন? এরা কি train গাড়ীর মত up এর train, down এর train?

আপনার জবাব "কো কো নয় জয়ন্ত বল কে কে। Quark এর উচ্চারণ 'K' Work অর্থাৎ কেওয়ার্ক।

কে ওয়ার্ক ৬ রকমের

(১) up (আপ) (২) Down (ডাউন) (৩) Charm (চার্ম) (৪) Strange (স্ট্রেন্জ) (৫) Top (টপ) (৬) bottom (বটম)

নাম কা ওয়াস্তে নাম। নামের মাহাত্ম কিছু নেই। আপ, চার্ম তার টপ কেওয়ার্কের ২/৩ শতাংশ ইলেকট্রনের চার্জ বর্তমান আর ডাউন, স্ট্রেন্জ আর বটম কে ওয়ার্কের— ১/৩ শতাংশ ইলেকট্রনের চার্জ বর্তমান।

অতএব ১টা প্রোটনে $\frac{২}{৩}(u)+\frac{২}{৩}(u)-\frac{১}{৩}(d)=$ ১ ইলেকট্রন চার্জ।

আর ১টা নিউট্রনে $\left(\frac{১}{৩}(d)+\frac{১}{৩}(d)-\frac{২}{৩}(u)\right)=0$ ইলেকট্রন চার্জ। অর্থাৎ চার্জ শূন্য।

জয়ন্ত আধুনিক বিজ্ঞান সেই কথায় বলে। বলে কেওয়ার্ক আর ইলেকট্রন বিভাজনের শেষ অংশ। অর্থাৎ মৌলিক পদার্থ। অবশ্য সুপার স্ট্রিং থিয়োরী ভিন্ন মত পোষণ করে। (সুপার স্ট্রিং থিয়োরী ও M থিয়োরীর চ্যাপ্টারে দ্রষ্টব্য)

জয়ন্ত মৌলিক কণাদের আবিষ্কারের ঝোঁক মানুষের চিরকালের। আজ অবধি ২০০ টির ও অধিক ক্ষুদ্র কণা আবিষ্কৃত হয়েছে। যদিও অধিকাংশ ক্ষুদ্র কণা মৌলিক কণা নয়।

পদার্থ বিজ্ঞানীরা স্টানডার্ড মডেল (Standard Modal) বলে একটি থিয়োরী বের করেছেন। এই স্ট্যানর্ডাড মডেলের মতানুযায়ী যাবতীয় ক্ষুদ্রকণাদের শ্রেণীভেদ করা হয়।

১) ৬টি কেওয়ার্কস

২) ৬ টি লেপটন (ইলেট্রন একটি পরিচিত লেপটন)

৩) বলের বাহন কণা (ফোটন একটি পরিচিত "বলের বাহন কণা")

কেওয়ার্ক আর লেপটন সম্মিলিত ভাবে ব্রহ্মাণ্ডের তাবৎ পদার্থ গঠন করে। বলা উচিত মানুষের জ্ঞাত মত পদার্থ আছে সেইগুলির গঠনের মূলে কেওয়ার্ক

আর লেপটন ক্ষুদ্রকণা।

ক্ষুদ্রজগতের এই দুইপ্রকার অধিবাসীরা এক অপরের সঙ্গে ক্রিয়া করে (Interact করে) বলের বাহন কণাকে নিজেদের মধ্যে আদান প্রদান করে।

একটা কথা বলে রাখা ভাল যে স্ট্যাণ্ডার্ড মডেল থিয়োরী তার বন্ধনীতে মাধ্যাকর্ষণকে অন্তর্ভূক্ত করে না। এটি এই থিয়োরীর একটি বিশাল ত্রুটি।

যাই চল আলোচনা আগে বাড়ান যাক।

৬টি কেয়ার্কের নাম বলেছি তোমায়।

এবার ৬টি লেপটনের নাম।

পরিচিত ইলেকট্রন (e) আর ইলেকট্রনের মতই নেগেটিভ ভাবে চার্জ কেবল অনেক বেশি ভারি মিয়ন (μ) আর টাউ τ। এই হল তিনটি।

বাকী তিনটি এদেরই চার্জশূন্য নিউট্রিনো (υ) অর্থাৎ ইলেকট্রন নিউট্রিনো (υ_e), মিওন নিউট্রিনো (υ_μ) আর টাউ নিউট্রিনো (υ_τ)।

তা হলে জয়ন্ত হরেদরে কি দাঁড়ালো?

জয়ন্তের উত্তর "দাদা ক্ষুদ্র কণাদের জগতে স্টানডার্ড মডেল থিয়োরী অণুযায়ী মুখ্য অধিবাসীদের যথাক্রমে ৬ রকম কেওয়ার্ক 'আপ ডাউন" "চার্ম, স্ট্রেন্‌জ আর "টপ বটম"। আর ৬ রকম লেপটন "ইলেকট্রন, ইলেকট্রন নিউট্রিনো "মিওন, মিওন নিউট্রিনো"-আর "টাউ, টাউ নিউট্রিনো"।

১০০ তে ১০০ বন্ধু। আপনার বাহাবা।

আপনি বললেন "শোন শ্রুতিধর, তোমার তালিকার কেওয়ার্কের প্রথম দুটি অর্থাৎ আপ আর ডাউন কেওয়ার্কের এবং লেপটনের প্রথম দুটি অর্থাৎ ইলেকট্রন এবং ইলেকট্রন নিউট্রিনোর তন্বীতনু এবং এরা স্থায়ী।

পরের গুলি স্থূলদেহী এবং অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই এরা রূপান্তরিত হয়ে যায় প্রথম দুই প্রকার স্থায়ী ক্ষুদ্র কণায়।

জয়ন্তের প্রশ্ন 'সরকার, তবে এই সব স্থূল দেহীদের অস্তিত্বের কি দরকার?

আপনার জবাব 'ভাল প্রশ্ন শ্রুতিধর। তবে এর উত্তর আমার জানা নেই। কারোরই জানা নেই। হয়ত বা এদের সংসারে আরো সদস্য বর্তমান। হয়ত বা আদোও এরা মৌলিক পদার্থ নয়। বিজ্ঞানীদের উত্তর এগুলি। আমার নয়।

তা হলে জয়ন্ত আমরা ১২ টা ক্ষুদ্রকণার সঙ্গে পরিচিত হলাম।

এই সবগুলি ক্ষুদ্রকণার একটি করে এ্যান্টী ক্ষুদ্রকণার অস্তিত্বও বর্তমান। এ্যান্টী আপ কেওয়ার্ক ($\bar{u}$), এ্যান্টী ডাউন কেওয়ার্ক ($\bar{d}$), এ্যান্টী চার্ম কেওয়ার্ক ($\bar{c}$) ইত্যাদি আবার এ্যান্টী ইলেকট্রন (e^+) যা পজিট্রন ভাবে পরিচিত, এ্যান্টী

ইলেকট্রন নিউট্রনে ($\bar{\upsilon}_e$) ইত্যাদি। চিহ্নের মাথায় মাত্রা থাকলে এ্যান্টী বোঝায়। এ্যান্টীদের সবই এক কেবল ইলেকট্রিক চার্জ বিপরীত। অতএব একটি সাধারণ কণা আর একটি ঐ কণাটির এ্যান্টীর আলিঙ্গনের ফল....BANG ব্যাঙ। ব্যাঙে দুটিরই বিনাশ। বিনাশে হয় কেবল শক্তির উৎপত্তি।

বিনাশ ঐ ব্যাপারটি কিন্তু নিউট্রিনোদের ক্ষেত্রে অপ্রযোজ্য। খাটে না। নিউট্রিনোদের বিনাশ নেই। ওরা অমর। সময় আর আকাশের সমন্বয়ে তৈরী বিশ্বের জীবনকালে ওরা অমর। বিগব্যাঙ্গ থেকে আরম্ভ করে নিউট্রিনো যত উৎপত্তি হয়েছে, হচ্ছে, হবে...বিশ্ব আঙিনায় এরা উপস্থিত থাকবে বিশ্বজীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্যন্ত। কারণ?

এদের ইলেকট্রিক চার্জ শূন্য। বিশ্বের সর্ব্বাপেক্ষা লঘু তর পদার্থ (এদের ভর সদ্য আবিষ্কৃত)।

এই জন্যে এরা কিছুর সঙ্গেই আলিঙ্গন করে না। মিলিত হয় না। কোন কিছুর দ্বারাই এদের গতি বাধাপ্রাপ্ত হয় না। কার্যত তোমার আমার, আমাদের আল্লাদের পৃথিবীর এমন কি বিশ্বের সমস্ত কিছুকে বিদীর্ণ করে অগুন্তি নিউট্রিনো নিজেদের গতি অব্যহত রাখে সর্ব্বস্থানে, সর্ব্বক্ষণে, সর্ব্বকালে।

উদ্বিগ্ন জয়ন্ত জোয়ার ছেড়ে উঠে উঠে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করে "দাদা তা হলে আমরা কি প্রতি মুহূর্তে ফুটো ফুটো হয়ে যাচ্ছি?

জয়ন্তের হাত ধরে আপনার আশ্বাস "ভয় নেই বন্ধু। নির্ভয়ে বস। মনে নেই আমি বলেছিলাম একটি পরমাণুর ৯৯.৯৯৯ শতাংশ শূন্য। গড়ে মানুষের দেহ $১০^{২৮}$ পরমাণুর দ্বারা গঠিত। এর ৯৯.৯৯৯ ভাগ শূন্য। জগতের সবকিছুর পক্ষেই এটি প্রযোজ্য। অতএব নিউট্রিনোর গমনাগমনের পথ অপ্রতিরুদ্ধ। তাই সুস্থিরে তোমার আসন-গ্রহণ কর আর হৃদয়নামে করার চেষ্টা কর এতক্ষণ যা বললাম।

চেয়ারে বসতে বসতে জয়ন্তের উত্তর "জী হুজুর। সরকার, আপ হি মেরে মালিক।"

"জয়ন্ত Man is a social animal। মানুষ সামাজিক জীব। ঠিক তেমনি কেওয়ার্ক সামাজিক পদার্থ। এরা কখনোই কোন অবস্থাতেই একলা থাকে না। এককভাবে কেওয়ার্কের চার্জ ভগ্নাংশে (২/৩, ১/৩)। সম্মিলিত ভাবে কেওয়ার্ক দ্বারা কোন গঠিত পদার্থের চার্জ সর্ব্বদা পূর্ণসংখ্যা (proton প্রোটন—অ, আ, ডা, ২/৩ + ২/৩- ১/৩ = ১) (নিউট্রন—আপ, ডা, ডা $\left(\frac{২}{৩}-\frac{১}{৩}-\frac{১}{৩}\right) = 0$))।

সম্মিলিত কোওয়ার্ক দ্বারা গঠিত পদার্থ কে বলা হয় Hardon যেমন প্রোটন, নিউট্রন।

বন্ধু এছাড়াও আরো একটি ক্ষুদ্রকণা অবস্থান করে আমাদের বিশ্বে। যাদের বলা হয় forse carrier particles বা বলের বাহন কণা।

বিশ্বের চারটি মৌলিক বলের (মাধ্যাকর্ষণ, Gravity, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোরস, স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোরস আর উইক নিউক্লিয়ার ফোরস)। বাহন কণাগুলি যথাক্রমে গ্রাভিটন (অদ্যপি পরিক্ষীত ভাবে প্রমাণিত নয়), ফোটন, গ্লুওন আর w^+w^-, z (উইক ফোরসের তিনটি বাহন কণা)। গ্রাভিটন, ফোটন এবং গ্লুওন ক্ষুদ্রকণার ভর শূন্য বা অত্যন্ত নগন্ন। w^+w^-, z ক্ষুদ্রকণা টপ কেওয়ার্কের পরই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুভর ক্ষুদ্র কণা।

পদার্থের মধ্যে বলের উদ্ভব হয় বলের বাহন কণাদের আদান প্রদানের ফলে।

বন্ধু গ্রাভিটনের মতই আরো একটি ক্ষুদ্র কণা রয়েছে পরিক্ষীত ভাবে প্রমাণিত হওয়ার অপেক্ষায়। হিগস্ বোসন। যে কোন পদার্থের ভর সঞ্চারের কারণ। ফোটন, গ্রাভিটন, গ্লুওন, ভরহীন অথচ w^+w^-, z ক্ষুদ্রকণা অত্যন্ত গুরুভর। এর কারণ? হয়ত এর কারণ হিগস ক্ষুদ্রকণার ক্রিয়া কলাপ।

অণুসন্ধান চলেছে দিনরাত। আশার কথা এই যে হতাশার বুক চিরে আবার আলো যেন উঁকি দিচ্ছে। অতএব উদগ্রীব অপেক্ষা।

ক্ষণেক কাল মৌন থাকার পর আপনার স্বরধ্বনি পুনরায় উচ্চারিত হল "জয়ন্ত বাবু তৈরি হও ক্ষুদ্র জগতের আজব দুনিয়ায় আরো একটি তাজ্জব ঘটনা শোনার জন্যে। particle decay। ক্ষুদ্রকণার রূপান্তরণ।

বললেন "আমি হয়েগেলাম তুমি। তুমি হয়ে গেলে ইণ্ডিয়ার PM। রাজা হল ফকির। ফকির হল ধনকুবের। দাসী হল মালিক। মালিক হল...

জয়ন্ত হাত তুলে আপনাকে থামাতে থামাতে ১ সেকেণ্ড, ১ সেকেণ্ড দাদা। আপনাকে একটা চিমটি কেটে দেখব? স্বামীজি কি স্বপনে?

না বৎস না। আমি ১০০ পারসেন্ট জাগরণে। অমূলক সন্দেহ ইন্দ্রিয়ের পক্ষে ক্ষতিকারক। আমি যা বলছি সেটাই বাস্তব। বরং আমরাই অবাস্তবের মোড়কে মোড়া। বাস্তব মোড়কের বাইরে।

ক্ষুদ্রকণার জগতে এক প্রকার রূপান্তর ঘটে প্রকৃতিগত ভাবে। Radioactive Decay। তেজস্ক্রিয় পদার্থের তেজস্ক্রিয় রশ্মির বিকিরণে ভিন্ন পদার্থের রূপান্তরণ। কোন পদার্থের পরমাণুর কেন্দ্রে যখন প্রোটন অথবা নিউট্রন অথবা

উভয় কণার অত্যধিক মাত্রায় উপস্থিতির কারণে পরমাণুর কেন্দ্রটিতে অস্থায়ী অবস্থার সৃষ্টি হয়। আরম্ভ হয় পরমাণুগুলির স্থায়ী অবস্থায় ফিরে আশার প্রচেষ্টা। যে পদ্ধতিতে স্থায়ী অবস্থায় ফেরা হয় সেইটিকে বলা হয় নিউক্লিয়ার ডিকে। Nuclear Decay

১) প্রোটন এবং নিউট্রন কণার সংখ্যাধিক্য, পরমাণুর কেন্দ্র হতে ২ টি করে প্রোটন এবং নিউট্রন কণার বিকিরণ হয়। (২টি p দুটি N হল হিলিয়াম-৪ এর কেন্দ্র) এই বিকিরণকে বলা হয় (α) আলফা রে বিকিরণ।

২) প্রোটন কণার সংখ্যাধিক্য, পরমাণুর কেন্দ্রস্থ প্রোটন কণাগুলি রূপান্তরিত হয় নিউট্রন কণায় এবং ফলস্বরূপ এ্যান্টি ইলেকট্রন বা পজিট্রন e^+ কণার বিকিরণ হয়। এবং নিউট্রনের বিকিরণ হয়।

অণুরূপে নিউট্রন কণার সংখ্যাধিক্য, পরমাণুর কেন্দ্রস্থ নিউট্রন কণা প্রোটন কণায় রূপান্তরিত হয় এবং ইলেকট্রন কণার বিকিরণ। এবং এন্টি নিউট্রিনো কলার বিকিরণ হয়।

এই বিকিরণ কে বলা হয় বিটা রে (β) বিকিরণ।

সর্ব্বশেষে গামা (γ) রে বিকিরণও সংঘটিত হয় তেজস্ক্রিয় পদার্থ হতে। গামা রে হল অধিক শক্তি সম্পন্ন ইলেট্রোম্যাগনেটিক বলের বাহন কণা ফোটনের বিচ্ছুরণ।

এই রশ্মীগুলি প্রচণ্ড গতিতে বিচ্ছুরিত হয়। তেজস্ক্রিয় বিকিরণ মাত্রই ক্ষতিকারণক। গামারে বিকিরণ সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষতিকারক। গামা রে র প্রতিরোধক মোটা সীসের চাদর (Block of Lead)।

আবার গুরুভর চার্ম কেওয়ার্ক রূপান্তরিত হয় কম গুরুভার স্ট্রেঞ্জ কেওয়ার্ক ক্ষুদ্রকণায় এবং এই পরিবর্তনের ফলে উৎপন্ন হয় আপকেওয়ার্ক এবং ডাউন কেওয়ার্ক।

এ অত্যন্ত আশ্চর্য্য ব্যাপার। নয় কি জয়ন্ত? একটি জিনিষ অন্য জিনিষ হয়ে যায়। উদ্ভব হয় নতুন নতুন জিনিষ। কেবল একটি কথা মনে রাখার জয়ন্ত 'সমস্ত আপাত দৃষ্টিতে ভূতুড়ে কাণ্ডকারখানায় শক্তির অক্ষয়তা নিশ্চিত থাকে। Law of conservation of energy remains enforced আপনি বললেন 'চল বন্ধু এবার প্রশ্ন উত্তরের পালা। আজকের সন্ধার আলোচনার প্রথমের দিকে তুমি একটা প্রশ্ন করেছিলে মনে আছে?

নিশ্চয় আছে দাদা। ফারমিওনস্ ক্ষুদ্রকণা ঠিক বলেছ জয়ন্ত। এই ক্ষুদ্রকণা পউলি এক্সক্লুসন প্রিনসিপাল মান্য করে।

একই প্রকারের ক্ষুদ্রকণাদের একই স্থানে অবস্থা করা অসম্ভব।

ক্ষুদ্র মৌলিক কণাদের ২টি শ্রেণীভেদ করা হয়। ফারমিওঅনস। (এনরিকো ফারমি আমেরিকান নাগরিক ছিলেন ইটালিয়ান জন্মগতভাবে) আর বোসন (সত্যেন্দ্র নাথ বোসের নামানুসারে) এই দুই প্রকারের ক্ষুদ্রকণা জগতের যাবতীয় পদার্থ, বল ইত্যাদি গঠন করে।

দুটি শ্রেণীর ক্ষুদ্রকণা ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম পালন করে। পওলি এক্সক্লুসম প্রিনসিপাল ফারমিওনস, পালন করে। বোসন করে না। ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন ফারমিওনস।

বিভিন্ন বর্ণের বাহন কণা ফোটন, গ্লুয়ন, w এবং z ক্ষুদ্রকণা, এরা সমস্ত বোসন।

ফারমিওনস আর বোসন এর ভিন্ন নিয়ম না থাকলে জয়ন্ত জগতের ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের প্রকার ভেদ থাকত না।

আপনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন "এই হল ক্ষুদ্র জগতের অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ।" জয়ন্ত ক্ষুদ্র জগতের বর্ণনা দিতে দিতে আমার মনে হচ্ছিল আয়তনে ক্ষুদ্রহলেও এদের নিজেদের মধ্যে মেলবন্ধন, নিয়মানুবর্ত্তিতা শিক্ষ্যনীয়। এদের ব্যাপ্তি বিশাল।

আমার wishfull thinking আমাদের মনটিও যদি এইসব ক্ষুদ্রকণাদের মত মিশুকে, উদার আর বিশাল হত? বুদ্ধদেবের এই গুণগুলি পুরো মাত্রায় ছিল। কতকিছু শেখা উচিৎ। শিখি না। কতকিছু জানা উচিৎ। জানি না। কতকিছু করা উচিৎ। করি না। কেবল না আর না।

এস জয়ন্ত মহামানুষের কাছে প্রার্থনা করি জীবনে যেন "না" থাকে না।

নবম অধ্যায়

প্রতিসমতা এবং সি এম বি

তাজমহল দেখতে গেছেন আপনি। সঙ্গে অণুগামী জয়ন্ত। তাজমহলের ঠিক পাশের হোটেলটায় উঠেছেন আপনারা। সারাটা দিন তাজমহলেই কেটেছে আপনাদের।

হোটেলটির পেছনের উদ্যানে একটি উচু মাটির ঢিপি আছে। ঢিপির ওপরে কয়েকটা চেয়ার টেবিল পাতা। Viewing gallery, তাজকে দেখার জায়গা। এত কাছ থেকে সম্পূর্ণ তাজকে দেখা এক বিরল অভিজ্ঞতা। বিশেষ করে জ্যোৎস্না রাতে।

জয়ন্ত কেমন দেখছ জ্যোৎস্নার আলোয় আলোকিত তাজমহলকে?

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর জয়ন্তের উত্তর "দাদা মনে হচ্ছে আজ কোজাগরী পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় চাঁদ মামা উদয় হয়েছেন কেবল রূপসী তাজকে আলো দিয়ে সাজাতে। দুর দুরান্তের শাহজাহানের দেখার সুবিধের জন্যে তাজকে আলোকিত করতে।

দাদা আপনার প্রশ্ন ছিল "কেমন দেখছ তাজমহলকে।

চাক্ষুস দর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে বলি আমার দেখা যাবতীয় দর্শনীয় স্থানের মধ্যে তাজ অন্যতম।

যদি প্রশ্ন করতেন কেমন feel করছ? কেমন লাগছে আমার?

জবাব দিতাম আমার অন্তরের দর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে এক কথায় স্বর্গীয়। সৌন্দর্য্য প্রদর্শনে কারুর মনকে একটি মাত্র বৈশিষ্ট্য নিবদ্ধ করা সম্ভব সেটি আজ উপলব্ধি করলাম।

স্বামীজীর কথায় "বিন্দুতে নিয়ে যাও মনকে"।

তাজমহল তার রূপের জৌলুসে কেবল মাত্র তাজে নিয়ে গেছে মনকে। সারা মন জুড়ে এখন কেবল তাজ আর তাজ।

দাদা জ্যোৎস্নার আলোই তাজকে দেখে এই আমার অণুভূতি। আপনার কেমন দেখছ প্রশ্নের উত্তর।

অনেকক্ষণ ধরে চুপচাপ তাজমহল দেখার পর আপনি বললেন "জয়ন্ত যতবার তাজমহল এসেছি অমি অবাক হয়ে দেখি কি ভীষণ রকম প্রতিসম (symmetrical) এই স্থাপত্য। প্রতিসমতার আর সূক্ষ্মতার শেষ কথা তাজমহল।

চারপাশের চারটি মিনার সহ প্রধান স্থাপত্যটি বলা যায় প্রতিসমতার সংজ্ঞা। Defination of Symmetry।

এই প্রতিসমতার বাতাবরনের মধ্যে জয়ন্ত আজ তোমায় আমাদের বিশ্বের প্রতিসমতার কথা বলব।

বিশ্বের প্রতিসমতা আজ পরীক্ষিত ভাবে প্রমাণিত। আর এই কথা মনে রেখো জয়ন্ত বিশ্বের প্রতিসমতার আবিষ্কার কসমোলজিক্যাল বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কারের মধ্যে অন্যতম আবিষ্কার।

জয়ন্তের অনুরোধ "দাদা প্রতিসমতা বা Symmety ব্যাপারটি যদি একটু খোসলা করে দেন।"

আপনি বললেন "উদাহরণ দিয়েই আরম্ভ করা যাক।

জয়ন্ত চিন্তা কর একটি গোলক, একটি Sphere। সর্ব্বদিশায় একটি গোলকের আকৃতি অপরিবর্তিত। উপর থেকে, নিচের থেকে, পাশ থেকে যে কোন দিক থেকেই গোলকটি দৃশ্যত এক। এমনকি জয়ন্ত গোলকটিকে তুমি হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করার পর একই জায়গায় রেখে দিলে, কেউই বুঝতেও পারবে না যে গোলকটি নাড়াচাড়া করা হয়েছে। একটি গোলক সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিসম। (A sphere is perfectly symmetrical) একটি সিলিণ্ডার কেবল একটি মাত্র দিশায় প্রতিসম। লম্বালম্বি দিশায়।

আমাদের বিশ্বটি সামগ্রিক ভাবে প্রতিসম। এই তত্ত্ব আজ পরীক্ষিত ভাবে প্রমাণিত।

অতএব জয়ন্ত বিশ্বের প্রতিসমতার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা কি বলতে পারি না বিজ্ঞানের তাবৎ সূত্র বিশ্বের সমস্ত স্থানে সমান ভাবে প্রযোজ্য? পৃথিবীতে, সূর্যে যেমন প্রযোজ্য, বহুদূরবর্তী কোনো নক্ষত্রমণ্ডলীও সমানভাবে প্রযোজ্য?

বিশ্বের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে মাধ্যাকর্ষণ বল ভিন্ন, তাপমাত্রা ভিন্ন, বায়ুমণ্ডলের চাপ (যেখানে বায়ুমণ্ডল বর্তমান) ভিন্ন। বিজ্ঞানের সমস্ত সূত্রেই এই বৈষম্যের প্রভাব অন্তরভুক্ত করা আছে।

আইস্টাইনের জেনারেল থিওরী অফ রিলেটিভিটি অনুসারে জগতের আকাশ আর সময়ের স্বচ্ছ কাঠামোটি সর্ব্বদা সচল এবং আয়তন সর্ব্বদা পরিবর্তনশীল। আইনস্টাইনের পূব্ববর্তীকালে ধারণা ছিল বিশ্বের আকার স্থির সামগ্রিক ভাবে সমস্ত বিশ্বটি স্থির এবং অনড়। বিশ্বে অস্তিত্ব চিরকালের, চিরদিনের। এর সৃষ্টি ও লয় দুইটি অবাস্তব এবং অবান্তর। অথচ তাঁর থিওরী অফ রিলেটিভিটি ঠিক এর বিপরীত মত পোষণ করে। বলে বিশ্বটি সর্ব্বক্ষেত্রে সর্ব্বক্ষণে সর্ব্বদিশায় সচল ও গতিশীল।

বিভিন্ন মহাকাশীয় বস্তু, নক্ষত্রমণ্ডলী, নক্ষত্রমণ্ডলী গুচ্ছ, ব্লাকহোল ইত্যাদির মাধ্যাকর্ষণের ফলে বিশ্বের সংকোচন এই মতামত যুক্তিসংগত। আইনস্টাইনের নিজস্ব ধারণাও ছিল তৎকালীন স্থির, অপরিবর্ত্তনশীল এবং চিরন্তর বিশ্বের মতবাদের স্বপক্ষে।

অত্যন্ত প্রতিভামান আইনস্টাইনের খুব বেশী দিন চিন্তা করার প্রয়োজন হয়নি স্থির অপরিবর্তনশীল এবং চিরন্তন মতবাদটিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে। অবতারণা করেন এক নতুন শব্দ কসমোলজিক্যাল কন্সট্যান্ট (Cosmological constant)। আকর্ষিত মধ্যাকর্ষণ বলের বিপরীত এক বিকর্ষিত বল। যে বল মাধ্যাকর্ষণের জন্যে বিশ্বের সংকোচনকে প্রতিহত করে। গাণিতিকভাবে তিনি তাঁর উদ্‌ভাবিত কসমোলজিক্যাল কন্সট্যান্টের একটি মানও নির্ণয় করেন। এমন একটি মান যা সমগ্র মাধ্যাকর্ষণ কে কাঁটায় কাঁটায় প্রতিহত করে। প্রমাণ করেন বিশ্ব স্থির, অপরিবর্ত্তনশীল ও চিরন্তন। এইভাবে মহাজ্ঞানী আইনস্টাইন চিন্তার অবশান ঘটিয়ে সুস্থির হন।

জয়ন্ত কিন্তু তাঁর এই সুস্থিরতা ছিল অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। মাত্র কয়েক বছর।

জয়ন্তের প্রশ্ন : মাত্র কয়েক কয়েক বছর কেন দাদা?

আপনার জবাব: কারণ মার্কিন নাগরিক এডোমাণ্ড হাবেলের যুগান্তকারী আবিষ্কার। আবিষ্কারটি হল ব্রহ্মাণ্ডের সম্প্রসারণ। সর্ব্বদিশায় এবং সর্ব্বক্ষণে সম্প্রসারণ। সাল ১৯২৯।

স্থান—উইলসন মানমন্দির। ক্যালফোর্নিয়া। যন্ত্র-১০০ ইঞ্চ দূরবীক্ষণ যন্ত্র। হববল সাহেব দৃশ্যত প্রমাণ করেন নক্ষত্র মণ্ডলীগুলির পরস্পরের দূরত্বের সম্প্রসারণ। দূরত্বের সম্প্রসারণের গতি দুরত্বের অনুপাতিক। অধিক দূরত্ব, অধিক সম্প্রসারণের গতি। নিকট দূরত্ব, মৃদু সম্প্রসারণের গতি। এখানে উল্লেখ করা উচিত যে কোন নক্ষত্রমণ্ডলীর অন্তরবর্তী অংশের সম্প্রসারণ হয় না। কারণ তুলনায় অধিক মাধ্যাকর্ষণ বলে বিশ্বের সম্প্রসারণকে প্রতিহত করে। আয়তনে মিল্কিওয়ে বর্দ্ধিত হয় না।

হববাল সাহেবের এই পরীক্ষামূলক প্রমাণের পর আইনস্টাইন তাঁর মহামূল্যবান থিয়োরী অফ রিলেটিভিটির সূত্রগুলি থেকে এবং সমীকরণগুলির থেকে cosmological constant শব্দটি অপসারিত করেন। সকলকে বলেন কসমোলজিক্যাল কন্সট্যান্টের সমস্ত ব্যাপারটি যথাশীঘ্র স্মৃতির অন্তরালে নিক্ষেপ করতে।

জয়ন্ত মনে রাখবে হবল সাহেবের সম্প্রসারিত বিশ্বের থেকেই Big bang থিয়োরীর উৎপত্তি।

হববাল সাহেবের আবিষ্কার—ব্রহ্মাণ্ডের সম্প্রসারণ। সর্ব্বক্ষণে, সর্ব্বদিশায়। অতএব এই সম্প্রসারণের পশ্চাৎধাবন করে বলা যায় ব্রহ্মাণ্ডের আজকের আয়তন

গতকালের আয়তনের তুলনায় অধিক। একই যুক্তিতে বলা যায় না কি যে ব্রহ্মাণ্ডের আয়তন ১ বছর পূর্বে, ১ কোটি বছর পূর্বে, এক হাজার কোটি বছর পূর্ব্বে ক্রমান্বয়ে ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতর ছিল? এই ক্ষুদ্র হওয়ার শেষ সীমা বিন্দু। বিন্দু হতে উৎপত্তি বিশ্বের। ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম বিন্দু। শূন্য থেকে বিন্দু।

Bing Bang বা বড় বিস্ফোরণ। কথাটি অধুনা সর্ব্বজন বিদিত। ১৯৫০ সালে ইংরেজ পদার্থ বিজ্ঞানী ফ্রেড হয়েল (FRED HOYLE) Big Bang শব্দটি কয়েন করেন।

মহামান্য আইনস্টাইনের জেনারেল রিলেটিভিটি এবং এডোয়ার্ড হবলের সাম্প্রসারিত বিশ্বের থিয়োরীর সফল প্রয়োগের ফল "বিগ ব্যাঙ থিওরী"।

Big Bang থিওরী বিশ্বের ভিত স্থাপন করে। হাবল সাহেবের বিশ্ব সম্প্রসারণের থিওরী Big Bang থিওরীর ভিত স্থাপন করে।

স্ট্যান্ডারড বিগ বিগ থিওরী বিগ ব্যাঙের ব্যাঙটির যথার্থ এবং বিশদ বিশ্লেষণে ব্যর্থ। এটি স্ট্যান্ডারড বিগ ব্যাঙ থিয়োরীর একটি বড় অক্ষমতা। কি কারণে ব্যাঙ? কোথায় ব্যাঙ? কখন ব্যাঙ? কত বড় ব্যাঙ? কতক্ষণ পর্য্যন্ত ব্যাঙ? এই সব প্রশ্নের ব্যাপারে স্ট্যাণ্ডারড বিগ ব্যাঙ থিয়োরী নির্ব্বাক।

বিশ্ব ইতিহাস, সৃষ্টির মূলে মহা মূল্যবান বিন্দুটির উৎপত্তির ব্যাপারটি আমাদের ধরিত্রীর তাবৎ কসমোলোজিস্টদের কাছে সম্পূর্ণভাবে রহস্যাবৃত। অদ্যপি রহস্যাবৃত।

বিগ ব্যাঙ কেবল ব্যক্ত করে আকাশ ও সময়ের যাত্রা আরম্ভক্ষণে তাদের আকৃতির ব্যাপারটি। পূর্ব্ব ইতিহাস সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। কেবল বলা হয় বিশ্বের কোন প্রকার অস্তিত্বও ছিল অনুপস্থিত।

জয়ন্ত তুমি, আমি, আমরা মানুষেরা ঠিক এইভাবে চিন্তা করতে অনভ্যস্ত। শূন্য থেকে বিন্দু অসম্ভব। অবাস্তব। বিজ্ঞানের মতেও অসম্ভব।

বিন্দুবিশ্বের বিজ্ঞানের ওপর সামান্য আলোকপাত করতেও আধুনিক বিজ্ঞান অসমর্থ। বলাউচিত এখনও অসমর্থ। কারণ আইনস্টাইনের জেনারেল থিয়োরী এবং কোয়ানটাম থিয়োরীর মধ্যে অসঙ্গতি।

রিলেটিভিটি থিয়োরী বৃহৎ এবং ভারী বস্তুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তারা, নক্ষত্রমণ্ডলী, নক্ষত্রমণ্ডলীগুচ্ছ আলোক বর্ষ দুরত্ব।

কোয়ানটাম মেকানিকস্ মেকানিকস্ ক্ষুদ্র এবং লঘু বস্তুর প্রযোজ্য। অণু পরমাণু কণাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

জয়ন্ত বৈজ্ঞানিকদের অসুবিধে এই যে এই দুটি থিয়োরীকে একই সঙ্গে যৌথ ভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি।

সাধারণতঃ প্রয়োজন হয় না দুটি থিওরীর সমীকরণগুলিকে যৌথভাবে ব্যবহার করার। যেখানে গুরুভর এবং ক্ষুদ্র আয়তনের সহবাস যেমন ব্লাক হোলের কেন্দ্রস্থল, বিশ্বের জন্মক্ষণে, রিলোটিভিটি এবং কোয়ানটাম মেকানিকসের

সমীকরণগুলির যুগ্ম ব্যবহারদের প্রয়োজন হয়।

সমস্যা এই যে সমীকরণগুলির যুগ্ম ব্যবহারে যে উত্তর পাওয়া যায় তা সম্পূর্ণভাবে অর্থহীন। গণিতের ভাষায় উত্তরটিকে বলা হয় ইনফিনিটি। Infinity। সমস্ত বিজ্ঞানীদের সর্ব্বাধিক অপছন্দের উত্তর। ইনফিনিটিকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেন সবাই। এই ইনফিনিটি একটি গবেষণার অগ্রগতিতে রুদ্ধ করে।

আশাকরা যায় অদূর ভবিষ্যতে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে। বিগ ব্যাঙ থিয়োরীর ব্যঙ এর পরিচয় উন্মোচিত হবে। ব্ল্যাক হোলের কেন্দ্রস্থলে মানুষের জ্ঞানের আলো প্রসারিত হবে।

কসমিক মাইক্রোওয়েভ ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশন

১৯৬৪ সালে জার্মানীয় জন্মভূতমাকীর্ণ নাগরিক রেডিও ইনজিনিয়ার আরনো এ্যালেন পেনজিয়াস (Arno Allan penzias), ইনজিনিয়ার মাকীর্ণ নাগরিক বরার্ট উডরো উইলসন (Robert woodrow wilson) এবং রাসিয়ান বৈজ্ঞানিক পয়ট্র লিওনিডোভিচ্ কাপিটসা (PYOTR LEONIDOVICH KAPITSA) সমস্ত মহাকাশময় বিস্তৃত একটি তেজক্রিয় রশ্মি (radiation) আবিষ্কার করেন। রেডিয়েশনটি মাইক্রোওয়েভ গণ্ডীতে সর্ব্বাধিক স্পষ্ট। লং ওয়েভ লেন্থ ইলেকট্রোম্যাগনেটিভ ওয়েভকে মাইক্রোওয়েভ বলা হয়। এই ওয়েভ লাল আলোর ওয়েভ লেন্থ হতে দীর্ঘ। মানুষের চোখে দৃশ্যমান নয়। মাইক্রোওয়েভ আভেনের চালু অবস্থায় অভ্যন্তরের মাইক্রোলয়েভের নৃত্য আমরা দেখতে পাই না। কেবল মাত্র মাইক্রোওয়েভ ডিকেটটারে এর উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া যায়।

এই বিজ্ঞানীরা কেবলমাত্র মহাকাশে মাইক্রোওয়েভের অবস্থানই প্রমাণ করেননি। ওনারা একটি অত্যন্ত আশ্চর্য্য ব্যাপার লক্ষ্য করেছিলেন। সমস্ত মহাকাশে এই রশ্মির বিচ্ছুরণের মান প্রায় সম্পূর্ণভাবে সমান। সর্ব্বব্যাপি এবং সর্ব্বদিশায় এর বিস্তার। MICROWAVE RADIATION IS ISOTROPIC AND UNIFORM।

এই তিন বৈজ্ঞানিক তাঁদের এই অবিষ্কারের জন্যে ১৯৭৮ সালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করে যৌথভাবে।

মহাকাশজুড়ে মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গের বিস্তারটির নামকরণ করা হয়েছে "কসমিক মাইক্রোওয়েভ ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশন"। Cosmic Microwave microwave background radiation (CMB)

জয়ন্ত, বিশ্বের জন্ম রহস্যের সমাধানে (CMB) এর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জয়ন্ত আমার মনে হয় আধুনিক মহাকাশ বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার (CMB)। কেন শ্রেষ্ঠ? শোন তবে। জন্মক্ষণে বা Big Bang এর সময় বিশ্বের আয়তন ছিল ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম বিন্দুর আয়তনের সমান। ঘনত্ব ছিল ঘনত্ত্বের শেষ সীমায়। তাপমাত্রা ছিল তাপমাত্রার শেষ সীমায়।

জয়ন্ত বিশ্বের বয়স তখন সবে তিন লক্ষ বছর। সেই তপ্ত বিশ্বের উত্তাপের বিকিরণ গামা রে তরঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে বিশ্ব গগনের সর্ব্বস্থানে। বিশ্বের সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে গামা রে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যও সম্প্রসারিত হতে থাকে। আজকের বিশ্বে ঐ সম্প্রসারিত তরঙ্গ মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে ছড়িয়ে আছে বিশ্বগগনের অনন্ত সীমানায় (রঙিন ছবি নং ৮)।

মানুষের চোখে মাইক্রোওয়েভ আলো দেখা যায় না। আমেরিকার নাশা NASA কর্তৃক উৎক্ষেপিত মাইক্রোওয়েভ অনুসন্ধানকারী ক্যামেরা, নাম WMAP (wilkinson Microwave Anisotrophy Probe)। ক্যামেরাটি মহাকাশে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ রত। WMAP এর গৃহীত ছবিতে সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত বিশ্বের সর্বত্র মাইক্রোওয়েভ বিকিরণের বিস্তার সমান, Uniform। বলা উচিত প্রায় সমান। জয়ন্ত বিশ্বের সর্বদিগন্তে মাইক্রোয়েভে রেডিয়েশনের জন্য আমরা নিঃসন্দেহে এই সিদ্ধান্ত উপনিত হতে পারি যে আমাদের বিশ্বটি সামগ্রিক ভাবে প্রতিসম।

আকাশে মাইক্রোওয়েভ রেডিয়েশনের পরিমাণ ২.৭২৫ ডিগ্রি কেলভিন। সারা বিশ্বে এই পরিমাণটির বৈষম্য ১ হাজার ভাগে ১ ভাগ মাত্র। অতএব বুঝতেই পারছ জয়ন্ত কত ভীষণ ভাবে প্রতিসম Uniform আমাদের বিশ্বের গঠন।

জয়ন্ত আবার বলছি এটি কসমোলজি বিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে আধুনিক কালের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার জয়ন্ত।

সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ এই বিকিরণ। টিভিতে কোন সম্প্রসারণ না হওয়া চ্যানেলে যে স্নো দেখা যায় সেটিই কসমিক মাইক্রোলয়েভ ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশন। যে হিস্ হিস্ আওয়াজ শুনতে পাও সেটি CMB র আওয়াজ।

CMB কসমোলজিস্টদের ব্রহ্মাণ্ডের শৈশবের রূপ, ব্রহ্মাণ্ডের গড়ন ব্রহ্মাণ্ডের ব্যবহার ইত্যাদির গবেষণায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি প্রদান করে (রঙিন ছবি নং ৯)।

এই রেডিয়েশনের সমান তাপমাত্রা প্রমাণ করে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিক্ষণ থেকে প্রচণ্ড উত্তাপের হ্রাস পাওয়ার পরিমাণ সর্ব্বত্র সমান। উত্তাপের হ্রাস পাওয়ার পরিমাণ সমান কারণ ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বস্থানের একই প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্যে অতিবাহিত হওয়া। এই ভাবেই প্রমাণ করা যায় জাগতিক বলগুলির সমরূপ বিস্তার। প্রমাণ করা যায় সময়ের প্রবাহের সমতা।

আধুনিক মহাকাশ বিজ্ঞানীদের মতানুসারে বিশ্বের বয়স ১৩৭০ (এক হাজার তিনশ সত্তর) কোটি বছর। কমবেশি এক শতাংশ। প্রত্যক্ষ ভাবে এই বয়স প্রমাণ করা অসম্ভব। যদিও পরোক্ষ ভাবে এটি প্রমাণিত এবং অধিকাংশ মহাকাশ বিজ্ঞানীর দ্বারা স্বীকৃত।

জয়ন্ত এই বয়সের ব্যাপারে একটি প্রশ্ন থাকা অত্যন্ত স্বাভাবিক।

কার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বের এই বয়স? পৃথিবীর পরিপ্রেক্ষিতে? এ্যানড্রোমেডো

ছায়ামণ্ডলীর পরিপ্রেক্ষিতে? কোনো ছায়ামণ্ডলীগুচ্ছের কোন ছায়ামণ্ডলীর পরিপ্রেক্ষিত? কি নিশ্চয়তা আছে যে পৃথিবীর ঘড়ী আর হাজার কোটি আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত কোন ছায়ামণ্ডলী ঘড়ী একই সময় নির্দ্ধারিত করে? মিল্কিওয়ে ছায়ামণ্ডলীতে এবং উড়ালপুল ছায়ামণ্ডলীও সময়ের প্রবাহ কি সমান?

আপনি বললেন "চিন্তা করে দেখ জয়ন্ত এই সব প্রশ্নগুলি বিশ্ব পরিচয় উন্মোচনের পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত মূল্যবান প্রশ্ন। হয়তো বা বলা যায় মৌলিক প্রশ্ন।

কসমিক মাইক্রোওয়েভ ব্যাক গ্রাউন্ড রেডিয়েশন আবিষ্কারের পূর্ব্বে কসমোলজিস্টদের পক্ষে কোন নিশ্চিত উত্তর দেওয়া সম্ভব ছিল না এই প্রশ্নগুলির।

জয়ন্ত আমরা জানি জন্মক্ষণে বিশ্বের তাপমাত্রা ছিল তাপমাত্রার শেষ সীমায়। CBM প্রমাণ করে আজকের বিশ্বের সময়ের তালে তালে শীতল হওয়ার হার বিশ্বব্যাপী সর্ব্বকালে সমান এবং একরূপ।

মনে রাখবে জয়ন্ত CMB আবিষ্কার হতে এই তথ্য প্রাপ্তি এক অত্যন্ত মূল্যবান প্রাপ্তি। It is a very inportant derivation।

জয়ন্ত বলে "দাদা আপনার কথা বলার ধরণ দেখে বুঝতে পারছি "আমাদের বিশ্বটির শীতল হওয়ার হার "uniform" ব্যাপারটির মূল্য অসীম। কেন এত মূল্যবান এই তথ্য।

আমার পরবর্তী আলোচনার এর উত্তরটি আপনা আপনি বেরিয়ে আসবে জয়ন্ত। বিশ্বের পরিবর্তনের মানকে সময়ের প্রবাহ বলা যায়।

জয়ন্তের প্রশ্ন : দাদা বুঝলাম না কি বললেন। আপনার জবাব। দার্শনিক ভাবে বা ধর্ম্মিয় ভাবে সময়ের সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব। বিজ্ঞানের পরিভাষায় সময়ের সংজ্ঞা অলভ্য। তবে বিশ্বের জন্মক্ষণটি বা বিগ ব্যাঙের ঘটনাটিতে কসমোলজিতে "সময় শূন্য" হিসেবে ধরা হয়। ধরা হয় বিশ্ব সময়ে যাত্রারম্ভ বিগ ব্যাঙে। অতঃপর নিদেনপক্ষে কসমোলজির পরিভাষায় বিশ্বের পরিবর্তনের মানকে সময়ের প্রবাহ হিসেবে ধরা যায়।

CMB সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণ করে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের পরিবর্তন বিশ্বের সর্বস্থানে সমরূপ। বিশ্বের ক্রমবিবর্তন সর্ব্বকালে এবং সর্বস্থানে সার্বিক ভাবে সমান। অতএব জয়ন্ত আমরা এই মতবাদ পোষণ করতে পারি বিজ্ঞানের সূত্রগুলি বিশ্বের সর্বস্থানে সমানভাবে প্রযোজ্য।

পৃথিবীতে সূর্যে, উড়ালপুল নক্ষত্রমণ্ডলীতে বা ওমেগা সেনটাউরিয়ে (omega cantanri, ১৭০০০ আলোকবর্ষ দূরে অতি পুরাতন ১০০০কোটি বছরেরও অধিক বয়সের আকাশ গঙ্গা নক্ষত্রমণ্ডলীর একটি বিশাল নক্ষত্রগুচ্ছ।) অথবা হাইড্রা নক্ষত্রমণ্ডলী গুচ্ছে একই ভাবে পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রগুলি প্রযোজ্য। অতএব সময়ের প্রবাহ বা ঘড়ী চলার গতি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র সমান। বিশ্বের বয়স ১৩৭০ কোটি বছর পৃথিবীর পরিপ্রেক্ষিতে, আবার উড়ালপুল নক্ষত্রমণ্ডলীর পরিপ্রেক্ষিতে অথবা

হাইড্রা নক্ষত্রমণ্ডলী গুচ্ছের পরিপ্রেক্ষিতে এক। বিশ্বের সর্ব্বস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে অপরিবর্তনীয়।

জয়ন্ত তোমার হয়ত মনে হতে পারে বিশ্বের প্রতিসমতার ব্যাপারটি সঠিক নয়। তোমার পদতলের দৃশ্য এবং উর্দ্ধলোকের দৃশ্য ভিন্ন। ভূমি আর আকাশ, সম্পূর্ণ অসাদৃশ্য।

নীলাভ পৃথিবী, ধুসর চন্দ্রমা, লাল মঙ্গল, বিশাল বৃহস্পতি, শনির বলয়, সবুজ নেপচুন, নীলাভ ইউরেনাস, ক্ষুদ্র প্লুটো আর সর্বপরি জ্বাজ্জল্যমান সূর্য। বিভিন্ন গ্রহের ভিন্ন সংখ্যার উপগ্রহ। তাপমাত্রা ভিন্ন, আবহাওয়া ভিন্ন, মাধ্যাকর্ষণ ভিন্ন, গতিবেগ ভিন্ন, গতিপথ ভিন্ন। আকারে, আয়তনে, বর্ণে, অবস্থানে, আচারে, ব্যবহারে সাদৃশ্যের অভাব। কোথায় প্রতিসমতা? সর্ব্বত্র অপ্রতিসমতার ছয়লাপ।

জয়ন্ত এই অপ্রতিসমতা মনে হওয়ার কারণ বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের এটি এক অতি ক্ষুদ্র স্থানীয় দৃশ্য। স্থানীয় দৃষ্টিকোন থেকে পরিলক্ষিত করা।

বিশ্বের প্রতিসমতা মহাকাশ বিজ্ঞানীদের কাছে, কসমোলজিস্টদের কাছে সম্পূর্ণভাবে স্বীকৃত এবং পরীক্ষিত ভাবে প্রমাণিত।

জয়ন্ত চিন্তা কর ভবিষ্যতে তোমার কোন কসমোলজিস্ট বংশধর মহাকাশ গবেসণার উদ্দেশ্যে গভীর মহাকাশে এক মানমন্দির নির্ম্মান করেছেন। তিনি তাঁর চতুঃপাশের দৃশ্য দেখবেন সামগ্রিক ভাবে প্রতিসম। তিনি দেখবেন তাঁর উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিমদিকের...। ভুল বললাম জয়ন্ত। সম্পূর্ণ ভুল। বলতে পার কেন ভুল?

জয়ন্ত বলে "কোনটা ভুল দাদা? পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ দিকের ব্যাপারটি? সুদূর মহাকাশে হয়ত দিক ভিন্ন। আয় কি?

আপনি বললেন না জয়ন্ত তায় নয়। ভেবে দেখে সুদূর মহাকাশে পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ বা কোন দিকেরই কোন ভেদাভেদ নেই।

সূর্যোদয় নেই। সূর্যাস্ত নেই। দিন নেই। রাত নেই। সূর্য কোথায়?

বঙ্গললনাটি তাঁর দূরবীক্ষণ যন্ত্রে দেখবেন সম্পূর্ণ কৃষ্ণবর্ণের আকাশ। আকাশের মধ্যে অগুন্তি নক্ষত্রের, নক্ষত্রমণ্ডলীর পরস্পর হতে দূরে সরে যাওয়ার দৃশ্য। (মনিটারের ফাস্ট ফরোয়ার্ড করে দেখবেন)।

জয়ন্ত তোমার গ্রেট, গ্রেট, গ্রেট, গ্রেট, গ্রেট... নাতি অথবা নাতনী তাঁর গভীর মহাকাশের মানমন্দির থেকে আমাদের সৌর মণ্ডলটির দেখতে পাবেন কি? হয়ত পারবেন। তখনকার উন্নত প্রযুক্তিতে হয়ত পারবেন।

তোমার তস্য নাতি বা নাতনি দেখবেন দূরবর্তী ছায়ামণ্ডলী গুলির দূরে সরে যাওয়ার গতি নিকটবর্তী ছায়ামণ্ডলী দূরে সরে যাওয়ার গতির তুলনায় অনেক দ্রুত। তাঁর মানমন্দিরের সর্ব্বদিকে তিনি একই দৃশ্য দেখবেন। মানমন্দিরটির রকেট চালিয়ে মানমন্দির টিকে কয়েক কোটি আলোকবর্ষ দূরে স্থাপন করলেও তিনি একই দৃশ্য দেখবেন। ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বস্থলে একই দৃশ্য দেখবেন। বাঙ্গালী বাবুর হয়ত মনে পড়বে

কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বের তুলনায় অতি সামান্য শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ভূপৃষ্ঠ হতে এডোয়ার্ড হাবলের অবিস্মরণীয় আবিষ্কার। মনে মনে হাবল সাহেব কে নমস্কার জানাবেন।

সম্প্রসারিত ব্রহ্মাণ্ড, হাবল সাহেবের আবিষ্কার সামান্য আলোচনার অবকাশ রাখে।

যশস্বী এ্যালবাট আইনস্টাইনের রিলেটিভিটি থিয়োরী অনুযায়ী আকাশ আর সময়ের সমন্বয়ে তৈরী বিশ্বের কাঠামোটি কখনই জড় এবং স্থির নয়। rigid এবং fixed নয়। বিশ্বের কাঠামোটি নমনীয় এবং চিরগতিশীল। Flexible and dyanmic। রবারের মত। বল প্রয়োগে অথবা শক্তির সংস্পর্শে কাঠামোটির আকার এবং আয়তনের পরিবর্তন হয়। কাঠামোটিকে দোমড়ান যায়, মোচড়ান যায়, সম্প্রসারিত করা যায়। সংকুচিত করা যায়। এমনকি বল এবং শক্তির অসীমত্তে কাঠামোটিকে বিদীর্ণ করাও সম্ভব। ব্ল্যাক হোল সম্ভবত কাঠামোটিকে বিদীর্ণ করে।

কসমোলজিস্টরা বিশ্বের আয়তনের বিস্তার ব্যাপারটির একটি সুন্দর উদাহরণ দিয়ে থাকেন। একটি কেক তৈরী উদাহরণ। একটি ফ্রুট (Fruit) কেক তৈরী করার উদাহরণ।

উৎসাহিত জয়ন্তের প্রতিক্রিয়া : দাদা ফ্রুট কেক? আহা বলুন বলুন।

আপনি বললেন "তোমার ফ্রুট কেকের ওপর এত স্পৃহা জানতাম না তো। দাঁড়াও এই হোটেলটার নিজস্ব বেকারীর ফ্রুট কেক তোমায় খাওয়াই। অপূর্ব এদের কেক। জীবনে ভুলতে পারবে না এর স্বাদ।

বেয়ারাকে কেকের অর্ডার দেওয়ার পর বললেন আমি জানি তোমার রান্না করার শখ আছে। জানিনা বেক্‌ড (Baked) প্রডাক্টও তৈরি কর কিনা। হয়ত এতেও তুমি সিদ্ধহস্ত।

জয়ন্ত কেক তৈরীর সময়, বিশেষ করে ফ্রুট কেক তৈরী করার সময় শুকনো ফল মেশান ময়দার তালটির কথা চিন্তা কর।একটা কাগজে হাতে এঁকে বললেন, "বেকিং এর পাত্রে দেওয়ার পর ময়দার তালটি কিছুটা এই রকম। তাই না? লক্ষ্য কর সমস্ত ময়দার তালটিতে শুকনো ফলগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সার্বিক ভাবে সমরূপে।

আরেকটা ছবি এঁকে জয়ন্তকে দিয়ে বললেন এটি হল জয়ন্ত তোমার তৈরী কেক বেকিং-এর পর। শুকনো ফল সমেত ময়দার তালটি ফুলে ফেঁপে ঢোল।

আপনি : জয়ন্তবাবু বলতো দুটো ছবির মধ্যে পার্থক্য কোথায়?

জয়ন্তর উত্তর— "তৈরী কেকের volume বেশি।"

আপনি : কেবল কি তাই? লক্ষ্য কর শুকনো ফলগুলির পরস্পরের মধ্যে সমানুপাতিক হারে দূরত্বের বৃদ্ধি। এইটাই Central point of oboervation my friend সমানুপাতিক হারে দূরত্বের বৃদ্ধি।

বিশ্বের সম্প্রসারণের ব্যাপারটিও অনুরূপ। আকাশ আর সময়ের সমস্যায়ে তৈরী বিশ্বের কাঠামোটি ভাবতে হবে কেক আর কেকের মধ্যে শুকনো ফলগুলি হল নক্ষত্রমণ্ডলী।

চিন্তা করে দেখ জয়ন্ত কেকটির বেকিং-এর সময় শুকনো ফলগুলির পারস্পরিক দূরত্বের বৃদ্ধি হয়। এই সময় যে কোন একটি শুকনো ফলের পরিপ্রেক্ষিতে অন্য একটি শুকনো ফলের সঙ্গে দূরত্বের বৃদ্ধির হার আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, নির্ভর করে দুটি শুকনো ফলের দূরত্বের ওপর। আপাতদৃষ্টিতে কোন একটি নির্দিষ্ট ফলের পরিপ্রেক্ষিতে মনে হয় যত অধিক দূরত্ব তত অধিক দূরত্ব বৃদ্ধির হার। তাই না বন্ধু?

বিশ্বের মঞ্চটিতেও প্রায় একই ঘটনা ঘটে। খেয়াল করার ব্যাপারটি এই যে বিশ্বমঞ্চের বাইরের দিকে অবস্থিত গ্যালাক্সিদের তাদের অবস্থানের কারণে সম্প্রসারণের হার বা সম্প্রসারণের গতি অধিক। আপাতদৃষ্টিতে অধিক। যেমন কেকের বাইরের দিকে অবস্থিত শুকনো ফলগুলি বেকিংয়ের সময় অধিক দূরত্ব অতিক্রম করে। অতএব এদের গতি ভেতরের দিকে অবস্থিত শুকনো ফলগুলির গতির তুলনায় অধিক।

বিশ্বের সম্প্রসারণের পটভূমিকায় এই ধারণা ভ্রান্ত। বিশ্বের ক্ষেত্রে কেকের মত বাইরের দিকে নক্ষত্রমণ্ডলী বা ভেতরের দিকে নক্ষত্রমণ্ডলী এই ধারণা ভুল। মনে রাখা দরকার বিগব্যাঙে সমস্ত বিশ্বের মঞ্চটির একই সময় সমরূপে উদ্ভাসিত। যখন বলা হয় কোন নক্ষত্রমণ্ডলীর দূরত্ব ১০০০ কোটি আলোকবর্ষ তখন এই ধারণা হওয়া স্বাভাবিক ঐ নক্ষত্র যেহেতু বিশ্বের সীমানার অন্তিম সীমানায়। এই ধারণা ভুল। বন্ধু সম্পূর্ণ ভুল। মনে রাখা দরকার বিশ্ব সীমানা হীন। আমরা জানি কেবল বিশ্বের আকার Flat চ্যাপ্টা। ঐ পর্যন্ত আমাদের জ্ঞান। এটি আয়তকার না বার্গাকার জানানেই কারুরই। সত্যি কথা বলতে কি জয়ন্ত জানার প্রয়োজনও নেই। ব্রহ্মাণ্ডের ভবিষ্যতের পরিণতির নির্ভর করে যেটির ওপর তা আমরা আজ জানি। আমরা জানি ব্রহ্মাণ্ডটি বক্রতাহীন চ্যাপটা ব্রহ্মাণ্ড। NO CURVATURE UNIVERSE

ব্রহ্মাণ্ডে সর্ব্বদা নতুনের জন্ম, পুরাতনের মৃত্যু। সৃষ্টি আর লয়। একই মঞ্চের মধ্য অবস্থান আমাদের পৃথিবীর আর ঐ ১০,০০০ কোটি নক্ষত্রমণ্ডলীর।

খেয়াল করার ব্যাপার বন্ধু ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তির উপরান্তে নতুনভাবে কোন শক্তি ব্রহ্মাণ্ড মঞ্চটিতে যুক্ত করা হয়নি। ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত পদার্থের মুলে শক্তি। তাই আমরা বলি conservation of energy। energy can not be created nor can be destroyed...

অতএব মৌলিক ভাবে কোন নক্ষত্রের জন্ম হওয়ার ধারণা ভ্রান্ত। ভাঙ্গা গড়ার বিশ্ব আমাদের।

অতএব কোন দূরবর্তী নক্ষত্রমণ্ডলীর পরিপ্রেক্ষিতেও আমাদের নক্ষত্রমণ্ডলীটির

দূরে সরে যাওয়ার গতি নির্ভর করে পারস্পারিক দূরত্বের ওপর।

ব্রহ্মাণ্ডের কোন অংশই বিশেষ একটি অংশ, অদ্বিতীয় (Unique) এই ধারণা করা ভুল।

আমাদের নক্ষত্রমণ্ডলী আকাশগঙ্গা হয়ত বা কোন এক অতিদূরবর্তী নক্ষত্রমণ্ডলীর ভগ্নাবশেষে তৈরী।

জয়ন্ত অনুমান করা দরকার কেবলমাত্র কেকটিই বিশ্বের মঞ্চ, যেটি সদা স্ফীতমান। বিশ্বের যা কিছুর অবস্থান, যা কিছু ঘটনা সবই ঐ আকাশ আর সময়ের সমন্বয়ে তৈরী বিশ্ব মঞ্চের অভ্যন্তরে। আমাদের জ্ঞানের পরিধি বিশ্বের ঐ মঞ্চের অভ্যন্তরে। অতএব কিশের মধ্যে বা কার মধ্যে বিশ্ব মঞ্চটির সম্প্রসারণ অথবা বিশ্বমঞ্চটির বহিঃভাগে কি জিনিষের অবস্থান এই সব প্রশ্ন অর্থহীন, অবান্তর প্রশ্ন।

স্ট্যাণ্ডার্ড বিগ ব্যাঙ থিয়োরীর মতানুসারে বিগ ব্যাঙ বিশ্বের জন্মক্ষণ। জন্ম-স্থান ব্যাপারটি অর্থহীন। কেন অর্থহীন বুঝতে পারছ জয়ন্ত?

দাদা আকাশের স্থানের (space) জন্ম তো ঐ একই ক্ষণে। যদি বলিক্ষণ আর স্থান যমজ তবে কি খুব ভুল বলা হয়?

সুন্দর বলেছো ভাইয়া। স্থান আর ক্ষণ যমজ। একই সঙ্গে দুটির জন্ম বিগ ব্যাঙে।

জয়ন্ত আমাদের বিশ্ব পর্য্যবেক্ষণের স্থান পৃথিবী অথবা পৃথিবীর নিকটবর্তী মহাকাশে স্থাপিত উপগ্রহ। আমরা নিরিক্ষণ করি পৃথিবীর চতুর্দিক হতে নক্ষত্রমণ্ডলীগুলির সম্প্রসারণের দৃশ্য। অতএব এই সিদ্ধান্তে উপনিত হওয়া স্বাভাবিক বিগব্যাঙর উৎপত্তির স্থান বিশাল বিশ্বের মধ্যে আমাদের পৃথিবী। জয়ন্ত এই সিদ্ধান্ত ভুল, ভ্রান্ত। নক্ষত্র মণ্ডলীর সম্প্রসারণ বিশ্বের সর্ব্বদিশায়। Isotropic expansion.

জয়ন্ত পৃথিবীর বুকে বিশ্ব বিস্তৃতির যে দৃশ্য দৃশ্যমান বিশ্বের সর্বস্থানেই সেই একই দৃশ্য দৃশ্যমান। ব্রহ্মাণ্ড প্রতিসম। ব্রহ্মাণ্ডের নিদৃষ্ট জন্মস্থান অনুপস্থিত।

জয়ন্ত প্রশ্ন করতে পার কি অবস্থায় ছিল আমাদের বিশ্বটি তার জন্মক্ষণে?

ব্রহ্মাণ্ডের ইতিবৃত্ত জানার জন্যে ১৩৭০ হাজার কোটি বছর পেছনে ফেরার দরকার।

জন্মক্ষণে বিশ্বে আয়তন— চন্দ্রবিন্দু সম ছিল বিশ্বের আয়তন। ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম বিন্দু। ক্ষুদ্রতার শেষ সীমার বিন্দু।

বিশ্বের উত্তাপ— উত্তাপের শেষ সীমায়

বিশ্বের ঘনত্ব— ঘনত্বের শেষ সীমায়

জয়ন্ত এ হেন অসীমত্তে আমাদের বিজ্ঞান অন্ধ। সমস্ত সমীকরণ, সমস্ত থিয়োরী অকেজ।

জয়ন্ত বলল "দাদা কিছু মনে করবেন না। একটা প্রশ্ন ছিল।"

—নানা বন্ধু মনে কেন করব বরং খুশি হব। একটা কেন হাজারটা প্রশ্ন কর।

জয়ন্তের প্রশ্ন— আপনি বললেন বিশ্বের প্রতিসমতার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় সর্ব্বস্থানে বিশ্বের পরিবর্তন সমরুণ। একই প্রাকৃতিক পরিবেশে বিশ্বের সর্বস্থানের ক্রম বিকাশ। অতএব বিশ্বের সর্বস্থানে সময়ের প্রবাহ সমান। ঘড়ী চলার গতি সমান।

আপনি— yes বলেছি।

জয়ন্ত— আবার এ কথাও বলেছেন হবল ল অনুসারে নক্ষত্র মণ্ডলীগুলির সম্প্রসারণের গতি দূরত্বের সমানুপাতিক।

অর্থাৎ বলা যায় পৃথিবী থেকে সর্বাপেক্ষা দূরবর্তী নক্ষত্রমণ্ডলীর পৃথিবী থেকে দূরে সরে যাওয়ার গতি সর্বাধিক।

আপনি yes জয়ন্ত তোমার Derivation 100% right।

জয়ন্ত সর্বাধিক দূরত্বের নক্ষত্রমণ্ডলীগুলির সম্প্রসারণের গতি বা পৃথিবী থেকে দূরে সরে যাবার গতি প্রায় আলোর গতির সমান।

আপনি— yes. o.k

জয়ন্ত এই অবস্থায় স্পেশাল থিয়োরী অফ রিলেটিভিটির মতানুসারে ঐ দূরবর্তী নক্ষত্র মণ্ডলীতে সময়ের প্রবাহের হ্রাস প্রাপ্তি হওয়ার কথা। TIME DILATION। অথচ বলছেন বিশ্বের সর্বস্থানে সময়ের প্রবাহ সমান। A case of clear contradiction। নিশ্চিৎ বৈষম্যের অভাব। দাদা আমার বাচালতা মার্জনা করবেন।

আপনি : বাচালতা my dear জয়ন্ত? তোমার প্রশ্নটি genuinely inteligent প্রশ্ন। সত্যিকারে বুদ্ধিমান প্রশ্ন। উত্তরে বলি খেয়াল করে দেখবে আপতদৃষ্টিতে নক্ষত্রমণ্ডলীগুলির সম্প্রসারণের গতি তাদের দূরত্বের সমানুপাতিক। আপতদৃষ্টিতে। বাস্তবে নয়। বোঝার ব্যাপার জয়ন্ত যে ব্রহ্মাণ্ডের স্ফীতির কারণে, ব্রহ্মাণ্ডের আকাশ ও সময়ের সমন্বয়ে গঠিত স্বচ্ছ কাঠামোটির স্ফীতির কারণে খেয়াল রাখবে সময় কাঠামোটির অভ্যন্তরে অবস্থিত নক্ষত্রমণ্ডলীগুলি এককভাবে অথবা সম্মিলিত ভাবে গতিশীল নয়। মহাকাশের স্ফীতির কারণে মহাকাশের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা নক্ষত্রমণ্ডলী গুলি আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় গতিশীল।

কেকটি তৈরীর সময় ক্রমশ ফুলতে থাকা ময়দার তালের মধ্যে শুকনো ফলগুলির পৃথকভাবে নিজস্ব কোন গতি ছিল না। একই ভাবে স্ফীতমান বিশ্বে নক্ষত্রমণ্ডলীর পৃথক ভাবে গতিশীল নয়। অতএব GTR এখানে প্রযোজ্য নয়। সময়ের প্রবাহ থাকে সর্ব্বত্র সমান স্থানবিশেষ ঘড়ীর একটি টিক এবং পরবর্তী টিকের অন্তবর্তী ক্ষণ থাকে অপরিবর্তনশীল।

জয়ন্ত আমি কি তোমার clear case of cotrudiction তাড়াতে পারলাম?—

জয়ন্ত well, O.K বলুন দাদা please চালু রাখুন বক্তব্য—

জয়ন্ত, আমরা জানি পদার্থের তিন অবস্থা। কঠিন পদার্থ, তরল পদার্থ এবং গ্যাসিও পদার্থ। উচ্চ তাপে এবং উচ্চ চাপে পদার্থ রূপান্তরিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ

বরফ, জল এবং বাষ্প। উত্তাপে বরফ (কঠিন পদার্থ) জলে (তরল পদার্থ) রূপান্তরিত হয়। অধিক উত্তাপে জল বাষ্পে (গ্যাসিও পদার্থে) রূপান্তরিত হয়। বিজ্ঞানের ভাষায় এই ব্যাপারটিকে বলা হয় (phase change) ফেজ চেঞ্জ।

উচ্চ তাপ এবং উচ্চ চাপের কারণে পদার্থ ছাড়াও বিশ্বে আরও একটি জিনিস প্রভাবিত হয়। বলের ক্ষেত্র। (Force field)।

বিশ্বের জন্মক্ষণে বিশ্বে অসীম অবস্থায় বলের ক্ষেত্রগুলি ছিল অত্যন্ত অশান্ত। হিগস্ ক্ষেত্র Higgs ফিল্ড যার উপস্থিতির ফলে পদার্থে ভরের সঞ্চার হয় (ক্ষেত্রের অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য)। হিগস্ ক্ষেত্রও ছিল অত্যন্ত অশান্ত। তাণ্ডব নৃত্যরত। প্রচণ্ডভাবে স্পন্দিত অবস্থা। জল ফোটার সময় জলের পৃষ্ঠদেশের অবস্থা। হিগস্ ফিল্ডের মান ছিল এক মূহুর্তে শূন্য মানের ওপরে পর মূহুর্তেই মান ছিল নিচে, শূন্য নয়। এমন একটি অবস্থায় হিগস্ ফিল্ড স্থায়িত্ব লাভ করে। পদার্থ বিজ্ঞানীদের ভাষায় এই অবস্থাকে বলা হয় non-zero Higgs field vacume expectation value। বলা হয় COSMOLOGICAL PHASE CHANGE.

সোজা বাংলায় বলা যায় বিশ্ব গগনের অনন্ত পরিসরে ক্ষুন্যমান (শূন্যনয়) হিগ্স ফিল্ড বিরাজ করে।

তুমি বলতে পার জয়ন্ত "ঠিক্ আছে। বোঝা গেল সমস্ত বিশ্বজুড়ে অত্যন্ত ক্ষীণ শক্তির হিগস্ ফিল্ড বিরাজমান। বিশ্বে তো আরো অনেক কিছুই বিরাজ করে। রবি, শশী, গ্রহ, নক্ষত্র আরো কত কি? কি কারণে ক্ষীণকায় এই হিগ্স ফিল্ড এত মূল্যবান? বিশ্ব গঠনে কি এর ভূমিকা? কি এর তাৎপর্য্য?

"বন্ধুবর"-অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এই বিগ্স সাগরের (non zero Higgs Field Vacume expectation value, বাংলায় সংক্ষেপে বলা যাক হিগ্স সাগর) উপস্থিতি বিশ্বের প্রতিসমতাকে ভঙ্গ করে। সার্বিক প্রতিসমতাকে ভঙ্গ করে।

কসমোলজি বিজ্ঞানের প্রতিভাষায় যাকে বলা হয় (Spontenious symmetry Breaking)। দেখ জয়ন্ত বিশ্বের বিভিন্ন পদার্থের আপন মহিমায় বিকাশের মুলে হিগস্ সাগর।

ক্ষেত্রের অধ্যায়েই উল্লেখ করেছি যে হিগস্ ফিল্ড কোন পদার্থে ভরের সঞ্চার করে। বিজ্ঞানের ভাষায় হিগ্স ফিল্ড যা কোন পদার্থ কে তার (Inertia) ইনারসিয়া প্রদান করে। হিগিস সাগর গঠিত হওয়ার পূর্ব্বে fundamental matter particles (quarks) এবং force particles এর মধ্যে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য ছিল। বৈষম্য ছিল না। জয়ন্ত অতএব এই মতবাদ অত্যন্ত যুক্তিসংগত যে জাগতিক চারটি বলের সম্পূর্ণ একান্নবর্তীতা ছিল। ছিল Total unifiction আক্ষরিক অর্থে জগৎটি ছিল পূর্ণভাবে প্রতিসম। Total symnetry।

হিগস্ সাগরের উপস্থিতি এই প্রতিসমতাকে ভঙ্গ করে। জন্ম নেয় ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের স্বতন্ত্র সব ক্ষুদ্রতম কণা। কোয়ার্কস, এ্যানটি কোয়ার্কস, ইলেকট্রন, এনটি

ইলেকট্রন (পজিট্রন)। Quarks, anti Quarks, Electron, Positron। ম্যাটার এবং এনটি ম্যাটার পদার্থের মিলনে উভয় পদার্থের বিলুপ্তি ঘটে। এই বিলুপ্তির প্রক্রিয়ায় কিছু শক্তি উৎপাদিত হয়। অনুমান করা হয় যে বিশ্বের প্রথম অবস্থায় ম্যাটার পারটিক্যাল সংখ্যাধিক্য থাকার কারণে ম্যাটার, এ্যানটিম্যাটার পারটিক্যালের সংস্পর্শে উভয়েই বিলুপ্তির পর ম্যাটার পারটিক্যাল অবশিষ্ট থেকে যায়। উচ্চ উত্তাপ এবং উচ্চ চাপের কারণে এই ম্যাটার পারটিক্যাল গুলি ছিল প্লাজমা অবস্থায়। জয়ন্ত আমরা জানি সাধারণত পদার্থের তিনটি অবস্থা। কঠিন, তরল এবং গ্যাস। এ ছাড়াও আরও একটি অবস্থাও বর্তমান। প্লাজমার অবস্থা। স্বাভাবিক ভাবে পদার্থ প্লাজমা অবস্থায় অবস্থান করে না। অত্যন্ত উচ্চ তাপ এবং অত্যন্ত উচ্চ চাপে পদার্থের এই অবস্থা হয়। মনে রাখবে বিশ্বের ৯০ শতাংশ পদার্থ প্লাজমা অবস্থায় অবস্থান করে।

উত্তাপের এবং চাপের কারণে পদার্থের পরমাণুর বিভাজন হয়। নেগেটিভ ভাবে চার্জ ইলেকট্রন কণাগুলি স্বতন্ত্র ভাবে বিরাজ করে। পজেটিভ ভাবে চার্জ প্রোটন কণাগুলি স্বতন্ত্র ভাবে বিরাজ করে। বিশ্বের প্রারম্ভিক ক্ষণে পারমানবিক উইক ফোরস এবং পারমাণবিক স্ট্রং ফোরসের অস্তিত্ব না থাকার কারণে পরমাণুর গঠন সম্ভব হয়নি। পদার্থের ইলেকট্রন, প্রোটন কণাদের স্বতন্ত্রভাবে বিরাজের অবস্থাকেই বলা হয় প্লাজমা (Plasma)র অবস্থা। Ionised অবস্থা।

বিশ্বের উত্তাপের উপসমরের ফলে পাজমা অবস্থার কণাগুলির মিলনে উৎপত্তি হয় পরমাণু অণু। প্রথম পরমাণুর উৎপত্তি হয় হাইড্রোজেন গ্যাসের পরমাণু।

চেয়ার থেকে উঠতে উঠতে আপনি বললেন "জয়ন্ত আজকের সন্ধ্যের কথা চিরজীবন মনে থাকবে আমার। মনে থাকবে কেবল তাজের রূপে সৌন্দর্যের পিপাসা নিবারণের জন্যেই নয় সঙ্গে এই প্রতিসমতার বাতাবরণের শ্রেষ্ঠ প্রতিসমতার আলোচনা।

"ভাইয়া আমি লক্ষ্য করছিলাম আমাদের অন্য সভায় তুমি যেমন আমার দিকে তাকিয়ে আমার বক্তব্য শোন আজ তা করনি। আজ তুমি তাজের দিকেই চেয়ে বসে রইলে সারা সন্ধ্যে। এটা অবশ্য স্বাভাবিক। আমিও কথা বলতে বলতে চেয়ে ছিলাম তাজের দিকে সারা সন্ধ্যে। এখানকার সবাই ছিল। এখনও আছে। যতক্ষণ এখানে বসে থাকবে ততক্ষণ থাকবে।

তাজমহলের বিশেষ করে পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার আলোই তাজমহল, এই মনমোহিনী রূপের আকর্ষণ নিউক্লিয়ার স্ট্রং ফোরসের আকর্ষণের তুলনায় হাজারগুণ অধিক।

এই রকম এক পরিবেসে আমার বিশ্বতত্ত্বের আলোচনা তুমি কি উপভোগ করেছ বন্ধু?

জয়ন্তের উত্তর : দাদা ভাবছি না জানি কত ভাগ্যবান আমি। রূপ ও বাণীর

যুগলবন্দি উপভোগ করছিলাম এতক্ষণ। চোখ আর কান আমার দুটি ইন্দ্রিয়তেই বর্ষিত হচ্ছিল অমৃতের শত ধারা। দাদা, অমৃত তো অমৃতই। অমৃতের প্রকারভেদ কি সম্ভব?

"বিশ্ব জীবন-মানব জীবনে"র তুলনা

বিগ ব্যাঙের পরবর্তী সময়	বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড	মানব জীবনে তুলনামূলকভাবে
৩,৭৯০০০ বছর পর	কসমেটিক মাইক্রোওয়েভ আলোর বিচ্ছুরণের মাত্রা আরম্ভ। উত্তাপের কিছু উপশমের কারণে প্রোটন, নিউট্রন, ইলেকট্রন ও পরমাণুর উৎপত্তি মাধ্যাকর্ষণের কারণে পদার্থের সংকোচন।	মানব শিশুর বয়স ১৯ ঘণ্টা
২০ কোটি বছর পর	আকাশ এবং সময়ের কাঠামোটিতে প্রথম নক্ষত্রের বিকাশ। WILKINSON MCROWAVE ANISOTROPY PROB (WMAP) মহাকাশে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণরত মাইক্রোওয়েভ ডিটেকটারে গৃহিত ছবি দ্বারা প্রমাণিত।	আনুপাতিকভাবে বিশ্বের অবস্থা ১৩ মাস বয়সের মানব শিশুর অবস্থা। প্রথম পদক্ষেপ।
১০০ কোটি বছর পর	এই সময় প্রথম ছায়ামণ্ডলীর উৎপত্তি। মানব শিশুর তুলনায় অমিল যে এই সময় বিশ্বের গঠনমূলক যুগের পরিসমাপ্তি। পরবর্তীকালে বিশ্বের রুটিন সম্প্রসারণ, নতুন নতুন ছায়ামণ্ডলী, নক্ষত্রের উৎপত্তি। এদের বিলুপ্তি ইত্যাদি। রুটিন জীবন আরম্ভ।	৬ বছরের মানব শিশু।
১৩৭০ কোটি বছর পর	আধুনিক যুগ। ১০ হাজার কোটি ছায়ামণ্ডলী, ৪০ হাজার কোটি নক্ষত্র। অসংখ্য গ্রহ, উপগ্রহ, গ্রহানুপুঞ্জ (asteriods) ধুমকেতু ইত্যাদি সহযোগে বিশাল সংসার।	৫০ বছর বয়সের পরিণত মানব।

দশম অধ্যায়

বিশ্বের তত্ত্বে বিশ্বের স্ফীতি "INFLETION" (Infletionary cosmology)

ইনফ্লেশনারী কসমোলজির থিওরী স্ট্যাণ্ডার-বিগ-ব্যাঙ থিয়োরীর উত্তরকালীন থিয়োরী।

জ্ঞানের আলোকের দীপ্তির উজ্জ্বলতায় অজ্ঞানের অন্ধকার দূর হয়। নতুন গবেষণার দ্বার উন্মোচিত হয়। আসে প্রশ্নের জোয়ার।

চিন্তা করা যাক আপনি এবং আপনার এক ইংরেজ বন্ধু রাজস্থানের জয়পুর ঘুরতে গেছেন। ১৭৩৪ সালে জয়পুরের মহারাজ জয়সিংহ নির্ম্মিত যন্ত্রর মন্ত্রর দেখতে গেছেন। জয়প্রকাশ যন্ত্রের সাহায্যে কি ভাবে পৃথিবীর ঋতুপরিবর্ততনের দিন নির্দ্ধারণ করা যায় আপনি ইংরাজিতে আপনার ইংরেজ বন্ধুকে ব্যাখ্যা করছেন। আপনি আড়াচোখে লক্ষ্য করলেন দুজন বিদেশী টুরিস্ট মন দিয়ে আপনার কথা শুনছেন। আপনার ব্যাখ্যার উপরান্তে ওনারা আপনাকে ধন্যবাদ জানালেন। আপনার সঙ্গে করমর্দন করে নিজেদের আমেরিকান বলে পরিচয় দিলেন। নাম বললেন, মিঃ এ্যালেন গুথ (Mr. Allen Guth) এবং মিঃ হেনরী টাই (Mr. Henry Tye) মিঃ গুথ MITর প্রফেসার। মিঃ টাই করনেল ইউনিভারসিটির প্রফেসার। দুজনেই কসমোলজির সঙ্গে পরোক্ষভাবে যুক্ত। আপনাদের দুজন কে ওনাদের হোটেলে সান্ধ্যভোজের নেমতন্ন করলেন। অনুরোধ করলেন সন্ধ্যে ৮টায় যাওয়ার জন্যে। কিছু সময় বাক্যলাপের উদ্দেশ্য।

ঘড়ীর কাঁটায় কাঁটায় আপনারা হোটেলে পৌছলে আপনাদের সাদর আপ্যায় করলেন আপনাদের সদ্য পরিচিত দুই মার্কিন নাগরিক।

ইতি মধ্যে আপনারা দুই মার্কিন নাগরিকদের পরিচয় যোগাড় করেছেন। জেনেছেন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ওঁনারা। ইনফ্লেশানারি কসমোলজির জনক। ওনাদের মতামত ওনাদের থিয়োরী পণ্ডিত সমাজে ব্যক্তি নির্ব্বিশেষে অত্যন্ত সমার্দ্দিত। এ হেন পণ্ডিত মানুষের আমন্ত্রণে আপনারা এক দিকে যেমন অত্যন্ত বিস্মিত অন্যদিকে আনন্দে আপ্লুত।

হোটেলের পুল সাইডে উন্মুক্ত আকাশে তলায় আরম্ভ হল আপনাদের আড্ডা।

সামনের টেবিলে রাখা সুন্দর বেতের আধারের মধ্যে কয়েকটি ডাব এবং কয়েক প্রকার সুমিষ্ট ফল।

মিঃ গুথ ফলের ঝুড়ি এবং দুটি আধার সমতে ডাব আপনাদের দিকে এগিয়ে দিলেন। স্ট্র দিয়ে একটি ডাবে চুমুক দিয়ে কথা আরম্ভ করলেন।

বললেন আপনাদের ভাবভঙ্গি দেখে বুঝতে পারছি আপনারা আমাদের পরিচয় জেনে গেছেন। সঙ্কিত হওয়ার দরকার নেই। Be relaxed। আসুন সুন্দর সন্ধ্যেটা উপভোগ করা যাক। আপনাদের ভাষায় জমিয়ে আড্ডা মারা যাক। আপনাদের বিখ্যাত চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের সিনেমা দেখে জেনেছিলাম পুরাকালে গ্রীস এবং রোমের পণ্ডিতদের মধ্যে আড্ডা মারার প্রবণতা ছিল। জ্ঞানের আদান-প্রদান হত সেই আড্ডায়। আজ আমরাও সেই রকমই আড্ডা মারব। বাঙ্গালীর আড্ডামারার অভ্যেস আমি প্রশংসা করি। appreciale করি। যদিও অনেক সময় আলোচনার বিষয়বস্তু ব্যাপারে তর্কের অবকাশ থাকে।

মিঃ গুথ দুটো আঙ্গুর মুখে দিয়ে মূল পর্ব্বের আলোচনা শুরু করলেন।

বললেন দেখুন ১৯৮০ সালের পূর্ব্বে বিশ্বের জন্ম বৃত্তান্তের ব্যাপারে বিগ ব্যাঙ থিয়োরী তখন মহাকাশ বিজ্ঞানীদের কাছে বিপুল ভাবে স্বীকৃত ছিল। এই থিওরীর অনেক অনুমান, অনেক ব্যাখ্যা তখন পরীক্ষিত ভাবে প্রমাণিত। এত সফলতার পরেও কিন্তু কিছু প্রশ্নের উত্তর বিশেষভাবে তিনটি প্রশ্নের উত্তর এই থিওরী দ্বারা পাওয়া সম্ভব হচ্ছিল না।

১ নং প্রশ্ন— হরাইজন প্রবলেম (Horizon Problem)

২. নং প্রশ্ন—ফ্লাটনেস প্রবলেম (Flatness Problem)

৩. প্রশ্ন— চুম্বকিয় মনোপোল প্রবলেম (Magnetic Mono pole problem)

সামান্য থেমে মিঃ গুথ পুনরায় বলতে আরম্ভ করলেন। বললেন এই তিন প্রকার সমস্যা এবং পর্য্যায়ক্রমে সমস্যাগুলির সমাধানের ব্যাপারে আলোচনা করার পূর্ব্বে আমার মনে হয় সামান্য ভূমিকার প্রয়োজন আছে।

আপনার দিকে তাকিয়ে মিঃ গুথ প্রশ্ন করলেন বলুন তো আইনস্টাইনের মতে মাধ্যাকর্ষণ বল কি কি জিনিষের ওপর নির্ভর করে?

আপনার জবাব "আমি তো জানি মাধ্যাকর্ষণ বল পদার্থের ভরের ওপর আর দূরত্বের ওপর নির্ভর করে। এ ছাড়া...না বলতে পারলাম না।

গুথ সাহেব বললেন দাদা আপনি তো তিনশো বছরের পুরোনো নিউটনের সূত্র বলছেন। আইনস্টাইনের GTR এর মতো মাধ্যাকর্ষণ বল কেবল পদার্থের ভর এবং দূরত্বের ওপর নির্ভর করে না। মহাকাশের কোন এক অংশের মাধ্যাকর্ষণ বল মহাকাশের সেই অংশে কত পরিমাণে শক্তির উপস্থিতি তার ওপর নির্ভরশীল। সেই অংশে কি পরিমাণ চাপের (Pressure) উপস্থিতি তার ওপর নির্ভরশীল। ভর এবং দূরত্বের মত শক্তি এবং চাপ মাধ্যাকর্ষণ কে প্রভাবিত করে।

এর পর আপনার ইংরেজ বন্ধুর দিকে তাকিয়ে বললেন আপনি নিশ্চয়ই জানেন চাপ দু রকম।

বন্ধুর জবাব যদিও তিনি বিজ্ঞানের কোন প্রশিক্ষণ নেন নি তবুও চাপ যে দু রকম তা তিনি জানেন। পজেটিভ চাপ এবং নেগেটিভ চাপ। তিনি জানালেন তিনি একজন কিউরিওপোডিস্ট এবং পেডিয়ট্রিস্ট (Chiropodist cum pediatrists)। এক কথায় মানুষের পায়ের নিম্নভাগের যত্ন নেন, চিকিৎসা করেন।

আপনি বললেন "বাংলায় বলে ধনাত্মক চাপ এবং ঋণাত্মক চাপ।"

মিঃ টাই প্রথম বার মুখ খুললেন। বললেন ধনা, ধনা, খানা খানা?

মিঃ গুথ ওনাকে থামিয়ে বল্লেন থাক থাক এখন থাক। আমরা কোলকাতায় যাচ্ছি। ওখানে গিয়ে বাংলা ভাষা প্র্যাকটিস করে নেবেন। যাই হোক যা বলছিলাম। চাপ দুই রকম। একটি স্প্রিং সংকুচিত অবস্থায় যে চাপ সৃষ্টি করে তার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার জন্যে সেটি পজেটিভ চাপ। ধনাত্বক চাপ। অনুরূপ ভাবে স্প্রিংটি তার সাম্প্রসারিত অবস্থায় যে চাপ সৃষ্টি করে তার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আশার জন্যে সেটি নেগেটিভ চাপ। ঋণাত্মক চাপ

এর পর মিঃ গুথ বললেন এবার আমি যা বলব সেটা খুব মনদিয়ে শুনতে হবে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা।

মনে রাখবেন পজেটিভ চাপ পজেটিভ মাধ্যাকর্ষণ বলের বা আকর্ষিত মাধ্যাকর্ষণ বলের সৃষ্টি করে। যে মাধ্যাকর্ষণের সঙ্গে আমরা সবাই পরিচিত। যে মাধ্যাকর্ষণের কথা নিউটন বলে গেছেন।

অন্যদিকে নেগেটিভ চাপ, নেগেটিভ প্রেসার, নেগেটিভ বা বিকর্ষিত yes বিকর্ষিত মাধ্যাকর্ষণ বলের সৃষ্টি করে। যে মাধ্যাকর্ষণের সঙ্গে আমরা কেউই পরিচিত নই। নিউটনও ছিলেন না। আইনস্টাইনের জেনারেল থিয়োরী অফ রিলেটিভিটির সমীকরণ বিকর্ষিত মাধ্যাকর্ষণ বলের সম্ভাব্য উপস্থিতির ব্যাপারে মত প্রকাশ করে। এই মাধ্যাকর্ষণ বল পদার্থের পরস্পরের মধ্যবর্ত্তী দূরত্বকে বর্দ্ধিত করে।

এই বল কাছে টানার পরিবর্তে দূরে ঠেলে দেয়।

গুথ সাহেব বললেন আপনারা হয়ত প্রশ্ন করতে পারেন যে শক্তি এবং চাপ মাধ্যাকর্ষণ বল সৃষ্টি করে অথবা মাধ্যাকর্ষণ বলকে প্রভাবিত করে তার প্রমাণ কি? নিউটন তো গাছ থেকে আপেল মাটিতেই পড়ে বলে তাঁর সূত্রের প্রমাণ দিয়েছিলেন।

খুব সরল পরীক্ষার দ্বারা মাধ্যাকর্ষণের ওপর শক্তি এবং চাপের প্রভাব প্রমাণ করা যায়।

পরীক্ষাগারে প্রমাণিত করা হয়েছে যে একটি লোহা উত্তপ্ত করার ফলে উত্তপ্ত অবস্থায় বলটির ওজনের বৃদ্ধি হয়। বলটিতে তাপ শক্তি সঞ্চারিত হয়। ওজনের

বৃদ্ধির অর্থ মাধ্যাকর্ষণ বলের বৃদ্ধি।

অনুরূপভাবে পরীক্ষাগারে প্রমাণিত সঙ্কুচিত অবস্থায় একটি স্প্রিংএর ওজন সাধারণ অবস্থায় স্প্রিংটির ওজনের তুলনায় অধিক।

উভয় ক্ষেত্রেই ওজন বৃদ্ধির মান অতি সামান্য। এতই সামান্য যে এই তারতম্য পরিলক্ষিত করা সম্ভব কেবল মাত্র বিশেষভাবে নির্মিত পরীক্ষাগারের অত্যন্ত সূক্ষ্ম যন্ত্রের সাহায্যে।

(দুটি পরীক্ষা মূলত এক। প্রথমটিতে লোহার বলের তাপ শক্তির প্রয়োগ। দ্বিতীয়টিকে স্প্রিংএ সঞ্চিত শক্তির (Store energy) র প্রয়োগ।)

মিঃ গুথকে সামান্য বিশ্রাম দেওয়ার জন্যে এবার মিঃ টাই বলতে আরম্ভ করলেন। আলোচনা জারি করলেন।

মিঃ টাই বললেন এইভাবেই আইনস্টাইন প্রত্যাবর্তন করেন তাঁর নতুন শব্দ কসমোলজিক্যাল কন্সট্যান্ট।

মিঃ টাই বলে চললেন সাধারণ অবস্থায়, প্রতিনিয়ত অতিক্রান্ত দূরত্বে খণ, ঋণ, ঋণাত্বক? আপনার দিকে তাকিয়ে আপনার সম্মতি চাইলেন। হাতের ইসারায় সম্মতি জানাতে বলে বললেন ঋণাত্মক চাপের জন্যে সৃষ্ট বিকর্ষিত মাধ্যাকর্ষণ বলের শক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ। মোটামুটি দুরত্বেরও ধরুণ আমাদের আকাশ গঙ্গার ব্যাস ১ লক্ষ্য আলোক বর্ষ) এই বিকর্ষিত মাধ্যাকর্ষণের পরিমাণ ক্ষীণ।

মিঃ টাই বললেন এখানে আপনাদের মনে করিয়ে দিতে চায় আমাদের ব্রহ্মাণ্ডে ১০ হাজার কোটি (100 Billion) ছায়ামণ্ডলীর বসবাস। আকাশগঙ্গা তাদেরই একটি। অতএব আকাশগঙ্গার ব্যাসের পরিমাপ ব্রহ্মাণ্ডের সীমানার দূরত্বের তুলনায় নগণ্য। আইনস্টাইন তাঁর কসমোলজিক্যাল কন্সট্যান্টকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে বক্তব্য রেখেছিলেন যে এই বিকর্ষিত বলটির শক্তি আকাশগঙ্গার ব্যাসের দূরত্বেরও ক্ষীণ। দূরত্বের এই পরিমাপও এর শক্তি প্রায় নগণ্য। কিন্তু বিশ্বের ব্যাপ্তির ক্ষুদ্র ভগ্নাংশের দূরত্বেও এই বিকর্ষিত মাধ্যাকর্ষণ বলের সমষ্টিগত আকর্ষিত মাধ্যাকর্ষণ বলকে কাঁটায় কাঁটায় প্রতিহত করে। বিশ্বের আয়তনকে স্থায়িত্ব দেয়।

মিঃ টাই ডাবের জলের গলা ভিজিয়ে নিয়ে বললেন এখানে বলে রাখা ভাল সাধারণত চাপের জন্য নয় চাপের তারতম্যের (Pressure difference) এর জন্যে যে বলের উৎপত্তি হয় সেটি আলাদা। এখানে মহাকাশের কোন অংশে চাপের উপস্থিতির ফলে আকাশ এবং সময়ের তৈরী চাদরটির সেই অংশে ভাঁজ পড়ে। গুরুভর বস্তুর উপস্থিতির জন্যে যেমন ভাঁজ পড়ে। উদ্ভুত হয় মাধ্যাকর্ষণ বল। চাপের উপস্থিতির ফলে মাধ্যাকর্ষণ বল।

সামান্য চুপ করে থাকার পর তিনি পুনরায় বলতে আরম্ভ করলেন। বললেন দেখুন আমরা সবাই জানি আইনস্টাইন পরবর্ত্তীকালে তাঁর GTR এর সমীকরণের থেকে কসমোলজিক্যাল কন্সট্যান্ট শব্দটি অপসারিত করেছিলেন। অপসারণ

করেছিলেন বিশ্বের সম্প্রসারণ আবিষ্কার করার পর। কিন্তু যখন আইনস্টাইন cc র অবতারণা করেছিলেন তখন কেবল নেগেটিভ চাপের জন্যে উদ্ভুত বিকর্ষিত মাধ্যাকর্ষণ বলের উল্লেখ করেছিলেন।

কি কারণে মহাকাশের কোন অংশে নেগেটিভ চাপের সৃষ্টি হয় এ ব্যাপারে কিন্তু তিনি ছিলেন সম্পূর্ণভাবে নির্ব্বাক।

এই বলে মিঃ হেনরি টাই তাঁর চেয়ারটি পেছনের দিকে হেলিয়ে দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন এর পর আমার বন্ধু ইনফ্লেসনারী কসমোলজির জনক মিঃ এ্যালেন গুথ আলোচনা জারি রাখবেন।

মিঃ গুথ এতক্ষণ তাঁর হেলান চেয়ারে আধশোয়া অবস্থায় আকাশ দেখছিলেন। সোজা হয়ে উঠে বসে বললেন ইণ্ডিয়াতে ডাবের জল যে এত মিষ্টি ধারণা ছিল না। ওয়েটারকে ডেকে আরো কয়েকটি ডাব দেবার জন্যে অনুরোধ করে বললেন চলুন পুনরায় আরম্ভ করা যাক আমাদের আলোচনা। বিস্তৃত করা যাক কসমোলজির ওপর আমাদের জ্ঞানের পরিধি।

তিনি বল্লেন মনে রাখবেন বিশ্বের যে জিনিষটি বিকর্ষিত মাধ্যাকর্ষণ বল গঠনে অংশে গ্রহণ করে তা হল হিগ্‌স ফিল্ড। অনেকে বলেন ভাকিউম এনার্জ্জী। (vacuum energy)

বললেন দেখুন বিশ্ব রহস্য উদ্ঘাটনে বিগ ব্যাণ্ড থিয়োরী বহুলাংশে সফল। এ থিওরী এখন সর্ব্বজন বিদিত। CMB এর আবিষ্কারের ফলে এই থিয়োরীর বৈধতা পরীক্ষিত ভাবে প্রমারিত। এ সব ঠিক আছে। কিন্তু বিগ ব্যাঙ থিয়োরীতে কয়েকটি অত্যন্ত গভীর ত্রুটি ছিল।

মুখ্য ত্রুটিটি ছিল, বিগ ব্যাঙ থিয়োরীর মতানুসারে একটি অতি ক্ষুদ্র বিন্দুর আকারে বিশ্বের জন্ম। অতঃপর এই বিন্দুর সম্প্রসারণ। বিগ ব্যাঙ থিয়োরী এই সম্প্রসারণের কোন কারণ ব্যক্ত করে না। কিসের বলে সম্প্রসারণ? কি সেই বিশাল শক্তি যার জন্যে সম্প্রসারণ?

ডাবের জলে গলা ভিজিয়ে নিয়ে মিঃ গুথ বললেন সেটা ১৯৮০ সাল। আমি তখন আমার পোস্ট ডক্টরেট ফেলশিপের সময় আমেরিকার স্ট্যানফোর্ড লিনিয়ার একসলেরেটারে কাজ করছিলাম। আমার কাজ ছিল জাগতিক চারটি মৌলিক বলের একত্রিতকরণে হিগ্‌স ফিল্ডের প্রভাব। তখন হেনরী করনেল ইউনিভারসিটিতে কাজ করত। আমার যুগ্ম ভাবে একই গবেষণায় লিপ্ত ছিলাম। পারটিক্যাল ফিজিক্সের লোক আমরা। কসমোলজির ওপর বিশেষ ট্রেনিং আমাদের কাররেই ছিল না। বিগ ব্যাঙ থিয়োরী টি জানতাম। বিগ ব্যাঙ থিয়োরীর ত্রুটিগুলির ব্যাপারে মোটামুটি ওয়াকিবহাল ছিলাম।

বললেন দেখুন আমরা সবাই জানি উত্তাপ এবং চাপের প্রভাবে বিশ্বের যে কোন পদার্থের অবস্থার পরিবর্তন হয়। পদার্থের আকার, আয়তন, রূপ এবং গুণের

পরিবর্ত্তন হয়। এই পরিবত্তন কে বলে ফেজ ট্রান্সফরমেশন phase transfeormation।

আমরা জানি উত্তাপের ফলে পদার্থের যেমন ফেজের পরিবর্ত্তন হয় ঠিক তেমনই উত্তাপের ফলে সমস্ত জাগতিক field, বা ক্ষেত্রগুলিরও রূপের বা phase-এর পরির্ত্তন হয়। যেমন ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ক্ষেত্র, হিগস ক্ষেত্র Higher field ইত্যাদি। হিগস্ ফিল্ডের রূপ পরিবর্ত্তনের ব্যাপারটি এই বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি বললেন বিশ্বের জন্মক্ষণে উত্তাপ ছিল উত্তাপের শেষ সীমায়। এই অসীম উত্তাপে অনুমান করা হয় কেবল হিগ্স ফিল্ডেরই উপস্থিতি ছিল। প্রচণ্ড অশান্ত অবস্থায় উপস্থিতি ছিল। বলা যায় তাণ্ডব নৃত্য রতন ছিল হিগ্স ফিল্ড। এক মুহুর্তে এর শক্তির মান বিপুল পর মুহুত্তেই হিগস ফিল্ডের শক্তির মান প্রায় শূণ্য। হিগস্ সাগরের এই ব্যাপারটি পূর্ব্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

বললেন এবারে আমি যা বলব খুব মনযোগ সহকারে শোনা দরকার।

যদি হিগস্ ফিল্ডের শান্ত হবার হার বিশ্বের শীতল হওয়ার হারের থেকে কম হয় তখন হিগস্ ফিল্ডটি একটি উচ্চ শক্তিশালী মঞ্চে অবস্থান করে। পদার্থ বিজ্ঞানের ভাষায় হিগস্ ফিল্ডের এই অবস্থায় অবস্থান করাকে বলা হয় হিগস্ ফিল্ডের সুপার কুলড অবস্থা। এই অবস্থার সঙ্গে তুলনা করা যায় সম্পূর্ণ ভাবে শুদ্ধ সুপার কুণ্ড অবস্থা শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াসের অনেক নীচে শীতল করা পরও জল বরফে রূপান্তরিত হয় না। বরফের স্ফটিকের (crystal) গঠন আরম্ভ হওয়ার জন্য জলে অপদ্রব্যের পরিমাণ শূন্য নয় এমন হওয়া দরকার। অপদ্রব্যের ওপরেই প্রথমে বরফ জলা আরম্ভ হয়। অতএব সুপার কুল্ড অবস্থায় শুদ্ধ জলের phase transformetion বা রূপ পরির্ত্তন হয় না।

একই ভাবে সুপার কুলড অবস্থায় হিগস্ ফিল্ডের phase transmation বা রূপপরিবর্ত্তন হয় না। হিগ্স ফিল্ড অবস্থান করে অত্যন্ত অধিক শক্তিশালী Higher potetial এ মঞ্চে। আমি এবং টাই গণিতিক ভাবে প্রমাণ করতে সমর্থ হয়েছি। এই অবস্থায় এই উচ্চ শক্তি বিশিষ্ট হিগ্স ফিল্ড যে চাপের সৃষ্টি করে সেটি নেগেটিভ চাপ। yes, yes friend it is নেগেটিভ চাপ। আমাদের সৃষ্ট সমীকরণের ডান দিকে নেগেটিভ। ফলে সৃষ্টি হয় বিকর্ষিত মাধ্যাকর্ষণ বল। বলতে পারেন মহামান্য আইন—স্টাইনের কসমোলজিক্যাল কন্সট্যান্টের পুনঃ প্রত্যাবর্তন।

ডাবের জলে সামান্য গলা ভিজিয়ে মিঃ গুথ বললেন ভাবতে ইচ্ছে করে আইনস্টাইন জীবিত থাকলে কি করতেন, কি বলতেন আমাদের এই আবিষ্কারের পর। তিনি কি পুনরায় সংযুক্ত করতেন কসমোলজিক্যাল কন্সট্যান্ট শব্দটি তাঁর বিখ্যাত GTR সমীকরণের সাথে?

কোয়ানটাম মেকানিক্সের সূত্র অনুযায়ী সুপার কুলড অবস্থায় হিগ্স ফিল্ড অবস্থান করে অত্যন্ত অস্থায়ী অবস্থায়। unstable condition এ। হোসেন বার্গের

(Heisenberg) আনসারটেনটি (uncertainty) থিয়োরী অনুযায়ী হিগস ফিল্ড তার উচ্চ সমতা সম্পন্ন মঞ্চ হতে লাফ দেয় শূন্য নয় এমন একটি অবস্থায় স্থিতি হতে।* এই লাফ দেওয়ার ব্যাপারটা মেটাতে সময় লাগে মাত্র ১০$^{-৩৫}$ অর্থাৎ ০০০ সেকেণ্ড।

মিঃ গুথ মুখে আরো দুটো আঙ্গুর ফেলে তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিমায় আলোচনাকে আগে বাড়ালেন। বললেন হিগস্ ক্ষেত্রের লাফ দেওয়ার ঐ অত্যন্ত শূন্যমান সময় নির্ণয় করার পর আমি আর হেনরী মননিবেশ করলাম হিগ্স ফিল্ডের সম্ভাব্য উচ্চ শক্তির মান অর্জন করার ক্ষমতা সম্বন্ধে। তুলনা করা যায় হাইজম্নের, বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী কিউবার জেভিয়ার সর্বমেয়র (Javier Sotomayor) ২.৪৫ মিটার হাইজাম্প দেওয়ার সঙ্গে। আধুনিক মানুষের সর্ব্বোচ্চ লাফ। হোমোসেনিয়ানদের উচ্চ লাফ দেওয়ার ক্ষমতা সম্বন্ধে আমার জানা নেই। তায় আধুনিক মানুষ বললাম। হয়ত বলতে পারতাম হিসেব রাখা মানুষের সর্ব্বোচ্চ্য লাফ। Highest high jump by a humain being ever recorded। লাফ দিয়ে কোন শক্তি সীমানায় পৌঁছল সম্ভব হিগস্ ফিল্ডের? কত উচ্চ লাফ দেওয়া সম্ভব হিগ্স ফিল্ডের? এটিই ছিল আমাদের বিষয় বস্তু।

আমাদের গণনায় যে উত্তরটি আমি আর হেনরী পেয়েছিলাম প্রথমবার তা আমাদের বিশ্বাস হয়নি। মিঃ গুথ মিঃ টাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন আমাদের ধারণা হয়েছিল নিশ্চয়ই উত্তরটি নির্ভুল নয়।

কোথাও না কোথাও ভুল আছে আমাদের গণনায়। হেনরী গণিতে বিশেষ পারদর্শী। বারংবার গণনা পরও আমরা একই উত্তর পাচ্ছিলাম। তখন বুঝলাম আমাদের গগণায় ভুল নেই। নির্ভুল উত্তর। কি উত্তর পেয়েছিলাম জানেন? বলছি দাঁড়ান সামান্য ডাবের জল খেয়ে নিই। ডাবের জল গলা ভিজিয়ে মিঃ এ্যালেন গুথ বললেন আমার এই উত্তরটি শোনার সময় নিশ্বাস নেওয়ার শব্দের জন্যে ভুল শুনেছি এই রকম যেন আপনাদের মনে না হয়।

---

* কোয়ানটাম মেকানিকস এর হোসেন বার্গের (Heisenberg) আনসারটেনটি প্রিনসিপ্যাল বলে "কেন একটি পারটিক্যালের কোন এক ক্ষণে সঠিক গতির মান এবং ঠিক সেই ক্ষণে পারটিক্যালটির সঠিক অবস্থান এই দুটি জিনিসকে নির্ভূল ভাবে নির্ণয় করা অসম্ভব। কোন পারটিক্যালের এমন দুটি বৈশিষ্ট্য যারা পরস্পরের প্রতি সম্পর্কিত (যেমন গতি ও অবস্থান, শক্তি ও সময় অথবা গতি এবং গতির পরিবর্ত্তনের হার বা ত্বরান্বিত গতি ইত্যাদি) একই ক্ষণে মান নির্ণয় করা অসম্ভব। ফিল্ডের ক্ষেত্রেও আকাশের কোন অংশ অবস্থিত ফিল্ডের মান এবং তার পরিবর্ত্তনে হার একত্রে নির্ণয় করা অসম্ভব। কোয়ানটাম আনসারটেনটি অনুসারে বলা যায় আকাশের কোন এক অংশে কোন এক ক্ষণে যত সঠিক ভাবে ফিল্ডের মান নির্ণয় করা যায় ততটাই কম অনুমান করা যায় মুহূর্ত পরে ফিল্ডের সম্ভাব্য পরিমাণ সম্বন্ধে। অতএব এই মুক্তিতে বলা যায় পরমুহূর্তে ফিল্ডের মানের পরিবর্তনের সম্ভাবনা অত্যন্ত অধিক। এই পরিবর্তনটিকেই ফিল্ডের লাফ দেওয়া" (কোয়ানটাম জাম্প) ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

শুনুন এপর আমরা কি উত্তর পেয়েছিলাম।

উচ্চ শক্তি সম্পন্ন মঞ্চে অস্থায়ী অবস্থায় অবস্থিত হিগ্‌স ফিল্ডের কোয়ানটাম্ লাফের ফলে শক্তির যে উচ্চ সীমা পর্য্যন্ত হিগ্‌স্ ফিল্ড পৌঁছতে পারে যার ফলে এক প্রচণ্ড ঋণাত্মক চাপের (Negative pressure) সৃষ্টি হয়। এই ঋণাত্বক চাপ এতই অধিক যে এই চাপের ফলে সৃষ্ট বিকর্ষিত মাধ্যাকর্ষণ বলের পরিমাণ আইন-স্টাইনের নির্ণয় করা বিকর্ষিত মাধ্যাকর্ষণ বলের (কসমোলজিক্যাল কন্সটান্টের) মানের $১০^{১০০}$ গুণ অধিক। yes $১০^{১০০}$গুণ অধিক। ঠিক শুনেছেন আপনারা ১০০০ গুণ অধিক। অবিশ্বাস্য, অচিন্তনীয় সংখ্যা। হয়ত গল্পনায় প্রাপ্ত বিশ্বের সর্ব্বকালের সর্ব্ববৃহৎ সংখ্যা।

মিঃ গুথ তাঁর ডান হাত অর্দ্ধেক তোলা অবস্থায় তাঁর প্রথম আঙ্গুলটি তুলে বললেন ভুলে যাবেন না এই বলটির, এই বিকর্ষিত মাধ্যাকর্ষণের স্থায়িত্ব ছিল $১০^{-৩৫}$ সেকেণ্ড। সময়ের ক্ষুদ্রতম অংশের প্রায় শেষ সীমানায়।

আমি বললাম স্যার চেয়ার থেকে প্রায় পড়ে যাচ্ছিলাম।

মিঃ গুথ বললেন আমাদেরও প্রায় সেই অবস্থাই হয়েছিল। কি বল হেনরী?

মিঃ টাই সোজা হয়ে বসে বললেন সে আর বলতে? এবার মিঃ টাই আলোচনা জারী রাখলেন। বললেন সময়ের ক্ষুদ্রসীমার কাছাকাছি সময়ে এই রকম অসীম শতিক্তশালী বিকর্ষিত মাধ্যাকর্ষণ বলে সদ্যজাত বিশ্বের ওপর প্রয়োগের ফল...ছোট বিশ্বের অকল্পনীয়, অচিন্তনীয় বিস্তার। অকল্পনীয় অচিন্তনীয় সম্প্রসারণ। হয়ত বা বিশ্বের আয়তনের $১০^{৩০}$ গুণ, অথবা $১০^{৫০}$ অথবা $১০^{১০০}$ গুণসম্প্রসারণ। কোন কোন কসমোলজিস্টটের মতে এই সম্প্রসারণের মাত্রা ছিল $১০^{৩০}$ গুণ। যদি এই সংখ্যাটিও সঠিক হয় তবে আজ অবধি বিশ্বের সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্রে এমনকি মহাকাশে অবস্থিত দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেও আমরা বিশ্বের এক অতি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র দেখতে সক্ষম। বিশ্বের আয়তন যদি পৃথিবীর আয়তনের সমান ভাবে চিন্তা করা হয় তবে আমরা বিশ্বের যে অংশটি দেখতে পায় সেটি একটি বালুকণার আয়তনের সমান। পৃথিবীর সর্ব্বাধিক দূরবর্তী ছায়ামণ্ডলীর আলো পৃথিবীতে পৌঁছতে এখনও কয়েক হয়ত বা সহস্র কোটি আলোকবর্ষ দেরী। এই আলো পৌঁছবার সময় আমাদের পৃথিবীর আমাদের সূর্যের অস্তিত্বও লুপ্ত হয়ে যাবে

আপাতদৃষ্টিতে মনে হওয়া স্বাভাবিক এই সম্প্রসারণের গতি আলোর গতির অধিক। এটি আইনস্টাইনের GTR এর পরীপন্থী। GTR এর মতে গতির শেষ সীমা আলোর গতি। খেয়াল করা দরকার আলোর গতি বলতে বোঝায় বিশ্বের অভ্যন্তরে আলোর গতি। বিশ্বের আকাশ আর সময়ের তৈরী মঞ্চটির অভ্যন্তরে আলোর গতি। কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে বিশ্বের নিজস্ব সম্প্রসারণের। সময় ও আকাশের তৈরী মঞ্চটির সম্প্রসারণের। তাই এখানে GTR অপ্রযোজ্য)

বিশ্বের মঞ্চ হতে।

সদ্যোজাত বিশ্বের এই বিশাল সম্প্রসারণকেই বলা হয় INFLATION। বিগ ব্যাঙ থিয়োরীর নতুন নামকরণ করা হয় ইনফ্লেসনারী বিগ ব্যাঙ থিয়োরী।

আলোচনায় এমন মত্ত ছিলেন আপনার সবাই ঘড়ী দিক তাকান নি কেউই। আপনি কেবল লক্ষ্য করেছিলাম অনতিদুরে কিছুক্ষণ ধরে অপেক্ষারত একজন হোটেলের ওয়েটারকে। তাঁর দিকে নজর পড়ায় মিঃ গুথ জিজ্ঞেস করলেন "কিছু বলবেন কি?"

ওয়েটারকি এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন "স্যার ডিনার করবেন না?"

মিঃ গুথ আপনাদের বসার স্থান হতে দৃশ্যমান আলোকিত হোটেলের গম্বুজ ঘড়ীর দিকে তাকালেন। আপনাদের দিকে ফিরে বললেন সরি সরি বুঝতে পারিনি এত রাত্রি হয়ে গেছে। আপনাদের নিশ্চয়ই ক্ষিদে পেয়েছে। আসলে এই হোটেলে এখন বেঙ্গল ফুড ফেসটিভ্যাল উইক চোলছে। তাই আগের থেকে খাবারের অর্ডার দিই নি। ফলে ডিনারের সময়ও বলা হয়নি। সবকিছুরই ভাল মন্দ আছে। ক্ষিদে পেলে খাওয়াটা জমে। চলুন ফেসটিভ্যালের জন্যে বিশেষ ভাবে সজ্জিত ডাইনিং রুমটিতেই যাওয়া থাক। আপনার দিকে চেয়ে বললেন বাঙ্গালীবাবু আপনি খাবার অর্ডার দেবেন। সত্যজিৎ রায়ের চিত্রনাট্র থেকে ধার করে যদি বলার অনুমতি দেন তবে বলি আমি আর হেনরী সর্ব্বভূক এবং স্বল্পাহারী।

ডাইনিং রুমটি বীরভূম অঞ্চলের একটি গ্রামের অত্যন্ত সফল পরিস্ফুটন। আপনারা রাঙামাটির মাটির পথের ধারে নির্ম্মিত এক মাটির কুটিরের দাওয়ায় পাতা টেবিলে বসলেন। আলো আঁধারিতে এত সুন্দর ভাবে সাজান চারিদিক। এমনকি আলোর কাজের চাতুরতায় মাথার ওপর উন্মুক্ত আকাশে অজস্র তারার আলোতে চারিদিকে এক স্বপ্নময় জগৎ।

সদ্য স্নাতা, শুভ্রবাসনা, এক সুন্দরী বঙ্গ ললনার আবির্ভাব। হাতে চারটি মেনু কার্ড। "সুস্বাগতম, নমস্কার এবং শুভসন্ধ্যা। স্যার আপনাদের ডিনারের মেনু কার্ড।" মৃদ্যুভাষিনীর বিনম্র সম্ভাষণ।

আপনার পছন্দ করা খাবারের তালিকা :—

চামনমনি চালের সাদা ভাত, কচি এঁচড়ের তরকারি, সোনামুগের ডাল, মুচমুচে মৌরালা মাছ ভাজা, পদ্মার ভাপা ইলিশ। কচির পাঁঠার ঝোল। আলুবকরার চাটনি, শ্রীনিকেতনের তৈরি কলাইর ডালের পাঁপড় ভাজা। বেনারসের দুধিয়া ল্যাংড়া আম। গাঙ্গুরামের পয়োধি। কে সি দাসের রসগোল্লা। পানিয়-র‍্যালিসের রোজ সিরাপ।

স্ট্যানডার্ড বিগ ব্যাঙ থিয়োরীর ত্রুটি সংশোধন

সুস্বাদু এবং সুপক্ক খাবারে রসনা তৃপ্তির উপরান্তে আপনারা চারজন হোটেলের ফয়ারে আসনগ্রহ করলেন। সবার হাতে সুইস কটেজ ক্রিম সহযোগে আইরিস

কফির ধুমাইত কাপ। মিঃ গুথ মিঃ টায়ের দিক চেয়ে বললেন হেনরী আমাদের বক্তব্যের শেষ অংশটুকু তুমিই বল।

কফিতে একটা চুমুক দিয়ে মিঃ হেনরী টায় তাঁদের বক্তব্যের শেষ অংশের বলা আরম্ভ করলেন। বললেন দেখুন কসমিক মাইক্রোওয়েভ ব্যাক গ্রাউন্ড রেডিয়েসনের আবিষ্কারের পরে এটি প্রমাণিত যে বিশ্বের সর্বত্র তাপমাত্রা সমান ২.৭ ডিঃ কেলভিন। স্থান বিশেষে এই তাপমাত্রার তারতম্য মাত্র এক হাজার ভাগের এক ভাগ ডিঃ কেলভিন। এই তথ্য পরীক্ষীত ভাবে প্রমাণিত। এই ব্যাপারটি প্রমাণিত হওয়ার পর বিগব্যাঙ থিয়োরীতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি ধরা পড়ে। বিগ ব্যাঙ থিয়োরীর বৈধতা সম্বন্ধেও সন্দেহের সৃষ্টি হয়।

বিশ্বের তাপমাত্রা সর্বত্র সমান তখনই সম্ভব যদি প্রমাণ করা যায় বিশ্বের জন্মের পর বিশ্বের সমস্ত অংশের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল বিশ্বের জীবনদশায় কোন না কোন সময়ে। একমাত্র মহাকাশের সমস্ত অংশের মধ্যে সংযোগ থাকার ফলেই বিভিন্ন অংশের তাপমানের কোনপ্রকার তারতম্য সংশোধিত করা সম্ভব। সংশোধনে সমতা আসে।

একটি উদাহরণ দেওয়া থাক। যদিও উদাহরণটি সম্পূর্ণ সঠিক নয়।

ধরুণ আপনার বাড়ীর আপনার শয়নকক্ষের তাপমাত্রায় এবং আপনার রান্নাঘরের তাপমাত্রায় বৈষম্য বর্তমান। শয়ন কক্ষের তাপমাত্রা তুলনায় শীতল। ধরা যাক দুটি কক্ষের সমস্ত জানালা দরজা বন্ধ। কেবল দুটি কক্ষের মধ্যবর্তী দরজাটি খুলে দেওয়ার ফলে দুটি কক্ষের তাপমানের তারতম্য দুর হয়। দুটি কক্ষের তাপমাত্রা সমান হয়। মধ্যবর্তী দরজাটি খোলার কারণে দুটি কক্ষের মধ্যে সংযোগ বৃদ্ধি পায়। তাপমাত্রায় সমতা আসতে কম সময়ের দরকার হয়।

একইভাবে বিশ্বে জীবনদশায় কোন না কোন সময়ে বিশ্বের সর্বস্থানের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের প্রয়োজন। অন্যথায় বিশ্বের সর্বত্র তাপমানের সমতা অসম্ভব। স্ট্যানডার্ড বিগ ব্যাঙ থিয়োরীর মতানুসারে বিশ্ব সৃষ্টির পর কোন ভাবেই বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মধ্যে সংযোগ স্থাপন হওয়া সম্ভব নয়। নয় কারণ বিশ্বের সম্প্রসারণের হার সময়ের প্রবাহের, সময়ের গতির অধিক। ব্যাপারটি একটু বুঝিয়ে বলা যাক একটি ছবির সাহায্য।

ছবিতে দেখান ক এবং খ সম্প্রসারিত বিশ্বের দুটি বিপরীত প্রান্তের অবস্থান বিগ ব্যাঙের ১ বছর পর।

গ এবং ঘ ঐ দুটি প্রান্ত ১০০ কোটি বছর পর।

ঙ এবং চ একই দুটি প্রান্ত বর্তমানের কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর মিঃ টাই আবার বলতে আরম্ভ করলেন। বললেন মনে রাখবেন বিগ ব্যাঙের সময় বিশ্বের অবস্থা সম্বন্ধে আধুনিক মানুষ অন্ধ। অতঃপর বিশ্বের সম্প্রসারণ। বিগ ব্যাঙ থিয়োরী অনুযায়ী ক এবং খ এর দূরত্ব ১ আলোক বছরের অধিক।

গ এবং ঘ এর দূরত্ব ১০০ কোটি আলোক বছরের অধিক ঙ এবং চ এর দূরত্ব ১৩৭০ আলোক বছরের অধিক। অতএব বিগ ব্যাঙের ক্ষণকাল পরেই বিশ্বের কোন প্রান্ত হতে আলোর যাত্রা আরম্ভ করার পর সেই আলোর পক্ষে বিপরীত প্রান্তে পৌছন অসম্ভব।
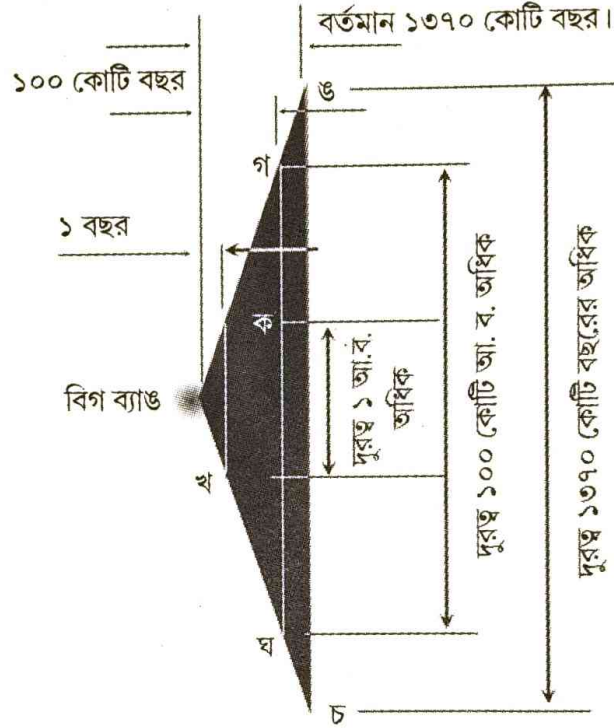
বিগ ব্যাঙের উপরান্তে বিশ্বের সম্প্রসারণ

এই কারণেই বিগ ব্যাঙ থিয়োরীর মতানুসারে বিশ্বের সর্ব্বস্তরের মধ্যে সংযোগ অসম্ভব। সংযোগের অবর্তমানে CMB এ দ্বারা বিশ্বে সর্বত্র সমতাপমাত্রা প্রমাণিত ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়।

মিঃ গুথ এবার বলতে আরম্ভ করলেন। বললেন আমাদের ইনফ্লেসমারী বিগব্যাঙ থিয়োরী এই ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করতে সক্ষম।

এই থিয়োরীর মতে বিগব্যাঙের পরেই ১০$^{-১৪}$ সেকেণ্ড সময়ের মধ্যে বিশ্বের সম্প্রসারণের হার আলোর গতির হারের কম ছিল। এই সময়ের মধ্যে বিশ্বের সমস্ত প্রান্তের মধ্যে সংযোগ ছিল এবং যদি তাপমাত্রায় কোন তারতম্য থাকলেও তা সর্বত্র সমতাপ মাত্রায় সংশোধিত হয়েছিল। এই সংশোধনের পরেই ইনফ্লেসন ব্যাপারটি ঘটেছিল।

স্ট্যানডার্ড বিগ ব্যাঙ থিয়োরীর এই ত্রুটিটিকেই বলা হয় হরাইজান (Horizon Problem) পদার্থ বিজ্ঞানীদের ভাষায় হরাইজনের অর্থ ''বিগ ব্যাঙের সময় হতে মহাকাশের কোন স্থান থেকে আলোর রেখা মহাকাশের যে স্থান পর্যন্ত যে দূরত্ব

অতিক্রম করে সেই দূরত্বের ব্যাসার্ধ গোলকটিকেই কসমিক হরাইজন বলা হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় পৃথিবীর থেকে সর্ব্বাধিক দূরত্ব দেখা সম্ভব হয়েছে প্রায় ১২০০ কোটি বছর। অতএব পৃথিবীকে কেন্দ্র করে যদি ১২০০ আলোক বর্ষের একটি গোলক চিন্তা করা হয় তবে ঐ গোলকের অভ্যন্তরের সমস্ত স্থান পৃথিবীর দৃষ্টিগত অর্থাৎ ঐ সব স্থানের পৃথিবীর সঙ্গে সংযোগ স্থাপিত। গোলকের বাইরের স্থান পৃথিবীর অঙ্গাত। সময়ের সঙ্গে গোলকটির আয়তনের বৃদ্ধি ঘটে মহাকাশের সম্প্রসারণের কারণে। এই গোলকটিই পৃথিবীর কসমিক হরাইজন। অতীতে গোলকটির আতয়ন কম ছিল।

এই বলে মিঃ গুথ দুটি ছবি টেবিলের ওপর রাখলেন। বল্লেন এই দুটি ছবি হল বিশ্বের জীবন পঞ্জিকা। একটি স্ট্যানর্ডাড বিগ ব্যাঙ থিয়োরী অনুযায়ী। অপরটি ইনফ্লেসনারী সংশোধনের পর।
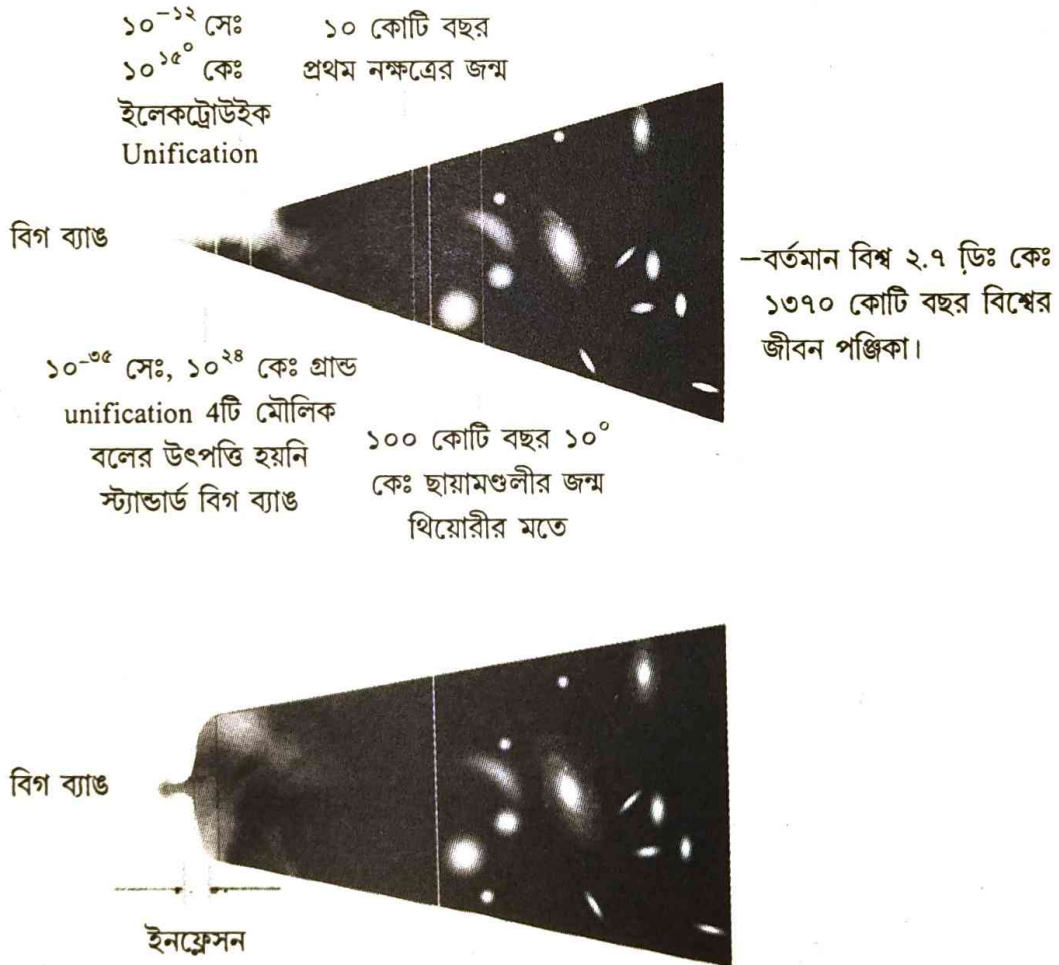
ইনফ্লেসনারী বিগ ব্যাঙ থিয়োরীর মতে বিশ্বের জীবন পঞ্জিকা

মি গুথ ছবি দুটি টেবিলের ওপর রেখে বল্লেন "ছবি দুটি দেখলেই সব বুঝতে পারবেন"। এই বলে তিনি তার কফির কাপে শেষ চুমুক দিয়ে কাপটি নামিয়ে রাখলেন টেবিলে।

এবার স্ট্যানডার্ড বিগ ব্যাঙ থিয়োরীর আর একটি ত্রুটির কথা আপনাদের বলবে হেনরী।

বিগ ব্যাঙের ফ্লাটনেস ত্রুটি

মিঃ হেনরী টাই তাঁর কাপের কফি শেষ করার পর জিজ্ঞেস করলেন "আচ্ছা আপনাদের দুজনের মধ্যে কেউ কি বলতে পারেন আমাদের ব্রহ্মাণ্ডটি দেখতে কেমন? কি এর আকৃতি? লম্বা? গোল? আয়তক্ষেত্র? বর্গক্ষেত্র? অথবা অন্য কোন আকৃতি?

বিশ্বের আকৃতি

আপনার ইংরেজ বন্ধুটি বললেন "এই বিষয়ে যদি আমার পড়াশুনা করা নেই তবুও একটা আন্দাজ করতে পারি। যা কিছু মহাকাশিয় বস্তুর ছবি দেখি তার অধিকাংশের আকৃতির একটি গোলক। সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, উপগ্রহ সবেরই আকৃতি গোলাকার। এ ছাড়া গভীর মহাকাশের সমস্ত ছায়ামণ্ডলীর যে সব ছবি দেখি বেশির ভাগ চ্যাপটা ডিসের মত। অতএব ব্রহ্মাণ্ডের আকার একটি চাকতির মত এও সম্ভব। তবে আমার অনুমান বিশ্ব গোলাকার।

আপনি এক বাক্যে আপনার বক্তব্য রাখলেন। বললেন "আমারও মত ব্রহ্মাণ্ড "গোলকাকৃতি"

মিঃ টাই বললেন অধিকাংশ মানুষের ধারণাও এক। আসুন বিজ্ঞান ভিত্তিক ভাবে উত্তরটির চেষ্টা করা যাক।

আমরা কি কি জানি আমাদের বিশ্বটির সম্বন্ধে? আমরা জানি

১) বিশ্বটি সামগ্রিকভাবে প্রতিসম (symmetrical)

২) সম্প্রসারিত বিশ্ব

৩) অসীম বিশ্ব।

বিশ্বের যে কোন আকৃতিতেই হোক না কেন বিশ্বের সীমা বলে কিছু নেই। প্রতিসমতা অর্থে বিশ্বের যে কোন স্থানের সঙ্গে অপর একটি স্থানের মধ্যে অবস্থাগতভাবে কোন পার্থক্য নেই।

মি. টাই বললেন সীমা নেই বলতে আমি বোঝাতে চাইছি যে বিশেষ কোন একদিকে এই বিশ্বের কতদূর বিস্তার এই প্রশ্ন অর্থহীন। আপনি যে কোন এক স্থান থেকে যে কোন দিশায় যাত্রা আরম্ভ করার পর যাত্রা অন্তে পুনরায় যাত্রা আরম্ভের স্থানেই পৌছবেন।

জ্যামিতি-তে এই রকম কোন আকৃতিকে বলা হয় টোরাস (TORUS)। একটি স্ফিত গাড়ীর টিউবের আকৃতি একটি টোরাস। যে কোন গোলক একটি টোরাস। টোরাস সম্পূর্ণভাবে প্রতিসম।

সমস্ত একাকার আকার এবং আকৃতির মধ্যে মাত্র তিনটি আকারের মধ্যে প্রতিসমতা এবং অসীমত্ব বর্তমান। বিশ্বাস করুন হাজার হাজার ভিন্ন আকার আকৃতির মধ্যে তিনটি মাত্র আকারের মধ্যে এই দুটি গুন বিদ্যমান। এটি গাণিতিক ভাবে প্রমাণিত। এই তিনটি আকার হল

১) গোলকাকৃতি
২) স্যাডেল আকৃতি
৩) চ্যাপ্টা সমতল আকৃতি
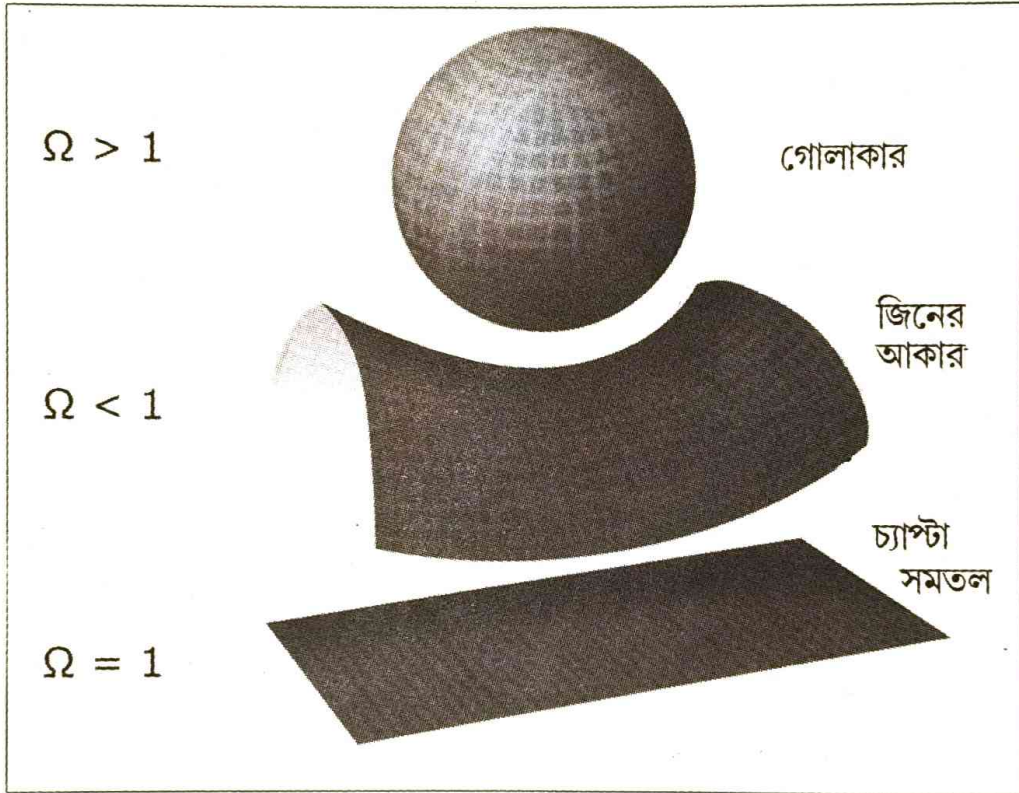
বিশ্বের সম্ভাব্য আকার

মি. টাই আপনাকে জিজ্ঞেস করলেন বাঙ্গালীবাবু স্যাডেল বোঝেন তো?

আপনি বললেন জানি স্যার অশ্বারোহনের জন্যে অশ্বপৃষ্ঠে যে বিশেষ আকারের আসন ব্যবহৃত হয় সেইটিকেই ইংরেজি ভাষায় স্যাডল বলে। বাংলায় বলে "জিন"।

আপনার উত্তরের সমর্থনে মি. টাই তাঁর ঘাড় নাড়লেন। বললেন এই তিনটি আকৃতিকে গনিতের ভাষায় বলা হয়—

১) গোলকের বক্রতা ধনাত্ত্বক (Positive)। বহিঃদিশায় স্ফিত।
২) জিনের বক্রতা ঋণাত্ত্বক (গোলকের. বিপরীত)। অর্ন্তদিশায় সঙ্কুচিত।
৩) চ্যাপ্টা সমতল আকৃতি বক্ততা শূন্য।

বিশ্বের এই তিনটি সম্ভাব্য আকৃতির মধে কোনটি বিশ্বের আকৃতি নির্ভর করে বিশ্বের ঘনত্ত্ব এবং সঙ্কট ঘনত্বের আনুপাতিক হারের ওপর। সঙ্কট ঘনত্ব (critical density)।

হাত তুলে সঙ্গে সঙ্গে আপনার জিজ্ঞাসা "স্যার সংকট ঘনত্ত্বের" ব্যাপারটা বুঝলাম না। বিশ্বের ঘনত্ত্ব বলতে আপনি নিশ্চয়ই বলছেন "বিশ্বের সমষ্টিগত সমস্ত পদার্থের ভর এবং বিশ্বের সমস্ত শক্তির সঙ্গে বিশ্বের ঘনমানের (volume) এবং ভাগফল।

মি. টাই মুচকি হেসে বললেন আমি জানতাম আপনার কাছ থেকে এই প্রশ্ন আসছে।

বললেন মহামান্য আইনস্টাইন তাঁর জেনারেল থিওরী অফ রিলেটিভিটি অনুসারে প্রমান করেন যে বিশ্বের আকৃতির বক্রতা, ধনাত্মক, অথবা ঋণাত্মক অথবা বক্রতাশূন্য চ্যাপ্টা সমতল, নির্ভর করে মহাকাশে নির্দিষ্ট ঘনমানে (volume)-এ উপস্থিত সমষ্টিগত পদার্থের ভর এবং শক্তির উপস্থিতির ওপর। বিশ্বের একক ঘনমানে (unit volume) পদার্থের সমষ্টিগত ভর এবং শক্তির পরিমাণকে বলা হয় ক্রিটিক্যাল ডেনশিটি (Critical Density)। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে রাশিয়ান পদার্থ বিজ্ঞানী আলেকজাণ্ডার ফ্রায়েডম্যান (Alexandar Friedman (১৮৮৮-১৯২৫) আইনস্টাইনের GTR ব্যবহারের দ্বারা জগতের আকৃতি নির্ণয় করেছিলেন। ফ্রয়েডম্যানের সমীকরণ অনুযায়ী সংকট ঘনত্ত্ব হবল কন্সট্যান্টের বর্গের আনুপাতিক।* ফ্রায়েডম্যানের সমীকরণ ব্যবহারে বিশ্বের ক্রিটিক্যাল মনত্ত্বের পরীক্ষিতভাবে নির্ণীত মান "প্রতি ঘনমান মিটারে (cubic Meter) এ ছয়টি হাইড্রোজেন পরমাণুর সমান। (6 H_2 atoms p8 cubic meter of volume) অথবা ওজনের পরিভাষায় বলা যায় ১×১০^{-২৯} গ্রাম প্রতি কিউবিক সেন্টিমিটার ঘনমানে। অর্থাৎ ০.০০০,০০০, ০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০১ গ্রাম প্রতি ১ সেন্টিমিটার কিউব ভলিউম এ। আপাতদৃষ্টিতে অত্যন্ত ক্ষুদ্র এই মাত্রা। বিশ্বে বিশালত্ত্বে এই মাত্রা অসীম।*

---

* ক্রিটিক্যাল ঘনত্ব $Pc \propto H^2$ H=হাবল কন্সট্যান্ট। এডউইন হাবেল এর হাবল সূত্র অনুযায়ী $\vartheta=H\times d$ যেখানে ϑ= পৃথিবীর থেকে ছায়ামণ্ডলীর দূরে সরে যাওয়ার গতি। এবং d=পৃথিবী হতে ছায়ামণ্ডলীর দূরত্ব। বিভিন্ন আধুনিক পরীক্ষা দ্বারা এবং বিভিন্ন সমীকরণের দ্বারা নির্ণীত হাবল কন্সট্যান্টের মান এখন ৭১ কি.মি./ সেকেন্ড. মেগা পারসেক (Mega persec)/পারসেক :— কসমোলজিতে ব্যবহৃতে বিভিন্ন মহাকাশিয় বস্তুর দূরত্বের একক। ১ পারসেক=৩.২৬ আলোকবর্ষ =৩০.৮×১০^{১২} কি.মি.। অর্থাৎ ৩০৮০০০০০০০০০০০ কি.মি.।

সৌর জগতের ব্যাস : .02 MPc (MPc=Mega persec=1million per sec= 1 million or 1,000,000 per sec), আকাশগঙ্গার পার্শ্ববর্তী ছায়ামণ্ডলী এ্যানড্রমেডা Andrameda-র দূরত্ব=0.6 MPc/দূরবর্ত্তী ছায়ামণ্ডলীগুচ্ছ ভারগো ক্লাসটার=16-22 MPc.

এই বলে মি. টাই কিছুক্ষণ দম নিয়ে পুনরায় তাঁর বক্তৃতা জারি রাখলেন। বললেন—

বিশ্বের ঘনত্বের (ρ) এবং ক্রিটিক্যাল ঘনত্বের (ρ_c) অনুপাতিক হারকে গ্রিক বর্ণমালার Ω (ওমেগা) বর্ণ দিয়ে নির্দ্দেশিত করা হয়ে। ($\Omega = e/\rho_c$)

Ω পরিমান ১কের অধিক অর্থে বিশ্বের আকার গোলাকার

Ω পরিমান ১কের ক্ষুদ্র অর্থে বিশ্বের আকার জিনাকার।

Ω পরিমান ১কের সমান অর্থে বিশ্বের আকার চ্যাপ্টা সমতল।

আধুনিক কসমোলজির থিওরী এবং পরীক্ষিত ভাবে Ω গার নির্ণীত মান ১কের সমান। বলা উচিত প্রায় সমান। অর্থাৎ **বিশ্বের আকৃতি চ্যাপটা সমতল (Flat) এবং বিশ্ব অসীম ও সদা স্ফীতমান।**

যথারীতি হাত তুলে আপনার প্রশ্ন 'স্যার দয়া করে কিছু মনে করবেন না আপনাকে আবার বাধা দেওয়ার জন্যে।

মি. টাই হেসে বললেন না না কেন মনে করব? মহাজ্ঞানী আইনস্টাইন বলতেন "সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিষ হল, প্রশ্ন করা বন্ধ না করা।" বলুন আপনি কি প্রশ্ন আপনার?

আপনি জিজ্ঞেস করলেন "স্যার বিশ্বের আকৃতি চ্যাপ্টা সমতল, অথচ অসীম। বুঝতে পারছিল এটা কি ভাবে সম্ভব? চ্যাপ্টা সমতল বিশ্বের নিশ্চয়ই একটি সীমা বর্তমান। বিশ্বের কোন এক স্থান থেকে এক নির্দিষ্ট দিশায় যাত্রারম্ভের পর নিশ্চয় কোন না কোন এক সীমাতেই এই যাত্রার অন্ত? গোলাকার বিশ্বের আকারে সীমার অসীমত্ত্বা চিন্তা করা সম্ভব। কিন্তু চ্যাপ্টা সমতল ক্ষেত্রের পক্ষে দিশার অসীমত্ত্বা কিভাবে সম্ভব? যদি একটু বুঝিয়ে বলেন।

মি. টাই বললেন "আমেরিকার পদার্থবিদ, স্ট্রিং থিওরিস্ট এবং বিখ্যাত বিজ্ঞান লেখক মি, ব্রায়েন গ্রীন তাঁর বেস্টসেলার বই "দি ফেবরিক অফ দি কসমস"-এ এই সম্বন্ধে একটি অতি চমৎকার উপমা দিয়েছেন। চিন্তা করুন একটি ভিডিও গেমের কথা। কোন বহিঃ জগতের আক্রমণকারী জীবকে পৃথিবীর মানুষের বন্দুক দিয়ে মারার চেষ্টা। বহিঃ জগতের জীবগুলি মনিটারের ডানদিকে বেরিয়ে গেলেও সঙ্গে সঙ্গে বাঁদিকে আবার আবির্ভূত হয়। অনুরূপভাবে পৃথিবীর মানুষ মনিটারের ওপরটিতে মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে নিচের দিকে আবির্ভূত হয়। মনিটারটিকে যেমন একটি চাদর জড়িয়ে রয়েছে। এমন ভাবে জড়িয়ে রয়েছে কোন দিকেও চাদরের কোন অংশ অবশিষ্ট নেই। একেবারে খাপে খাপে জড়িয়ে আছে। বহিঃ জগতের জীবেরা এই চাদরের মধ্যে বিচরণ রত ভিডিও স্ক্রিনের বাঁদিক থেকে ডান দিকে। পৃথিবীর মানুষও জড়ান চাদরটিতে বিচরণ রত নিচ থেকে ওপরে। আপনি বাইরের থেকে দেখছেন বলে আপনার মনে হচ্ছে বহিঃজগতের জীবগুলি স্ক্রিনের ডানদিকে মিলিয়ে গিয়ে বাঁ দিকে আবার বের হচ্ছে। অনুরূপভাবে পৃথিবীর

মানুষ বন্দুক ছুড়তে ছুড়তে নিচে থেকে বের হয়ে ওপরে মিলিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু চিন্তা করে দেখুন ভিডিও স্ক্রিনের বহিঃজগতের জীবদের অথবা, পৃথিবীর মানুষের কিন্তু মনে হচ্ছে তারা দৌড়চ্ছে তো দৌড়চ্ছেই। তাঁদের দৌড়ের শেষ নেই।

চ্যাপ্টা সমতল অথচ অসীম বিশ্বও ঠিক এই রকমই ব্যাপার। কেবল ভিডিও গেমটি দুই দিশায় (2 Dimensinal)। এবং চ্যাপ্টাটা সমতল বিশ্বটির দিশা তিনটি। এর আকার একটি চ্যাপ্টা সমতল তিন দিশার টোরাস/ চিন্তা করুন এক অসীম দৈর্ঘের, অসীম প্রস্থের আর অসীম উচ্চতার একটি কিউব। সদা স্ফিতমান একটি কিউব। কিউবের অভ্যন্তরে অবস্থিত অসংখ্য ছায়ামণ্ডলীর পরস্পরের দূরত্ব কিউবটির সম্প্রসারণের কারণে সদা বর্দ্ধিত। বাইরে থেকে দেখলে মনে হতে পারে যে কোন একটি ছায়ামণ্ডলী কিউবটির যে কোন একটি দিকের কোন এক সীমানা অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গেই পার্শ্ববর্ত্তী দিকে ছায়ামণ্ডলীটির উদয় ঘটছে। কিন্তু ছায়ামণ্ডলীর পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বের সম্প্রসারণের কারণে সেটির গতি অপ্রতিহত।

এই বলে মি. টাই তাঁর চেয়ারটি পেছনের দিকে হেলিয়ে ইজি হয়ে বসলেন। আমাদের জিঙ্কস করলেন আমি কি আপনাদের চ্যাপ্টা সমতল এবং অসীম বিশ্বের আকৃতি বুঝতে পেরেছি?

আপনার সহাস্যে উত্তর এক্কেবারে জলের মত বুঝিয়ে দিয়েছেন। এই না হলে এত নাম ডাক। স্যার হয়ত বা বলা যায় আমাদের সীমিত জ্ঞানের চৌহদ্দিতে অসীমের অঙ্গীকার। মি. টাই বললেন, "এ্যালেন আজকের মত আমাদের আড্ডা তোমার বক্তব্যেই শেষ হোক। এবার তুমি বল।"

মি. গুথ চেয়ারে সোজা হয়ে বসলেন। বললেন চলুন অনেকক্ষণ জমিয়ে আড্ডামারার ইতি টানার সময় হয়ে এল। আমি আপনাদের বিগব্যাঙ থিওরীর অপর একটি ত্রুটির কথা উল্লেখ করব এবার।

হেনরীর বক্তব্য থেকে এই ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে বিশ্বের আকার চ্যাপ্টা সমতল। এ ছাড়াও এর আকার হয়ত আয়তকার অথবা বর্গকার।

বিশ্বের এই সব আকৃতির চিন্তা করা অমূলক। কেবল মনে রাখা প্রয়োজন বিশ্বের আকৃতি চ্যাপ্টা সমতল। বিশ্বের আকৃতিতে বিশ্বের আকাশ এবং সময়ের কাঠামোটিতে কোন প্রকারের বক্রতার অবকাশ নেই। শূন্য বক্রতার বিশ্ব এইটি অত্যন্ত মূল্যবান আবিষ্কার।

ধনাত্মক (positive) বক্রতায় মাধ্যাকর্ষণ বল বিশ্বকে শাসন করত। নির্দ্ধারণ করত বিশ্বের ভবিষ্যত। এই বলের আধিক্যে বিশ্বের সংকোচন আরম্ভ হত বিশ্বের জীবনকালের কোন এক সময়। সেই সময় যখন ক্রম ক্ষীণমান বিশ্বের স্ফীতির কৌণিক ভরবেগকে (expansion mamentum) ক্রম বর্দ্ধমান মাধ্যাকর্ষণ বল সম্পূর্ণ প্রতিহত করার উপরান্তে আপন শাসন জারী করত। আরম্ভ হত বিশ্বের সঙ্কোচন। ভবিষ্যতে কোন একদিন প্রায় শূন্য অবস্থায় বিশ্বের অবলুপ্তি ঘটত। বিগ

ব্যাঙের বিপরীত চিত্র। বিশ্বের জীবনযাত্রার বিপরীতকরণ। Rewinding of Universe life. বিশ্বের এই অবস্থাকে বলা হয় Big Crunch। বিশাল চর্বণে বিশ্বের অবলুপ্তি।

ঋণাত্মক (Negative) বক্রতায় বিশ্বের সম্প্রসারণের হার বর্দ্ধিত হত। ঘনত্বের মান তলানীতে এসে ঠেকত। ছায়ামণ্ডলী, গ্রহ, উপগ্রহ ইত্যাদি মহাকাশীয় বস্তুর উদ্ভব সম্ভব হত না। প্রায় শূন্য অবস্থায় বিশাল বেগে সম্প্রসারিত বিশ্ব—এই হত বিশ্বের অবস্থান।

একমাত্র চ্যাপ্টা সমতল বিশ্বের আকৃতির কারণেই বিশ্বের বর্তমান দশা। বিশ্বের বর্তমান পরিচয়। বিশ্বের বর্তমান অবস্থা।

আধুনিক বিজ্ঞান, আধুনিক কসমলজির জ্ঞান, কৃত্তিম উপগ্রহ দ্বারা সংগৃহীত তথ্য, এই সবই একই দিকে অঙ্গলী নির্দ্দেশিত করে। বিশ্বের আকার চ্যাপ্টা সমতল। বিশ্বের দীর্ঘ স্থায়িত্বের জন্য বিশ্বের এইটিই একমাত্র সম্ভাব্য আকৃতি। বিগ ব্যাঙ থিয়োরী বিশ্বের এই চ্যাপ্টা সমতল আকৃতিটির গ্যারেন্টি (Guarantee) দেয় না। আশ্বাস দেয় না। এইটিই বিগ ব্যাঙ থিওরীর অপর ত্রুটি।

বিগ ব্যাঙ থিওরীর অনুসারে ব্রহ্মাণ্ডের জন্মক্ষণে অথবা জন্মক্ষণের $১০^{-৮৩}$ সেকেন্ড (প্লাঙ্ক Plank সেকেন্ড) পরে ব্রহ্মাণ্ডের Ω ওমেগার মান সঠিক ১-এ থাকা দরকার। অন্যথায় বিশ্বের জীবনযাত্রায় হত আমূল পরিবর্তন। ওমেগার Ω এই একক মানের অতি সামান্য তারতম্যের ফলে বিশ্বের অধুনা চ্যাপ্টা সমতল রূপটি পরিবর্ত্তিত হত। পরিবর্ত্তিত হত সাংঘাতিকভাবে। এই ব্যাপারটি সংখ্যা দিয়ে বলি আপনাদের। যদি বিগব্যাঙের ১ সেকেন্ড পরে ব্রহ্মাণ্ডের ঘনত্ব যদি সঙ্কট ঘনত্বের (critical density) ৯৯.৯৯ শতাংশ থাকত তাহলে বিশ্বের সম্প্রসারণের কারণে এই সামান্য তারতম্যটিও সম্প্রসারিত হয়ে এখন বিশ্বের ঘনত্ব হত সঙ্কট ঘনত্বের ০.০০০,০০০,০০০,০১ ভাগের সমান। এই সংখ্যা গাণিতিক ভাবে নির্ণীত। ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব হত বিপন্ন।

অপরদিকে বিশ্বের ১ সেকেণ্ড বয়সে ঘনত্বের অনুরূপ আধিক্যে বিগব্যাঙে বিশ্বের বিলুপ্তি ঘটত হাজার কোটি বছর পূর্বে।

আমাদের আবিষ্কৃত ইনফ্লেসমারী কসকোলজী বিগব্যাঙ থিওরীর এই ত্রুটি দূর করে।

ইনফ্লেসনের সময় অত্যন্ত নগণ্য সময়ে বিশ্বের অসামান্য বিস্তার বিশ্বের এবং সংকট ঘনত্বের মধ্যে সামান্য তারতম্যকে (যদি তারতম্য থাকত) সংশোধিত করে। বিশ্বকে সরু দড়ির ওপর চলার হাত হতে রক্ষা করে।

মি. গুথ অবশেষে বললেন চলুন আজ এই পর্যন্ত। দারুন আড্ডা জমেছিল। আজকের সন্ধ্যা খুব উপভোগ করলাম। হয়ত নিজেদের গুনগান গাইলাম সারাক্ষণ। যদিও বিশ্বের ইতিবৃত্ত এবং বিশ্বের পরিণতির বিশ্লেষণে কৃতিত্বের উল্লেখ কেবল

বিশ্লেষণের প্রয়োজনে উল্লেখ।

আপনার সম্ভ্রমী উত্তর " কি যে বলেন স্যার? ভারতে একটি কহাবত আছে" "কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হও"। আজ উপলব্ধি করলাম কথাও কত মহৎ কাজ করে। আপনারা কথা ও কাজের মধ্যে দূরত্ব অদৃশ্য করেন, ভেদাভেদ দূর করেন। আজকের এই আড্ডায় প্রমাণিত হল "মানুষের সম্পদ অর্থে নয়, সম্পদ জ্ঞানে। এমন একটি মধুর সন্ধ্যা উপহার দেওয়ার জন্যে আপনাদের অজস্র ধন্যবাদ। শুভ রাত্রি।

মি. এ্যালেন গথ এবং মি. হেনরী টাই উভয়েই উঠে দাঁড়িয়ে করজোড়ে বিদায় সম্ভাষণে বললেন "ধন্যবাদ, শুভ রাত্রি, সাবধানে যাবেন।"

আপনি এবং ইংরেজ বন্ধু মধরাত্রে ঘুমন্ত জয়পুরের নির্জন রাস্তা দিয়ে পদব্রজে নিজেদের হোটেলে ফিরলেন।

একাদশ অধ্যায়

অন্ধকার বস্তু অন্ধকার শক্তি

আসুন সুভ্রতার আলোতে পরিচিত হই
বিশ্বের বিস্ময় ''অন্ধকার বিশ্বের সাথে।''

আপনি আর আপনার বহুদিনের পুরোন বন্ধু কেদারনাথ ধাম দর্শনে গেছেন। মন্দিরের অনতি দূরে গরওয়াল মণ্ডল বিকাশ নিগমের যাত্রী নিবাসে রাত্রি যাপনে মনস্থ করেছেন। নৈশ ভোজনের উপরান্তে নিবাসের বারান্দায় আরাম কেদারায় বসে প্রকৃতির রূপ অবলোকন করছেন আপনারা দুজন।

উষাকালে গৌরীকুণ্ড হতে যাত্রা আরম্ভ করেছিলেন আপনারা। ১৪ কি.মি. পাহাড়ী রাস্তা পদব্রজে অতিক্রমের পর কেদার দর্শন হয়েছিল আপনাদের। ভিকাস নিবাসের আরামদায়ক কক্ষে বিশ্রামের ফলে এখন আপনাদের পথক্লান্তির পূর্ণ নিরসন।

পেঁজা তুলোর মত বরফ পড়া দেখছেন। চতুর্দিক বরফে ছাওয়া। চতুর্দিক সাদা। পাহাড় সাদা, সামনের উন্মুক্ত প্রান্তর সাদা। গাছপালা সমস্ত সাদা। বরফ পড়ার মধ্যে দিয়ে দেখা যায় ধুসর আকাশ। কেমন যেন বেমানান। নিস্তব্ধ, নিথর পৃথিবী। তুষারাবৃত সুউচ্চ পর্ব্বতে বেষ্টিত ''ক্ষুদ্র'' পৃথিবী। কোন প্রকার শব্দের অনুপস্থিতির নিঃশব্দ পৃথিবী। বরফে হাল্কা নীল আলোয় আলোকিত পৃথিবী। এ এক মোহময় জগৎ। এক আশ্চর্য, অনির্বচনীয় দৃশ্য। রূপে গরবিনী নগ্ন উন্মুক্ত পৃথিবী রূপ প্রদর্শনে উন্মত্ত। প্রকৃতি শাসিত পৃথিবী। প্রকৃতিই মুখ্য। অন্য সব কিছুই গৌণ।

আপনাদের মন সচেতনতা হারায়। বাস্তব অবাস্তবের তফাত লুপ্ত হয়। এক নৈসর্গিক আনন্দে আপ্লুত হয় আপনাদের মনপ্রাণ, হৃদয়। বিস্মৃত হয় নিজ অস্তিত্ব। প্রকৃতির এই মনমোহিনী রূপ পান করেন আকণ্ঠ ভরে। মনে হয় সার্থক জনম মোর জন্মেছি এই দেশে।

আপনার সচেতনতা ফিরে আসে নিঃশব্দতা ভঙ্গকারী আপনার বন্ধুর প্রশ্ন। দারুণ দৃশ্য তাই না?

ঠাহর করেননি এতক্ষণ। বারান্দার অপরপ্রান্তে উপবিষ্ট। আপাদমস্তক চাদরে আবৃত হয়ত বা এই পৃথিবীরই কেউ অস্ফুষ্ট স্বরে বলে ওঠেন ''কথা নয় প্লিজ।'' নেশা কেটে যাবে।

ধরাধামের তামসী রাত্রির ভৈরবী রূপদর্শনে এবং নিঃশব্দতার অমৃত বাণীতে চৈতন্য হারান আপনারা আবার।

পরের দিন সকালে বিকাশ নিগমের নিবাসের একই বারান্দায় বসে প্রাতঃরাসে ব্যস্ত আপনারা। এক ভদ্রলোক আপনাদের টেবিলের কাছে এসে বললেন, ভদ্রমহোদয়গণ সুপ্রভাত। রাত্রে স্বর্গবাসিদের কথাবার্তা শুনলেন? রাত্রের বারান্দায় অপরপ্রান্তে উপবিষ্ট ভদ্রলোক। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতেই চেয়ারছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন আপনি। বললেন "অনেক অনেক সুপ্রভাত আপনাকে স্যার। বসুন বসুন প্লিজ। কি সৌভাগ্য আমাদের।

তৎক্ষণাৎ চিনতে পারলেন আপনি। মহাশয়ের নাম জয়ন্ত বিষ্ণু নারলিকার। সদাহাস্যময় সবার প্রিয় নারলিকার। কলিঙ্গ পুরস্কার বিজেতা আমাদের ভারতের অন্যতম কসমোলজিস্ট নারলিকার। নির্ভেজাল মানুষ। তপস্বী মানুষ নির্ভেজালই হয়। ভেজালের জায়গা কোথায়? শয়নে, স্বপনে, জাগরনে চিন্তা যে এক।

চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, "স্বর্গবাসীদের কথাবার্তা শুনতে পাওয়া কেন বললাম জানেন? জানি তো শুনতে পাননি। আমিও পাইনি। পৃথিবীর কোন মানুষই হয়ত পায়না। স্বর্গবাসীদের কথাবার্তা যে বাতাসের পরমাণুগুলিকে কম্পিত করে না। ফলে বাতাসের পরমাণুগুলি আমাদের কানের পর্দাকে আঘাত করে না। আমরাও শুনতে পাই না। কেবল মহাপুরুষরা স্বর্গবাসীদের কথাবার্তা শুনতে পারেন। মহাপুরুষদের শোনার জন্য কানের পর্দার স্পন্দনের প্রয়োজন হয় না। ওঁনারা মন দিয়ে শোনেন। মনের পর্দা স্পন্দিত হয় অন্য কারণে। যাক সে কথা আমরা সাধারণ মানুষ। চলুন সাধারন কথাই বলা যাক। আপনারা কি হেঁটে গৌরীকুণ্ড যাবেন? আপনাদের ইতিবাচক উত্তরে বললেন, আমিও তাই। প্রকৃতির সঙ্গে অন্তরঙ্গ হওয়ার শ্রেষ্ঠ উপায়।

কেদারের পাথর আর বরফের রাজ্য ছেড়ে আপনারা তিনজন গৌরীকুণ্ডের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। কিছুটা যাওয়ার পরই সবুজের সমারহ। পাহাড়ী জঙ্গল। দুতুর্দিক জঙ্গলে ভরা পাহাড় আর পাহাড়। সুউচ্চ সব পাহাড়। শীর্ণ সর্পিল রাস্তার একপাশে বিশাল জঙ্গলে পাহাড়। অন্যদিকে জঙ্গলে গভীর খাদ। পাহাড় কেটে তৈরী রাস্তা। খাদের পরেই অন্য আর একটি জঙ্গলে পাহাড়। পাহাড়ের রাজ্য। যতদুর দৃষ্টি যায় চোখে পড়ে না সমতলের কোন চিহ্ন। মাঝে মাঝে উল্টো পথের যাত্রীদের সঙ্গে দেখা। কেউ বা ঘোড়ায়, কেউ বা ডোলিতে আবার কেউ বা আপনাদেরই মত পদব্রজে। ঘোড়াদের গলায় বাঁধা ঘণ্টার তালে তালে টুং টুং আওয়াজ। অপরদিকের যাত্রীদের সাথে "জয় কেদার" "জয় কেদার" পুণ্য সম্ভাষণের বিনিময়।

মাঝে মাঝে পাহাড়ী ঝর্ণার শিশু সুলভ লাফালাফি। ডানদিকের পাহাড় হতে ঝর্নার উন্মত্ত জলধারা রাস্তার ফুট ব্রিজের তলা দিয়ে বাঁদিকের খাদের জঙ্গলে হারিয়ে

যায়। প্রসারিত হস্তে অপেক্ষারতা প্রকৃতি মায়ের বক্ষে ঝাঁপ দিয়ে অন্তর্হিত হয় ঝর্না। শোনা যায় কেবল শীলা হতে শীলাস্তরে জল পড়ার আওয়াজ। এ হল সেই প্রকৃতি যার রূপ ব্যাহত হয়নি মানুষের থাবায়। অক্ষত যুবতী প্রকৃতি।

এক ঘণ্টা পথ চলার পর আপনারা পৌঁছলেন এক ছোট্ট ভুইফোঁড় সমতল ভূমিতে। ছোট্ট জনপদ। কয়েকটা চালা বাড়ি। গুটি কয়েক জলখাবার চায়ের দোকান। গৌরী চট্টি। নারলিকার সাহেবের প্রস্তাব "চলুন গরম চা খাওয়া যাক।"

গরম চায়ে চুমুক দিয়ে প্রফেসার নারলিকার বললেন আমরা যেমন স্বর্গবাসীদের কথা শুনতে পায়না সেই রকম আমরা মানুষেরা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মাত্র ৫ শতাংশ পদার্থ দেখতে পায়। দেখতে পাই মানে যা চোখের সাহায্যে দেখতে নায়, দৃশ্যমান আর যা কেবল যন্ত্রের দ্বারা দৃশ্যমান। যন্ত্রের সাহায্যে দৃশমান কারণ কোন কোন মহাকাশিয় বস্তু X-রে তরঙ্গে দৃশ্যমান, কোন কোন গামা রে তরঙ্গে দৃশ্যমান। কেউ বা ইনফ্রারেতে দৃশ্যমান। এই সমস্ত পদার্থের সমষ্টিগত ভর বিশ্বের ভরের মাত্র ৫ শতাংশ। বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের প্রায় ১০ হাজার কোটি নক্ষত্রমণ্ডলী, এক একটি নক্ষত্র মণ্ডলীতে গড়ে ৩০ হাজার কোটি নক্ষত্র। এই সবের সমষ্টিগত ভর ব্রহ্মাণ্ডের ভরের মাত্র ৫ শতাংশ। আপনাদের হয়ত বিশ্বাস হচ্ছে না। ভাবছেন আমি কাকতালীয় গল্প করছি।

ঠিক আছে আপনাদের বিশ্বাসের জন্যে একটা ছবি দেখাই আপনাদের। পকেট থেকে একটি ছবি বার করে টেবিলে রাখলেন নারলেকার সাহেব। বললেন ছবিটি NASA-র ওয়েকসাইট থেকে ডাউনলোড করা। নাসা তো আর মিথ্যে তথ্য প্রকাশ করবে না।

আপনি ছবিটা হাতে নিয়ে বললেন, "স্যার এ সব কথা বলে আর লজ্জায় ফেলবেন না। আপনার কথা অবিশ্বাস করব চিন্তা পর্যন্ত করতে পারি না।"

ছবিটা আপনার বন্ধুর হাতে দিতে দিতে আপনি বললেন স্যার একটা প্রশ্ন ছিল।

হাত তুলে আপনাকে থামিয়ে মিঃ নারলিকার মুচকি হেসে বললেন, "আপনার প্রশ্নের উত্তরের জন্যেই এই আলোচনার অবতারনা।"

দৃশ্যমান পদার্থগুলির সম্বন্ধে হয়ত সব জানেন। গুরুভর পদার্থ (০.০৩ শতাংশ) বলতে বোঝাই, নিকেল, লোহা, সোনা, রূপ, ক্যালসিয়াম ইত্যাদি। এইগুলি সব সুপারনোভা বিস্ফোরণের অবশিষ্টাংশ। (৮১ পৃষ্ঠায় সুপার নোভা আলোচিত)।

ছবিতে দেখুন দেখা যাচ্ছে নিউট্রিনো ০.৩ দশমাংশ।

পদার্থ বিজ্ঞানে পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশকে বলা হয় এলিমেণ্ট্রি পারটিক্যাল (elementary particle) ক্ষুদ্রতম মৌলিক পদার্থ। অদ্যপি ৩০টি মূল ক্ষুদ্রতম অতি ক্ষুদ্র মৌলিক কণা আবিষ্কৃত হয়েছে। নিউট্রিনো এদেরেই একটি। ভরের তারতম্যের কারনে তিন প্রকার নিউট্রিনোর অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে। আণবিক প্রক্রিয়ায় নিউট্রিনো উৎপাদিত হয়। আণবিক বিস্ফোরণে, সুপারনোভা বিস্ফোরণে, গামা

রে বিস্ফোরণে নিউট্রিনো উৎপাদিত হয়। অন্যান্য এলিমেন্ট্রি প্র্যাকটিক্যালের তুলনায় নিউট্রিনো সংখ্যায় অত্যন্ত অধিক। সংখ্যায় বলা যায় ৫ কোটি ৫০ লক্ষ নিউট্রিনো প্রতি কিউবিক মিটার আকাশে। এবং এই নিউট্রিনোর কোন প্রকার ইলেকট্রিক্যাল চার্জ অবর্তমান। এবং কোন কিছুই এদের গতি প্রতিরোধ করে না। বললেন এই যে আপনারা বসে আছেন। আপনাদের, আমার আর সবাই কার মধ্যে দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে কয়েক লক্ষ নিউট্রিনো ভেদ করে চলে যাচ্ছে। পৃথিবীর একদিক দিয়ে প্রবেশ করে অপরদিক দিয়ে ভেদ করে চলে যাচ্ছে। যদিও সংখ্যায় এরা অধিক কিন্তু যেহেতু এদের ভর ও অত্যন্ত নগণ্য। এই কারণেই এদের ভর সমষ্টিগত ভাবেই মাত্র ০.৩ শতাংশ বিশ্বের ভরের তুলনায়। এ ছাড়া নক্ষত্র ইত্যাদির সমষ্টিগত ভর ০.৫ শতাংশ এবং হাইড্রোজেন এবং হিলিয়াম গ্যাস (মূলত হাইড্রোজেন) ৪%। এই সমস্ত মিলিয়ে ৫ শতাংশ (রঙিন ছবি নং ১১ দেখুন)।

এরপর চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে প্রফেসার নারলিকার বললেন, ছবিতে দেখুন ২৫ শতাংশ অন্ধকার বস্তু (Dark Matters) এবং ৭০ শতাংশ অন্ধকার শক্তি (Dark energy)। আপনার দিকে তাকিয়ে বললেন আপনার প্রশ্ন ছিল এই দুটি ব্যাপারে তাই না বাঙ্গালীবাবু?

আপনি ঘাড় নাড়িয়ে বললেন ঠিক তাই স্যার।

কি কাঁচামাল দিয়ে বিশ্ব গঠিত এই সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত মানুষ প্রায় অজ্ঞ। মাত্র ৫ শতাংশ কাঁচামালের ব্যাপারে আমরা অবহিত। বাকি ৯৫ শতাংশের ব্যাপারে অন্ধকার পদার্থ এবং অন্ধকার শক্তির মতই আমাদের জ্ঞান সম্পূর্ণভাবে অন্ধকারাচ্ছন্ন। যদিও এদের অস্তিত্বের সম্বন্ধে আমাদের কোন সন্দেহ নেই। এদের অস্তিত্ব পরীক্ষামূলক ভাবে প্রমাণিত। যদিও বা পরোক্ষভাবে প্রমাণিত। আমাদের দৃশ্যমান নক্ষত্র, নক্ষত্রমণ্ডলীর ওপর ৫ গুন অধিক ভর বিশিষ্ট অন্ধকার পদার্থের প্রভাব সহজেই পরিলক্ষিত।

স্যার বললেন ঠাণ্ডার মধ্যে চা-টা খেতে খুব ভাল লাগছে। আরো এক প্রস্থ চায়ের অর্ডার দেওয়ার পর স্যার আবার বলতে আরম্ভ করলেন। বললেন ১৯৩০ সালে ক্যালিফোরনিয়া ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজির প্রফেসার ফ্রিড্স জ্যুইকি (FRITZ ZWICKY) এবং ১৯৩৫ সালে আমেরিকার মাউন্ট উইলিয়াম অবজারভেটরির সিনক্লেয়ার স্মিথ (SINCLAIR SMITH) লক্ষ্য করেন ৩৭০ কোটি আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত "কোমা" নক্ষত্রমণ্ডলী গুচ্ছের নক্ষত্রমণ্ডলীগুলিও ঘূর্ণীয়মান গতি গনিতিক ভাবে নির্ণীত গতির অনেক গুন অধিক। ৭ কোটি আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত ভারগো নক্ষত্রমণ্ডলীগুচ্ছের নক্ষত্রমণ্ডলগুলিরও অত্যন্ত অধিক ঘূর্ণীয়মান গতি লক্ষ্য করেন এই দুই মহাকাশ বিজ্ঞানী।*

(* কোমা নক্ষত্রমণ্ডলীগুচ্ছ ১০০০ বৃহৎ নক্ষত্রমণ্ডলী এবং কয়েক হাজার ছোট নক্ষত্রমণ্ডলীর অবস্থান। ভারগো নক্ষত্রমণ্ডলীগুচ্ছে ২০০০ বৃহৎ এবং কয়েক হাজার নক্ষত্রমণ্ডলীর অবস্থান)

এই দুই বৈজ্ঞানীক গণিতের সাহায্যে প্রমান করেন নক্ষত্রমণ্ডলীগুলির এই অত্যন্ত অধিক আবর্ত্তিত গতির কারনে নক্ষত্রমণ্ডলীগুলির কক্ষ্যচ্যুত হওয়া উচিৎ। নক্ষত্রমণ্ডলীগুলির ভরের কারণে যে মধ্যাকর্ষণের আকর্ষিত বল তা নক্ষত্রমণ্ডলীকে তাদের নিজ নিজ কক্ষে বেঁধে রাখার পক্ষে যথেষ্ট নয়।

এই দুই বৈজ্ঞানিক অনুমান করেন নক্ষত্রমণ্ডলীগুচ্ছে এমন কিছু পদার্থের অবস্থান যা দৃশ্যমান নয় এবং যার ভর নক্ষত্রমণ্ডলীগুচ্ছের ভরের কয়েক গুণ অধিক।

কাপের চা শেষ করে নারলিকার সাহেব বলেন ব্যাপারটি বোঝার জন্যে চিন্তা করুন দুটি ছোট মেয়ে খেলারচ্ছলে পরস্পরের হাত ধরাধরি করে বৃত্তাকারে ঘোরার ব্যাপারটি। খেয়াল করবেন ওদের ঘোরার গতি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে দুটি পরস্পরের হাতগুলি আরো শক্ত করে জড়িয়ে ধরে। তাঁরা বুঝতে পারে। হাত ছেড়ে গেলে তাঁদের পরস্পরের বিপরীত দিকে জোরে ছিটকে পড়ার সম্ভাবনা।

একই ভাবে নক্ষত্রমণ্ডলীর অধিক আবর্ত্তিত গতির কারণে তাদের কক্ষপথে বেঁধে রাখার জন্য অধিক আকর্ষিত মাধ্যাকর্ষণ বলের প্রয়োজন। নক্ষত্রমণ্ডলীগুলির সমষ্টিগত ভরের জন্য উদ্ভুত মাধ্যাকর্ষণ বল যথেষ্ট নয়। এই কারনেই অদৃশ্য পদার্থের উপস্থিতির অনুমান। অদৃশ্য পদার্থের মাধ্যাকর্ষণশক্তি এবং নক্ষত্রমণ্ডলীগুলির মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সম্মিলিত ভাবে নক্ষত্রমণ্ডলীগুলির তাঁদের কক্ষপথে আবর্ত্তিত গতি বজায় রাখে।

জ্যুইকি এবং স্মিথের পর্যবেক্ষণের মধ্যে বেশ কিছু প্রশ্ন দেখা যায়। এই প্রশ্নগুলির সফল পর্যালোচনা সম্ভব না হওয়ায় এই দুই বিজ্ঞানীর অন্ধকার বস্তুর ধারণার স্বীকৃতি পাওয়া যায়নি। অবশেষে ১৯৬৩ সালে ওয়াসিংটনের কার্নিজ ইনস্টিটিউটের মহাকাশ বিজ্ঞানী ভেরা রুবিন (VERA RUBIN) ও তাঁর সহকারীবৃন্দ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেন মহাকাশে অন্ধকার বস্তুর অবস্থিতি। এনারা বহু দূরবর্তী নক্ষত্রমণ্ডলীগুচ্ছ নয়, পার্শ্ববর্তী নক্ষত্রমণ্ডলীর দ্রুত আবর্ত্তিত নক্ষত্রের ঘুর্ণীয়মান গতির দ্বারা প্রমাণ করেন নক্ষত্রগুলি তাদের নিজ নিজ কক্ষ পথে আবর্তমান কেবল অন্ধকার পদার্থের মাধাকর্ষণ শক্তির আকর্ষিত বলের কারণে।

ভেরা রুবিনের দল প্রমান করেন সমস্ত নক্ষত্রমণ্ডলী অন্ধকার বস্তুর সাগরে নিমজ্জিত।

অন্ধকার বস্তুর অস্তিত্ব প্রমাণিত। দৃশ্যমান নক্ষত্র, নক্ষত্রমণ্ডলী, নক্ষত্রমণ্ডলীগুচ্ছ ইত্যাদির ঘূর্ণীয়মান গতি বজায় রাখার জন্য অন্ধকার পদার্থের উপস্থিতির প্রয়োজন অনস্বীকার্য। কিন্তু কি এই অন্ধকার পদার্থ? কিসের দ্বারা গঠিত এই অন্ধকার পদার্থ? এদের মধ্যে ভরের উপস্থিতি কারন? আর কি বৈশিষ্ট্য এই অন্ধকার বস্তুদের?

আজ অবধি এই সব প্রশ্নের উত্তর বৈজ্ঞানীদের অজানা। বৈজ্ঞানীকেরা বিভিন্ন ভাবে গণনার মাধ্যমে (মূলত অন্ধকার পদার্থের মাধ্যাকর্ষণ প্রভাব) এই সিদ্ধান্তে

উপনিত হয়েছেন যে অন্ধকার পদার্থ বিশ্বের ভরের ২৫ শতাংশ অংশ বহন করে। অতএব দৃশ্যমান ৫ শতাংশ পদার্থের সমন্বয়ে ৩০ শতাংশের পরিচয় পাওয়া সম্ভব।

বিগত এক দশকে মহাকাশ বৈজ্ঞানিকরা তাঁদের মাথা চুলকেছেন অবশিষ্ট এই ৭০ শতাংশের ব্যাপারে কোন রকম আলোকপাত করার চেষ্টায়। পরীক্ষিত ভাবে
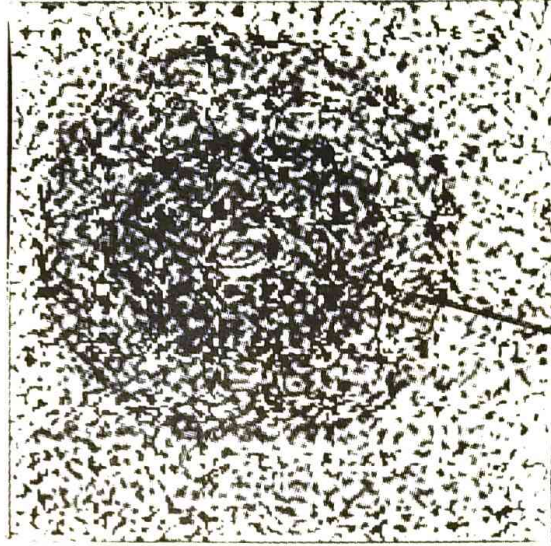
নক্ষত্রমণ্ডলী ও অন্ধকার পদার্থ

প্রমাণিত না হলেও যুক্তিযুক্ত এবং তত্ত্বীয়ভাবে প্রমাণিত এমন একটি গ্রহনযোগ্য বিশ্লেষণ। এমন একটি গ্রহনযোগ্য মতবাদ একটি গ্রহনযোগ্য তথ্য।

এরপর প্রফেসার নারলিকার আপনাদের দিকে তাকিয়ে বললেন বিশ্বাস করুন এখন সর্বাধিক গ্রহনযোগ্য মতবাদ ঘুরে ফিরে সেই আইনস্টাইনের কসমোলজিক্যাল কসট্যান্ট। বিকর্ষিত মাধ্যাকর্ষণ বল। হযত বা আজকের শক্তির রহস্য লুকিয়ে আছে এরই মধ্যে তবে অন্ধকার শক্তির ব্যাপারে আমার বক্তব্য রাখার আগে আসুন আপনাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই Dark Matter বা অন্ধকার পদার্থের সম্ভাব্য ক্যানডিডেটদের সঙ্গে।

১ নং ক্যানডিডেট : ম্যাকো MACHO (MAssive Astrophysical compact Holo object)। গুরুতর অন্ধকার পদার্থ। মহাকাশীয় বিশাল পদার্থ। মহাকাশীয় সেই সব পদার্থ যা আলো বিচ্ছুরণ করে না। যেমন ব্ল্যাক হোল, খয়রী বামন, তারা, Black Hole (ব্ল্যাক হোলের বিবরণ ৮২ পৃষ্ঠায়)

খয়রী বামন (BROWN DWARF) তারা এক মহাকাশীয় বস্তু সূর্যেরই সমগোত্রীয় কেবল আয়তনে ছোট। সূর্যের এবং অপর নক্ষত্রদের ক্ষেত্রে মাধ্যাকর্ষণের প্রবল চাপে হাইড্রোজেন গ্যাসের সংকোচনের ফলে প্রচণ্ড উত্তাপের সৃষ্টি হয়। আরম্ভ হয় হাইড্রোজেন গ্যাসের আনবিক প্রক্রিয়া। দহিত হতে থাকে হাইড্রোজেন। খয়রী বামনের ক্ষেত্রে হাইড্রোজেন গ্যাসের আণবিক প্রক্রিয়া আরম্ভ হতে পারে না। নক্ষত্রের তুলনায় হাইড্রোজেনের পরিমান কম থাকায় সেই উচ্চ তাপমাত্রা সঞ্চারিত

হয় না যা আনবিক প্রক্রিয়া শুরু করে। বৃহস্পতির থেকে বড় একটি অতি বৃহৎ গ্রহের মত মহাকাশে অবস্থান করে খয়রী বামন মহাকাশীয় বস্তু। এরা অত্যন্ত মৃদু আলো এবং সামান্য তাপ বিচ্ছুরণ করে। খয়রী বামন হতে প্রায় কোন আলো নির্গত না হওয়ায় এরা সহজে দৃষ্টিগোচর হয় না। সাধারণ টেলিস্কোপে এদের দেখা যায় না। দেখা যায় ইনফ্রারেড টেলিস্কোপের সাহায্যে।

এখনও পর্যন্ত আবিষ্কৃত সমস্ত ব্ল্যাক হোল, সাদা বামন তারা, খয়রী বামন তারা ইত্যাদির জ্ঞাত অন্ধকার বস্তুর সমষ্টিগত ভর বিশ্বের ২৫ শতাংশ অন্ধকার বস্তুর ভর পূরণ করে না।

অনুমান করা হয় বাকী অংশ অধিকার করে এমন কোন নতুন পদার্থ যার পরিচয় আজ পর্যন্ত মানুষের কাছে অজ্ঞাত। এদের পরিচয় উনমোচনে বহু মহাকাশ বিজ্ঞানী গবেষণায় মত্ত।

এই বলে স্যার হয়ত সামান্য দম নেওয়ার জন্যে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর আপনাদের জিজ্ঞেস করলেন অন্ধকার পদার্থের ব্যাপারে আমাদের কোন প্রশ্ন আছে কিনা। বললেন দেখুন অন্ধকার পদার্থের পরিচয় আমরা এখনও পায়নি। বলা উচিত সম্পূর্ণ পরিচয় পায়নি। যদিও এদের উপস্থিতির ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই। আপনার দিকে তাকিয়ে আপনার স্যার জিজ্ঞেস করলেন বাঙ্গালীবাবু মনে হচ্ছে আপনার কিছু প্রশ্ন আছে? কুণ্ঠা করবেন না। আমি আমার সাধ্যমত উত্তর দেবার চেষ্টা করব।

"স্যার সাদা বামন তারা, খয়রী বামন তারা, ব্ল্যাক হোল ছাড়া অবশিষ্ট অন্ধকার বস্তুর সম্বন্ধে কিছু অনুমান করা হয়েছে কি? নতুন পদার্থ কি প্রকারের হওয়া সম্ভব এই ব্যাপারে বিজ্ঞানীরা কি অনুমান করছেন যদি একটু বলেন।

নারলিকার সাহেব তাঁর হাত দুটি নমস্কারের গঙ্গীতে জোড়া করে বললেন, "চলুন চেষ্টা করা যাক আপনার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার।"

ডার্ক ম্যাটার বা অন্ধকার বস্তু প্রকল্পিত ক্ষুদ্রতম কণিকা পদার্থ (hypothetical matter particle)। অন্ধকার পদার্থের বাকি অংশ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদের অনুমানের কথা বলতে হলে আপনাদের কাছে খুব সংক্ষেপে পারটিক্যাল ফিজিক্স আলোচনা করতে হবে।

পারটিক্যাল ফিজিক্সের মতে সমস্ত পদার্থকে দু ভাগে ভাগ করা যায়। এক ফারমিয়নস (Fermions)। সমস্ত সাধারণ পদার্থ যা ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন কণা দ্বারা গঠিত। দুই বোসন (Bosons) যা বলের বাহন কণা দ্বারা গঠিত। (force carrying particles যেমন, photon, gluon, graviton ইত্যাদি)। বোসন পারটিক্যাল গ্রুপের মধ্যে প্রকল্পিত হিগস পারটিক্যাল ও অন্তর্ভূক্ত। হিগস্ পারটিক্যাল পদার্থে ভরের সঞ্চার করে। (হিগস, বোসন কণার আলোচনা ১০৮ পৃষ্ঠায়)।

ফারমিয়নসের দুটি রকম ফের বর্তমান

১) কেয়ার্কস। ২) ল্যাপটন

কেয়ার্কস—১২ প্রকারের। ৬টি কেয়ার্কস। ৬টি এ্যান্টি কেয়ার্কস। (কেয়ার্কসের আয়নার প্রতিবিম্ব mirror image। বিপরীত ইলেকট্রিক চার্জ। সমান ভর।) একাধিক কেয়ার্কস মিলিত ভাবে প্রোটন, নিউট্রন গঠন করে।

অনুরূপভাবে ল্যাপটন :— ১২ প্রকারের। ৬টি লাপটন। ৬টি এ্যান্টি ল্যাপটন (লাপটনের আয়নার প্রতিবিম্ব। বিপরীত ইলেকট্রিক চার্জ। সমান ভর) চেনা জানা ইলেকট্রন একটি ল্যাপটন।

অনুমান করা হয় ফারমিয়ন ও বোসন দুই প্রকারের কণাদের মধে প্রতিসমতা বর্তমান। বিশ্বের সৃষ্টির সময় প্রতিসমতা ছিল। প্রতিসমতা বা Super symmetry-র জন্যে অনুমান করা হয় প্রতিটি ফারমিয়ন কণার একটি করে বোসন সুপার পার্টনার বর্তমান। অনুরূপভাবে একই কারণে প্রতিটি (Boson) বোসন কণার একটি করে ফারমিয়নস সুপার পার্টনার বর্তমান।

সুপার পার্টনারদের তুলনামূলক ভাবে গুরুভরের কারণে বর্তমান পারটিক্যাল একেসেনেরেটরে পরিলক্ষিত করা সম্ভব হয়নি। আশা করা ভবিষ্যতের একসেলেটরে সুপার পার্টনার কণাদের অস্তিত্ব প্রমাণিত করা সম্ভব হবে।

এই সুপার পার্টনার কণাগুলিকেই অবশিষ্ট অন্ধকার পদার্থ হিসাবে অনুমান করা হয়। এই কণাগুলি WIMPS (weakly interacting massive parlicles), Synuetrino, photino উইম্‌স, এসনিউট্রিনো, ফোটিনো, নিউট্রালিনো (Neutralino) ইত্যাদি নামে পরিচিত।

এই বলে নারলিকার সাহেব চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "আশাকরি আপনারা অন্ধকার বস্তুর ব্যাপারে এটা ধারণা করতে পেরেছেন। চা খেতে খেতে আপনাদের মত মনযোগী শ্রোতার কাছে বক্তব্য রাখতে খুবই ভাল লাগলো। চলুন এগোনো যাক এবার।"

চায়ের দাম মিটিয়ে আপনারা আবার পথে নামলেন।

রাস্তা প্রায় নির্জন। কেবল আপনাদের পায়ের শব্দ, অনেক দূরের ঘোড়ার গলায় বাঁধা ঘণ্টার তালে তালে টুং টাং শব্দ। আর মাঝে মাঝে ডানদিনের পাহাড় হতে চুইয়ে পড়া রাস্তা ভেজান শীর্ণ জলের ধারার টুপ, টাপ শব্দ।

আপনার বন্ধুর কাছে নারলিকার স্যারের বিনীত আবেদন "বন্ধুবর" মাঝে মাঝে আপনার গুনগুন করা আমি শুনতে পেয়েছি। এই সুন্দর মিষ্টি সকালে শোনান না একটা গুরুদেবের গান। আমি নিশ্চত যে প্রাকৃতিক উপভোগের মাত্রা হাজার গুণ বাড়িয়ে দেবে গুরুদেবের গান। প্লিজ গান না এটা গুরুদেবের গান।

বন্ধু মাথা নেড়ে গান ধরল। বেহাগ ক্যাউড়া সুরে রবিঠাকুরেরই সুর দেওয়া গান—

'ভুবন জোড়া আসন খানি
আমার হৃদয়-মাঝে বিছাও আনি"

গানের শেষে স্যার বললেন গুরুদেবের গান আমায় mesmerize করে। বিমোহিত করে। ভাবি যদি এই ভাবে প্রণাম করতে পারতাম। যদি আমার ঐ রকম অর্ন্তদৃষ্টি থাকত। আকাশের দিকে চেয়ে হাত দুটি করজোড়ে কপালে ঠেকিয়ে বললেন, "তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ।"

প্রায় এক ঘণ্টা পথ চলার পর সামান্য বিশ্রাম নেওয়ার জন্যে পথের ধারে একটা বাঁধান বেদিতে বসলেন আপনারা। যাত্রীদের বিশ্রামের জন্যে তৈরী বাঁধান বেদি। রাস্তার ঠিক বাঁকেই অতীব মনোরম জায়গাটা। দুটি সুউচ্চ লম্বা পাহাড়ের মাঝে অনেক দূর পর্যন্ত জঙ্গলে উপত্যকাটি দেখা যায়। ঐ নিচু দিয়ে বয়ে চলেছে সরু কালি গঙ্গা। দেখা যায় পাহাড়ের বুকে আঁকা বাঁকা রাস্তাটিকে বহুদূর পর্যন্ত। পাহাড়ে পাহাড়ে রবির কিরণের লুকোচুরি খেলা। বিশ্রামের জায়গাটির পাশেই একটি শীর্ণ পাহাড়ী ঝর্ণা। ঝর্ণার জলে চেরা বাঁশের তৈরী কল। স্ফুটিক স্বচ্ছ জল। জল খেয়ে, ঘাড়ে মুখে জল দিয়ে আপনারা বেদিতে বসলেন সামান্য বিশ্রাম নেওয়ার জন্যে।

নারলিকার সাহেব বললেন এই মনোরম পরিবেশে নির্ম্মল আকাশের তলায় বসে আসুন আপনাদের বিশ্বের সম্প্রসারণের ব্যাপারটি উল্লেখ করা যাক।

আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন by the way জানেন তো আকাশ কেন নীল?

আপনি ঘাড় নাড়িয়ে বললেন স্যার আমি যতদূর জানি সূর্যের আলোর নীল রশ্মি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের উচ্চস্তরে ধুলিকণায় বিচ্ছুরিত হয়ে সারা আকাশময় ছড়িয়ে যায়। আমরা তাই দেখি আকাশ নীল। সূর্যের লাল এবং হলদে রশ্মি বায়ুকণার দ্বারা বিঘ্নিত হয় না। ফলে মধ্য গগনে সূর্যের রং আগুনের হলদে। সূর্যোদয়ের এবং সূর্যাস্তের সময় সূর্যের আলোকে বায়ুমণ্ডলের অনেকটা বেশি পথ অতিক্রম করতে হয়। ফলে সূর্যের আলোর হলদে অংশটিও বায়ুকণার দ্বারা বিঘ্নিত হয়। রশ্মির লাল অংশ কেবল আমাদের চোখে পৌছয়। তাই সূর্যোদেয়ে এবং সূর্যাস্তের সূর্য লাল।

স্যার বললেন একেবারে ঠিক বলেছেন। তাই বায়ুমণ্ডলের উপরেই আকাশ কালো। চাঁদের আকাশ কালো কত ভাগ্যবান আমরা? আমাদের আকাশ নীল।

নারলিকার স্যাব বললেন দেখুন বিগ ব্যাঙের এবং তারপর ইনফ্লেসনের তীব্রতায় বিশ্বের সম্প্রসারণ অব্যহত এই তথ্য সঠিক। আবার এই মতবাদ অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত যে বিশ্বের সমস্ত পদার্থের সমষ্টিগত মাধ্যাকর্ষণ আকর্ষণের ফলে বিশ্বের সম্প্রসারণের গতি ক্রমাগত হ্রাস পাওয়া।

বিশ্বের জীবন দশায় বিভিন্ন সময়ে বিশ্বের সম্প্রসারণের গতি নির্ণয় করা সম্ভব। কোন মহাকাশীয় পদার্থ থেকে আলো পৃথিবীতে পৌঁছতে যে সময় লাগে সেই সময়টিই পদার্থটির বয়স। অর্থাৎ কোন ছায়ামণ্ডলী যা পৃথিবীর থেকে ১ কোটি আলোকবর্ষ দুরে, সেই ছায়ামণ্ডলীকে আমরা যখন পৃথিবীর থেকে নিরীক্ষণ করি, ভেবে দেখুন আমরা কিন্তু ১ কোটি বছর আগের অবস্থায় ছায়ামণ্ডলীটিকে দেখছি। কারণ ঐ ছায়ামণ্ডলী থেকে আলো পৃথিবীতে আসতে সময় নেয় এক কোটি বছর। ছায়ামণ্ডলীটির সম্প্রসারনের হার নির্ণয় করা সম্ভব হলে আমাদের কাছে ১ কোটি বছর আগে বিশ্বের (হয়ত বা স্থানিয়ভাবে) পরিচয় উন্মোচিত হয়।

অনুরূপ ভাবে বিভিন্ন দূরত্বে ১ কোটি, ২ কোটি, ৩ কোটি, ৫ কোটি আলোকবর্ষ দূরে ছায়ামণ্ডলীদের সম্প্রসারনের বেগ দ্বারা আমরা নির্ণয় করতে সক্ষম হব বিভিন্ন সময়ের পরিপ্রক্ষিতে বিশ্বের সম্প্রসারণের বেগ বৃদ্ধি না হ্রাস? এই অতি মূল্যবান তথ্যটি আমরা জানতে পারব।

এই তথ জানার জন্যে নির্ণয় করা দরকার ১) ছায়ামণ্ডলীর দূরত্ব এবং ২) ছায়ামণ্ডলীর সম্প্রসারনের বেগ বা হার। ছায়ামণ্ডলীর দূরত্ব অর্থাৎ বিশ্বের তৎকালীন বয়স। কত বর্ষ পূর্বের বিশ্ব। এই দূরত্ব সঠিক ভাবে নির্ণয় করা কঠিন।

মহাকাশীয় বস্তুর দুরত্ব নির্ণয় করা মহাকাশ বিজ্ঞানীদের মাথা ধরার কারণ।

নক্ষত্রমণ্ডলীর সম্প্রসারনের গতি নির্ণয় করা তুলনামূলকভাবে সহজ।

কিছুটা দম নিয়ে স্যার বললেন, ''মানুষের দৃশ্যমান আলোর মধ্যে লাল রঙের আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সর্বাধিক।

পৃথিবী থেকে দৃশ্যমান পৃথিবীর দিকে ধারিত একটি কমেটের নির্গত আলোর তরঙগ দৈর্ঘ্যের সংকোচন হয়। এই তরঙ্গ সংকোচন কে বলা হয় ব্লু শিফ্‌ট (a blue shift)। অপরদিকে পৃথিবী থেকে দূরে সরে যওয়া একটি কমেটের আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সম্প্রসারণ হয়। এই তরঙ্গ সম্পরসদারণকে বলা হয় রেড সিফ্‌ট (a redshift)।

আলোর উৎসের অথবা আলোর প্রর্যবেক্ষকের গতির কারণে আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের পরিবর্ত্তনকে বলা হয় ডোপলার এফেক্ট (Doppler effect)। ডোপলার এফেক্ট শব্দ বা ধ্বনির তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সংকোচন এবং সম্প্রসারণের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

এই ডোপলার এফেক্টকে ববহার করে আমরা নক্ষত্রমণ্ডলীগুলির দূরে সরে যাওয়ার গতি নির্ণয় করতে পারি। এর জন্যে যে যন্ত্রটি ব্যবহার করা হয় তার নাম স্পেকট্রোস্কোপ (spectroscope)। আধুনিক কালে অবশ্য ডিজিট্যাল ভাবে সরাসরি টেলিস্কোপের দ্বারা প্রাপ্ত দূরবর্ত্তী মহাকাশীয় বস্তুর আলো বিশ্লেষণ করা হয়। একে বলা হয় স্পেকট্রোগ্রাফি। হাজার গুন নিখুঁত এবং হাজার গুন শক্তিশালী এই স্কেকট্রোগ্রাফিক্যাল বিশ্লেষণ।

এই বলে নারলিকার সাহেব তাঁর ব্যাগ থেকে একটি ছবি বের করে বললেন আপনাদের স্পেকট্রোগ্রাফির সাহায্যে কিভাবে মহাকাশীয় বস্তুর গতি নির্ণয় করা সম্ভব সংক্ষেপে বুঝিয়ে বলি।

বললেন ১ নং চিত্রটি পৃথিবীর পরিপ্রেক্ষিতে একটি স্থির তারার মৌলিক ধাতুগুলির এ্যাবজরপসন লাইন। মানুষের ফিংগার প্রিন্টের মত প্রতিটি মৌলিক ধাতুর নিজস্ব এক বা একাধিক এ্যাবজরনশন লাইন বর্তমান। অতএব স্কেকট্রোস্কোপের এ্যাবজরপসন লাইন বিশ্লেষণ করে আমরা সহজেই মহাকাশীয় বস্তুর পরিচয় জানতে পারি।

১নং চিত্রের ৩৯৩ এবং ৩৯৭ ন্যানোমিটার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের কাল দাগ দুটি (খউব কাছাকাছি থাকার জন্যে দুটি দাগকে মনে হচ্ছে একটি মোটা দাগ) অইওনাইজড ক্যালসিয়মের (Ionised calsium)। ৪১০, ৪৩৪, ৪৮৬ এবং ৬৫৬ nm-এর দাগগুলি এ্যাটোমাইজড হাইড্রোজেন (একটি হাইড্রোজেন অনু)। ৫১৮ ম্যাগনেসিয়াম এবং ৫৮৯ সোডিয়াম ধাতুর এ্যাবজরপসন লাইন।

২ নং চিত্রটি একটি নিকটবর্তী নক্ষত্রমণ্ডলীর। দেখা যাচ্ছে এ্যাবজবপসন লাইনগুলি ১ শতাংশ ডান দিকে (লালের দিকে) সরে গেছে। যার অর্থ এই নক্ষত্রমণ্ডলীটি পৃথিবী হতে আলোর গতির ১ শতাংশ গতিতে (৩০০০ কি.মি. প্রতি সেকেণ্ড) পৃথিবী হতে দূরে সরে যাচ্ছে।

অনুরূপ ভাবে ৩ নং ছবিতে দূরবর্তী তারামণ্ডলীর এ্যাবজরপসন লাইনগুলি ৫ শতাংশ ডানদিকে সরে যাওয়ার কারণে ঐ তারামণ্ডলীটি পৃথিবী হতে আলোর গতির ৫ শতাংশ গতিতে দূরে সরে যাচ্ছে।

৪ নং ছবিতে বহু দূরবর্তী নক্ষত্রমণ্ডলী অনেক দ্রুতগতিতে পৃথিবী থেকে দূরে সরে যাচ্ছে (রঙিন ছবি নং ১২ দেখুন)।

স্যার বললেন এইভাবেই স্পেকট্রাল (Spectral) লাইন-এর রেড শিফট বের করে মহাকাশীয় বস্তুদের পৃথিবী থেকে দূরে সরে যাওয়ার গতি নির্ণয় করা হয়।

চলুন এরপর সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক মহাকাশীয় বস্তুদের দূরত্ব কিভাবে নির্ণয় করা হয়।

যতদূর তত ক্ষীণ এটা ঘটনা। ক্ষীণ অর্থে ঔজ্জ্বল্যের ক্ষীণতা। দীপ্তির ক্ষীণতা।

প্রশ্ন হল কার তুলনায় ক্ষীণ? উজ্জ্বলতার মানদণ্ড কি? কি সেই মহাকাশীয় বস্তু সকল যাদের উজ্জ্বলতা একটি নির্দিষ্ট মানের উজ্জ্বলতা?

এই মানদণ্ডটি পরিবেশ করে Ia মত সুপারনোভা বিস্ফোরণ।

আপনার প্রশ্ন "স্যার সুপার নোভা ব্যাপারটা মোটামুটি জানি। একটি অতি বৃহৎ নক্ষত্রের জীবনান্তে সুপারনোভা বিস্ফোরণ হয়। জ্বালানী (হাইড্রোজেন গ্যাস) নিঃশেষিত হওয়ার ফলে আণবিক প্রক্রিয়া বন্ধ হয়। ফলে মাধ্যাকর্ষণকে প্রতিহত করার বল অপসারিত হয়। আরম্ভ হয় তারাটির মাধ্যাকর্ষণ সংকোচন। এই

সংকোচনের ফলে তাপমাত্রা এবং ঘনত্ব যখন অসীমত্ত্বে পৌঁছায় তখন Super Nova সুপারনোভা বিস্ফোরণ হয়। এতই তীব্র এই বিস্ফোরণ যার তুলনায় একটি সম্পূর্ণ নক্ষত্রমণ্ডলীর ঔজ্জ্বল্যকেও মলিন মনে হয়।

স্যার বললেন ঠিক তাই। এ ছাড়াও আরো কয়েক প্রকার সুপার নোভা পরিলক্ষিত করা হয়েছে। যেমন টাইপ Ia, Ib, Ic এবং টাইপ 11P, টাইপ 11L ইত্যাদি।

টাইপ 11 আপনি যা বললেন অনেকটা তাই। এখানে আমাদের দরকার টাইপ Ia সুভারনোভা। কারণ এই বিস্ফোরিত নক্ষত্রের ভর নির্দিষ্ট। ১.৪ গুন বড় সূর্য্যের ভরের। চন্দ্রশেখর লিমিট।

আমরা জানি কোন তারার ভর সূর্যের ভরের ১.৪ গুন কম থাকলে তারাটির জীবনান্তে পরিনতি সাদা বামন তারা। (৭৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) white dwarf star। এই সাদা বামন তারার মাধ্যাকর্ষণ অত্যন্ত প্রবল। কারণ এদের অত্যাধিক ঘনত্ব। সাদা বামন তারার যখন একটি সাথি তারা থাকে (সচরাচর লাল দৈত্য তারা) তখন সাদা বামন তারাটি তার অত্যাধিক মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কারণে ঐ লাল দৈত্য তারাটিকে ভক্ষণ করতে আরম্ভ করে। আরম্ভ হয় Mass transfer পদার্থের স্থানান্তরণ। বাড়তে থাকে সাদা বামন তারার ভর। ক্রমে ক্রমে সাদা বামন তারাটির ভর অতিক্রম করে লক্ষণ রেখা চন্দ্রশেখর লিমিট ১.৪ গুণ সূর্যের ভর। ভর প্রাপ্তির কারনে উচ্চ মাধাকর্ষণ বলের বিকাশ হয়। আরম্ভ হয় সংকোচন। বাড়ে ঘনত্ব। বাড়ে তাপমাত্রা এক সময় এই অতি উচ্চ ঘনত্বের এবং এই উচ্চ তাপমাত্রার কারণে ঘটে বিস্ফোরণ। প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। অন্যান্য সমস্ত সুপারনোভা বিস্ফোরণের কয়েক গুণ অধিক শক্তিশালী এই বিস্ফোরণ Ia সুপারনোভা। ১.৪ গুন অধিক সূর্যের ভরের সাদা বামন তারার বিস্ফোরণ। নির্দিষ্ট ভরের বিস্ফোরণ। নির্দিষ্ট ভরের বিস্ফোরণের ফলে নির্দিষ্ট ঔজ্জ্বল্য। মহাকাশে এক মহাকাশীয় বস্তুর ঔজ্জ্বল্যের মানদন্ড প্রতিষ্ঠিত। Candle light প্রতিষ্ঠিত।

মানদণ্ড নির্দিষ্ট হওয়ার উপরান্তে অন্বেষণ। অনন্ত গগনের মধ্যে Ia টাইপ সুপারনোভা খোঁজা আরম্ভ। দুর্লভদর্শন ঘটনা এটি। কারণ Ia টাইপ সুপারনোভা বিস্ফোরণ একটি নক্ষত্রমণ্ডলীতে সঙ্ঘটিত হয় কয়েক শত বছরে একবার। যদিও এই বিস্ফোরণের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট বর্তমান। তীব্র দীপ্তিতে আরম্ভ হয় এই বিস্ফোরণ। ধীরে ধীরে হ্রাস পায় বিস্ফোরণের ঔজ্জ্বল্য।

১৯৯০ সালে আমেরিকার লরেন্স বার্কলে ন্যাশানাল ল্যাবরেটরির এবং অসট্রেলিয়ার ন্যাশনাল ইউনিভারসিটির এক দল বৈজ্ঞানিক নেমে পড়েন Ia টাইপ সুপার নোভা বিস্ফোরণের অনুসন্ধানের নতুন পদ্ধতি। সম্মিলিত প্রচেষ্টা, অনন্য একাগ্রতা, অসামান্য অধ্যাবসায় আর নিপুণ কর্মকুশলতায় সাফল্য আসে কয়েক বছরেই। একটি নয়, দুটি নয়, এমন কি দশটি নয়, বিশ্ব মহাকাশে এঁনারা চিহ্নিত

করেন চার চার ডজন Ia টাইপ সুপারনোভা বিস্ফোরন। বিভিন্ন নক্ষত্রমণ্ডলীতে বিশ্ব জীবনের বিভিন্ন কালে যাদের অবস্থান।

স্যারের কথা বলার ধরনে বুঝতে পারলাম স্যার বিশ্ব পরিচয়ের কথা বলতে বলতে প্রচণ্ড মেজাজী হয়ে পড়েছেন। ভাবলাম এইটাই স্যারের কাছ থেকে শ্রেষ্ঠ পাওয়ার সময়।

বলে চললেন স্যার Ia টাইপ সুপারনোভা চিহ্নিত হওয়ার পর তাদের প্রতিটির উজ্জ্বলতার প্রখরতা বিচার করে বিজ্ঞানীর দল বের করলেন পৃথিবী হতে তাদের দূরত্ব। স্পেকট্রোগ্রাফির সাহায্যে নির্দ্ধারণ করলেন প্রতিটি সুপারনোভার পৃথিবী হতে দূরে চলে যাওয়ার গতি। পুনঃ উচ্চারিত হল ৭ দশক পূর্বে হবল সাহেবের বিখ্যাত উক্তি ‘‘আমাদের বিশ্বটি সম্প্রসারিত বিশ্ব।’’ বিজ্ঞানীর দল এই উক্তিতে সংযোজন করলেন বললেন বিশ্বের এই সম্প্রসারণের হার ক্রম বর্ধমান। পরীক্ষিত ভাবে প্রমাণিত তাঁদের এই সংযোজন। আকাট্য মতবাদ। ঐ দুই বৈজ্ঞানীদের দল আরো বক্তব্য রাখলেন ইনফ্লেসনের উপরান্তে বিশ্ব জীবনের প্রথম ৭ শত কোটি বছর যদিও বিশ্বটি ছিল সম্প্রসারিত বিশ্ব কিন্তু এই সম্প্রসারণের হারের গতিতে হ্রাসপ্রাপ্তি ঘটেছিল। ৭ শত কোটি এই সম্প্রসারনের হারের বৃদ্ধি হতে আরম্ভ হয়। এই বৃদ্ধি অদ্যপি অব্যাহত। বিজ্ঞানীদের দলেদের এই শেষ মতবাদটিও পরীক্ষিত ভাবে প্রমাণিত।

আধুনিক মতবাদে বিশ্ব জীবনের চিত্র

স্যার বললেন দেখুন ৭ শত বছর পূর্বে বিশ্বের সম্প্রসারণের হারের পরিবর্তন হয়েছিল। এই তথ্য আবিকোরের পূর্বে অধিকাংশ বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিও সম্পূর্ণ বিপরীত। ধারণা ছিল বিশ্বের সম্প্রসারণের হারের হ্রাসপ্রাপ্তি আজ অবধি অব্যাহত।

স্যার বললেন তাঁদের এই ধারণার সমর্থনে যুক্তিটি এইরকম। বিগ ব্যান্ড অতঃপর ইনফ্লেসনের ভরবেগে (momentum) বিশ্বের সম্প্রসারণ এই ব্যাপারে কোন দ্বিমত ছিল না। এখনও নেই। সাধারণ বুদ্ধিতে বলা যায় বিশ্বের সমস্ত পদার্থের সমষ্টিগত মাধ্যাকর্ষণ বল এই সম্প্রসারনের হারকে প্রতিহত করে। এই আকর্ষিত মাধ্যাকর্ষণ বলের বিশ্বের সম্প্রসারণের হারে ঘটছে ক্রমাগত হ্রাসপ্রাপ্তি এই ধারণাই ছিল তৎকালীন অধিকাংশ বিজ্ঞানীদের।

বার্কলের ন্যাশানাল ল্যাবরেটরির এবং অস্ট্রেলিয়ার ন্যাশানাল ইউনিভারসিটির বিজ্ঞানীদের দল প্রমাণ করেন তাঁদের পূর্ববর্তী বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল ভ্রান্ত। সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। এঁনারা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করলেন আমাদের সম্প্রসারিত ব্রহ্মান্তের সম্প্রসারণের হার ক্রম বর্ধমান। বিশ্ব পরিচয়ের আরেকটি পাতা উল্টালেন এই তপস্বী বিজ্ঞানীদের দল।

সামান্য থেমে স্যার যেন কি একটা ভাবলেন। তাঁর বলা জারী রাখলেন এই বলে 'এরপর কয়েকটি প্রশ্ন খুব বড়ভাবে দেখা দেয়'।

কি কারণে এই সম্প্রসারণের হারের বৃদ্ধি?

কি সেই বিশ্বের সর্বাধিক শক্তিশালী শক্তি যা বিশ্বের সমস্ত পদার্থের সমষ্টিগত আকর্ষিত মাধ্যাকর্ষণ বলকে প্রতিহত করার উপরান্তে বিশ্ব সম্প্রসারণের গতিকে ত্বরান্বিত করতে সক্ষম?

শ্রদ্ধেয় নারলিকার স্যার এবার উঠে গিয়ে পাশের ঝর্ণার জলে হাতমুখ ধুয়ে কয়েকবার উঠবোস করলেন। নিজের জায়গায় বসতে বসতে বললেন, "জায়গাটা এত মনোরম আর এত সতেজ প্রকৃতি! ইচ্ছে করছে আর একটু বসে থাকতে"।

আপনাদের দিকে চেয়ে বললেন কি বাঙালীবাবুরা আমাদের কসমসের জীবন বৃত্তান্ত শুনতে ইনটারেসটিং লাগছে? কৌতূহল হচ্ছে আরো ভালোভাবে জানার?

আপনার উত্তর "স্যার খালি ইনটাররেসটিং? আপনার কথা—যাকে বলে অমৃত সমান। আর কৌতূহল? এখন আমরা আমাদের কৌতূহলের শেষ সীমায়।

আপনার বিনম্র উত্তরে খুশি হয়ে স্যার বললেন, "খুব ভাল। অসালে মায়ের গল্প শুনতে কার না ভাল লাগে? চলুন আমরা এখন ফিরে যাব ১৯১৭ সালে। যখন মহামান্য আইনস্টাইনের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল দৈব বাণী "কসমোলজিক্যাল কন্সট্যান্ট।"

স্যার বললেন "আসলে তিনি এই শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন এক বিশেষ কারণে। দেখুন তৎকালীন বুদ্ধিজীবিদের "স্থির বিশ্বের" ধারণা মহামান্য আইনস্টাইনও বিশ্বাস করতেন। তাঁর জেনারেল থিয়োরী অফ রিলেটিভিটি (যা বিশ্বাস অথবা ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, এটি তত্ত্বীয়ভাবে আবিষ্কৃত এবং পরীক্ষিতভাবে প্রমাণিত) স্থির বিশ্বের বিপরীত মত পোষণ করে। এই থিয়োরী সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে "স্থির বিশ্বের" ধারণাটি ভুল। প্রমাণ করে বিশ্ব অস্থির। সদা সর্বদা অস্থির।

হয় এটি একটি সংকুচিত বিশ্ব অথবা সম্প্রসারিত বিশ্ব। কিন্তু স্থির বিশ্ব কখনই নয়।

আইনস্টাইন তাঁর স্থির বিশ্বের ধারণাটিতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে প্রণয়ন করেন কসমোলজিক্যাল কন্সট্যান্ট শব্দটি।

ব্যাখ্যা করে বলেন কসমোলজিক্যাল কন্সট্যান্ট একটি বিকর্ষিত মাধ্যাকর্ষণ বল। যে বল বিশ্বকে সঙ্কুচিত করার চেষ্টা করে।

কসমোলজিক্যাল কন্সট্যান্ট সংখ্যাটি সংযুক্ত করেন—তাঁর জেনারেল-থিয়োরী অফ রিলেটিভিটির সমীকরণের সঙ্গে।

অসামান্য তৎপরতায় বিজ্ঞানের মহানায়ক এই কসমোলজিক্যাল কন্সট্যান্টের একটি মানও নির্ণয় করেন গণণার সাহায্যে। এমন একটি মান যা কাঁটায় কাঁটায় প্রতিহত করে বিশ্বের তাবৎ মাধ্যাকর্ষণ আকর্ষণ। অপূর্ব দক্ষতায় প্রতিষ্ঠিত করেন তৎকালীন বিশ্ববাসীর বিশ্বাস এবং আপন বিশ্বাস "স্থির বিশ্বের মতবাদ।"

মাত্র কয়েক বছর পরই এডোমার্ড হবলের মহাকাশ বিজ্ঞানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার "আমাদের বিশ্বটি সম্প্রসারিত বিশ্ব"।

বিনম্র আইনস্টাইনের তাৎক্ষণিক স্বীকারোক্তি "কসমোলজিক্যাল কন্সট্যান্ট আমার জীবনের বৃহত্তম ত্রুটি।" তাঁর থিয়োরী অফ রিলেটিভিটির সমীকরণ থেকে অপসারিত করেন কসমোলজিক্যাল কন্সট্যান্ট সংখ্যাটি। বিশ্ববাসীর কাছে আবেদন রাখেন "এই ত্রুটিপূর্ণ অধ্যায়টি ভুলে যাওয়ার জন্যে"।

এরপর নারলিকার স্যার উঠে দাঁড়িয়ে বললেন "চলুন এগোনো যাক এবার।" অনেকক্ষণ বসলাম। চিরদিন মনে থাকবে এই জায়গাটার কথা। সূর্যিমামাও তাড়া দিচ্ছে। আস্তে আস্তে ঠাণ্ডাও বাড়ছে।

গৌরীকুণ্ডে পৌঁছনোর পর গৌরীকুন্ডের উষ্ণ জলে অবগাহন আপনাদের। কুন্ডের জলে কি যেন এক যাদু আছে। আপনাদের পথক্লান্তির পূর্ণ নিরাময়।

কুন্ডের জলে পা দোলাতে দোলাতে আপনাদের স্যার নারলিকার সাহেব বললেন, "একটা কথা ভাববার আছে। আইনস্টাইন কসমোলজিক্যাল কন্সট্যান্টটিকে একটি বিকর্ষিত বল হিসাবেই ভেবেছিলেন। এর অর্থ এই যে তিনি প্রমাণ করতে না পারলেও এমনকি অর্থপূর্ণ কোন যুক্তি দেখাতে না পারলেও এটি বুঝতে পেরেছিলেন বিশ্বের আঙিনায় এক বিকর্ষিত মাধ্যাকর্ষণ বলের সম্ভাব্য অস্তিত্ব।" তখন অন্ধকার বস্তু বা অন্ধকার শক্তির অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়নি। প্রমাণিত হয়নি আমাদের ব্রহ্মান্ডের ৯৫ শতাংশই আমাদের অজ্ঞাত। অন্ধকার পদার্থের ব্যাপারে হয়ত বা কিছু অনুমান করা সম্ভব। প্রায় নিশ্চিত ভাবে বলা যায় অদূর ভবিষ্যতেই এদের পরিচয় উন্মোচিত করতে সক্ষম হব আমরা। কিন্তু বিশ্বের ৭০ শতাংশে যার পূর্ণ আধিপত্য সেই অন্ধকার শক্তির ব্যাপারে মানুষের জ্ঞান শূন্য। প্রায় শূন্য।

এই বলে আপনার নারলিকার সাহেব যেন একটু ভাবগ্রস্থ হয়ে পড়লেন।

ভাবাচ্ছন্ন অবস্থায় বললেন যখন অন্ধকার শক্তির সম্বন্ধে চিন্তা করি জানি না কেন গুরুদেবের কথা মনে হয়। সান্ত্বনা দিই অশান্ত মনকে। বলি "জানার অর্থ না জানাকে জানার"।

গুরুদেবের ভাষায়—

"জানার মাঝে অজানারে
করেছি সন্ধান।"

দ্বাদশ অধ্যায়

সুপার স্ট্রিং-থিয়োরী M-থিয়োরী

ধরা যাক আমেরিকার নিউইয়র্কে গেছেন আপনি আপনার ভায়ের কাছে। একদিন আপনার ভাই অফিস থেকে ফিরে আসার পর আপনাদের ডিনার পর্ব সারা। সময় রাত্রি ৯টা। আপনার ভাইয়ের আমেরিকান স্ত্রীর প্রস্তাব "চলুন দাদা আপনাকে এমপ্যায়ার এসটেট বিল্ডিং দেখিয়ে আনি।

আপনার প্রশ্ন এখন? এই রাত্রে? ভাইয়ের স্ত্রীর পাল্টা প্রশ্ন কেন? এখন নয় কেন? Empire State Buliding বছরের ৩৬৫ দিনই খোলা থাকে দর্শকের জন্যে। সকাল ৮টার থেকে রাত্রি ১১টা পর্যন্ত। সাবওয়েতে আমাদের লাগবে আধঘন্টা। এই সময় টিকিট-এর জন্যে লাইন দিতে হবে না। সিকিউরিটিও তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। ৯-৪৫-এর মধ্যেই ১০১ তলার অবজারভেটরীতে পৌঁছে যাব আমরা। রাত্রে নিউইয়র্কের এক অন্য রূপ দেখবেন উঁচু থেকে। চলুন দাদা তাড়াতাড়ি করুন।

এমপ্যায়ার এসটেট বিল্ডং-এর সুপার ফাস্ট লিফটে করে যখন ১০১ তলার অবসার ভেটরিতে পৌঁছলেন তখন ঠিক ৯-৪৫।

অবজারভেটরির ব্যালকনি থেকে রাত্রের নিউইয়র্ক দেখা এক নতুন অভিজ্ঞতা। কিছুটা রাত্রে এরোপ্লেন ল্যান্ড করার সময় একটি শহরকে দেখার মত। তফাৎ এরোপ্লেনের জানালা দিয়ে কেবল একদিকই দেখা যায়। এখানে সমস্ত নিউইয়র্ক শহরটিই দেখা যায়। অন্য শহরের প্যানরমিক ভিউর তুলনায় নিউইয়র্ক অনেক বেশী আলোকিত। একটি শহরকে যে এইভাবে আলোকিত করা সম্ভব না দেখলে বিশ্বাস হয় না।

ESB-র ব্যালকনিতে বসান দূরবীন দিয়ে প্রায় ৪ কি.মি. দূরে দারুনভাবে আলোকিত স্টাচু অফ লির্বাটি দেখার সে আরেক নতুন অভিজ্ঞতা। অপর প্রান্তে আলোর মালায় সজ্জিত ওয়াশিংটন ব্রিজ। আপনি যখন মহিত হয়ে চারদিক দেখছেন আপনার ভাই-এর স্ত্রী বললেন "দাদা আপনাকে ESB সম্বন্ধে কয়েকটা তথ্য বলে রাখি।

Empire State Building-এর উচ্চতা ১৪৫৩ ফিট বা ৪৪৩ মিটার। ১৯৩০ সালে তৈরী আরম্ভ। তৈরী শেষ মাত্র ১ বছর ৪৫ দিন পরে ১৯৩১ সালে। লোহা

লেগেছিল ৬০,০০০ টন। এতে ৬৫০০টি জানলা আছে। ৭৩টি লিফ্‌ট আছে। এই অবজারভেটরির থেকে কোন এক পরিষ্কার দিনে খালি চোখে ৮০ মাইল দূর পর্যন্ত দেখা যায়। বছরে গড়ে ১০০ বার বজ্রপাত হয় এই বিল্ডিং-এ। ঘন্টায় ১২০ মাইল বেগে ঝড়ে বিল্ডিং-এর সর্বোচ্চ স্থলটি মাত্র ১/৪ ইঞ্চি দোলে।

আপনি বললেন একটু সময় দাও মা। যা বললে হজম করতে হবে তো। এখান থেকে যা দেখছি বিশ্বাস হতে চায় না এই সব মানুষের কীর্তি? এই বিশাল বিশাল সব স্থাপত্য। চতুঃপার্শ্বে যতদূর দৃষ্টি যায় বিস্মিত হতে হয় স্থাপত্যের শৈলীতে। গর্ব হয় মানুষের দক্ষতায়, গর্ব হয় মানুষের দৃঢ় সংকল্পে, গর্ব হয় মানুষের প্রয়োজনের তাগিদে সৃষ্টির ক্ষমতায়।

আপনার ভায়ের স্ত্রী বললেন না জানি কেন আজ দর্শকের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম।

আপনি লক্ষ্য করলেন এক আমেরিকান ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে চারপাশের শোভা দেখছেন। ভায়ের স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন ভদ্রলোককে চেনা চেনা লাগছে। কে বলত?

ভায়ের স্ত্রী বললেন ভদ্রলোকের নাম ব্রায়ন গ্রীন (Brian Greene)। সায়েন্সের বই লেখেন। টেলিভিশনে দেখেছি কয়েকবার।

আপনার তো কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা। আপনার সর্বাধিক প্রিয় লেখক। কসমোলজির ওপর দুটি দুর্ধর্ষ বই লিখেছেন। দি এলিগ্যান্ট ইউনির্ভাস (The Elegant Universe) এবং দি ফেবরিক অফ দি কসমস (The Fabric of the Cosmos)। দুটি বই-ই ইন্টারন্যাশানাল বেস্ট সেলার। ফিজিক্স এবং অঙ্কের প্রফেসার। স্ট্রিং থিয়োরীর ওপর গবেষণাকরছেন। কসমোলজিতে অগাধ পাণ্ডিত্য।

আপনার মনে পড়ে গেল মিঃ গ্রীন-এর একটি সাক্ষাৎকার আপনি পড়েছিলেন।

মি. গ্রীন কে প্রশ্ন : আপনার মত এত বুদ্ধিমান মানুষ পদার্থ বিজ্ঞান তথা কসমোলজির ওপর কেন এত আকর্ষিত হয়েছিলেন?

মি. গ্রীনের উত্তর : কৈশরে উপনীত হওয়ার উপরান্তে অন্যান্য সব কিশোরের মত মনে প্রশ্ন জেগেছিল বা বলতে পারেন জানার কৌতূহল হয়েছিল "বিশ্বের সমস্ত কিছুর মানে কি?" পৃথিবী, মানুষ, জীব, জন্তু, জগৎ, সংসার, ইতিহাস, বর্তমান, ভবিষ্যত, রাগ, দুঃখ, আনন্দ, ভাললাগা, যুদ্ধ, এই সব আর কি? সময় কেন? কেন গতকাল? কেন আগামীকাল? আকাশ কি? কি দিয়ে তৈরি? মানুষের জন্মাবার কারণ?

এইসব প্রশ্নের নানা মনীষীর নানা উত্তর। কোন উত্তরই আমায় পূর্ণ পরিতৃপ্ত করতে পারে নি। মনে হয়েছিল এই সব প্রশ্নের সম্পূর্ণ সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া সম্ভব হবে না।

আমার মনে হয়েছিল নিদেনপক্ষে যদি এই সব প্রশ্নগুলিকে সঠিকভাবে চিহ্নিত

করাও সম্ভব হয়। যেমন সময় কেন? আকাশ কেন? সঠিকভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হলে হয়ত কোন একদিন এর উত্তর পাওয়া সম্ভব হবে।

একমাত্র পদার্থ বিজ্ঞান এইসব প্রশ্নগুলিকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করে। Recognise করে। এই কারণেই আমি পদার্থ বিজ্ঞানের দিকে আকর্ষিত হই। কসমোলজি ক্রমান্বিত আকর্ষণের কারণ। দেখুন ফিজিক্স যা বলে প্রমাণ সহকারে বলে। মানুষের অনেক ধর্মীয় গোঁড়ামি, অন্ধ বিশ্বাস, কু-সংস্কার দূর করেছে বিজ্ঞান।

কসমোলজি প্রমাণ সহযোগে বিশ্বের সঠিক পরিচয় উন্মোচিত করার চেষ্টা করে। বিশ্বের আচার ব্যবহার, রীতি নীতি, জন্ম, সম্ভাব্য মৃত্যু ইত্যাদি ব্যাপারগুলিতে বৈজ্ঞানিকভাবে আলোকপাতের চেষ্টা করে।

আপনি আপনার ভাতৃবধুর বাধা অগ্রাহ্য করে করজোড়ে মি. গ্রীনের কাছে গিয়ে বললেন ''আমায় মার্জনা করবেন স্যার। আপনাকে ডিসটার্ব করছি বলে দয়া করে কিছু মনে করবেন না। আবি পূর্ব গোলার্ধের মানুষ। ইন্ডিয়া থেকে আপনাদের সুন্দর দেশটিকে দেখতে এসেছি। আমি আপনার গুণগ্রাহী এবং বলতে পারেন অন্ধ ভক্ত। নিজের ভাগ্যকে বিশ্বাস করতে পারছি না যে আমি আপনার সঙ্গে কথা বলছি। আপনার লেখা দুটি বইই আমি বেশ কয়েকবার পড়েছি। বই দুটি পড়ার পূর্বে ধারণা করতেও পারিনি কসমোলজি সাবজেক্টটি এইভাবে পরিস্ফুটিত করা সম্ভব।

আমি জানি আমেরিকানরা কারো প্রাইভেসিকে ডির্সটাব করা একেবারেই পছন্দ করেন না। বিশেষ করে গায়ে পড়ে কথা বলা প্রায় অভদ্রতার পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু স্যার আমি আপনাকে দেখে নিজেকে সংযত রাখতে পারি নি। আমায় ক্ষমা করবেন।

ক্ষণকাল আপনাকে নিরীক্ষণের পর মিঃ গ্রীনের বিলম্বিত প্রতিক্রিয়া ''না না, আমি কিছু মনে করিনি। আপনি এত দূর দেশের অতিথি। কত রিচ কালচার আপনাদের। কত হাজার বছর আগে আপনারা কসমোলজি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করেছেন। চর্চা করেছেন। তৎকালীন সময়ে আপনাদের কসমোলজি সম্বন্ধে জ্ঞান ছিল সর্বাধিক। বলুন আপনি কি আমায় কিছু বলতে চান? নিঃর্দ্বিধায় বলুন।

আপনার বিনম্র নিবেদন ''স্যার আপনার বইগুলি পড়ে আমি অনুপ্রাণিত হয়ে আমার মাতৃভাষা বাংলায় কসমোলজির ওপর একটি বই লিখছি। আমার খুবই ইচ্ছা আপনার কাছ থেকে সুপার স্ট্রিং থিয়োরী এবং এম (M) থিয়োরী সম্বন্ধে কিছু শোনা।

মিঃ গ্রীন বললেন ''কেন? আমার বই দুটিতেই তো সুপার স্ট্রিং থিয়োরী এবং এম থিয়োরী সম্বন্ধে লেখা রয়েছে। বিস্তারিতভাবেই লেখা রয়েছে।

আপনার আবদার ''স্যার সে সব আমি পড়েছি। কিন্তু আমার ইচ্ছে আপনার কাছ থেকে কিছু শোনা। From the horse's mouth। এই আর কি? এটি আপনার

কাছে আমার আরজি। আমার প্রার্থনা।

মঞ্জুর। আপনার আরজি। আপনার প্রার্থনা মঞ্জুর। আপনার কথা বলার ভাবভঙ্গী আমার ভালো লাগল।

O.K. আজ তো আর সম্ভব নয়। কাল বিকেল ৪টের সময় সেন্ট্রাল পার্কের সাউথ গেটে আমি আপনার জন্যে অপেক্ষা করব।

পরের দিন বিকেল বেলায় নিউ ইয়র্কের সেন্ট্রাল পার্কের একটি বেঞ্চে আপনি আর মিঃ ব্রায়েন গ্রীন দুজনে গিয়ে বসলেন।

মিঃ গ্রীন বললেন "চলুন সময় নষ্ট না করে আরম্ভ করা যাক আমার বক্তব্য।

দেখুন ইনফ্লেশন আরম্ভ হওয়ার পূর্বে বিশ্ব জীবনের প্রথম মুহূর্তগুলি সম্বন্ধে আজ অবধি আমাদের জ্ঞান শূন্য। কেবল বলা যায় বিশ্বের আয়তন ছিল কণার ক্ষুদ্রতম অংশ। ঘনত্ব ছিল অসীম। উত্তাপ ছিল উত্তাপের শেষ সীমায়।

অসীম ঘন বিশ্বের তথা অসীম ভর বিশিষ্ট বিশ্বের অবস্থার বিশ্লেষণে প্রয়োজন পড়ে আইনস্টাইনের জেনারেল থিয়োরী অফ রিলেটিভিটির প্রয়োগ। অপরদিকে বিশ্বে আয়তনের ক্ষুদ্রতম অবস্থায় বিশ্বের অবস্থার বিশ্লেষণে প্রয়োজন হয় কোয়ান্টাম মেনানিক্সের থিয়োরীর প্রয়োগ।

অর্থাৎ বিশ্ব জন্মের পরমূহুর্তে বিশ্ব পরিচয় জানার জন্যে জেনারেল থিয়োরী অফ রিলেটিভিটির এবং কোয়ান্টাম মেকানিক্সের সমীকরণগুলির যুগ্ম প্রয়োগের প্রয়োজন। ব্লাকহোলের কেন্দ্রেও সেই একই অবস্থান। ব্লাকহোলের সিংগুলারিটিতে (Singulerity) তে ক্ষুদ্রাতিতমক্ষুদ্র আয়তনের অসীম ঘনত্ব। অবস্থানটি নিজের পরিচয় উন্মোচিত করে কেবলমাত্র জেনারেল থিয়োরী অফ রিলেটিভিটি এবং কোয়ান্টাম মেকানিক্সের সমীকরণগুলির যুগ্ম প্রয়োগের মাধ্যমে। সমস্যা এই যে এই দুটি থিয়োরীর কোনটিই অপরের সঙ্গে যুগ্মভাবে কাজে অনিচ্ছুক। দুটি থিয়োরীর যুগ্ম ব্যবহারে যে উত্তর পাওয়া যায় সেটি হল ইনফিনিটি। অর্থাৎ দুটি থিয়োরী আপন আপন ক্ষেত্রে যেমন জেনারেল রিলেটিভিটি বৃহৎ এবং গুরুভরের ক্ষেত্রে এবং কোয়ানটাম মেকানিক্স ক্ষুদ্র এবং লঘুভরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু এদের যুগ্ম ব্যবহার নৈ বচ, নৈ বচ।

এই সমস্যায় জর্জরিত হয়েছিলেন বিশ্বের তাবড় তাবড় বৈজ্ঞানিকরা প্রায় চার দশক নিজ নিজ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে সফল এই দুটি থিয়োরীর সেতুবন্ধনে বহুশত বৈজ্ঞানীর একক এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টা কার্যত পরিণত হয়েছিল দীর্ঘনিঃশ্বাসে এবং নৈরাশ্যে।

এই বলে মিঃ গ্রীন অদূরে বিশাল বিশাল অট্টালিকাগুলির দিকে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। অতঃপর পুনরায় বলতে আরম্ভ করলেন। বললেন "দেখুন বিশ্বে পূর্ণ পরিচয় করে আমাদের কাছে উন্মোচিত হবে একথা বলা অসম্ভব। বিগত ১০০ বছরে মানুষ বিশ্ব পরিচয় উন্মোচন করতে যে পরিমাণ সাফল্য লাভ করেছে তা

পূর্ববর্তী প্রজন্মের সাফল্যের হাজার গুণ অধিক। আমার অনুমান আগামি দিনে এই অগ্রগতি অতি মাত্রায় ত্বরান্বিত হবে মানুষের ক্রমবর্ধমান জ্ঞানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে।

এখন আমরা প্রায় নিশ্চিতভাবে জানি আমাদের বিশ্বটির বয়স ১৩৭০ কোটি বছর। আকারে অসীম, আয়তনে বক্রতায় ফ্লাট, সমতল বিশ্ব। আয়তনে অসীম বিশ্ব। সর্বক্ষণে সম্প্রসারিত বিশ্ব। সম্প্রসারণের গতি ক্রমবর্ধমান। ১০.০০০ কোটি নক্ষত্রমন্ডলীর বাসস্থানের বিশ্ব। এই দশ হাজার কোটি নক্ষত্র মন্ডলীর এক একটি নক্ষত্রমন্ডলীতে ৭০-৮০ হাজার কোটি পর্যন্ত তারার অবস্থানের বিশ্ব। কোন কোন তারার সংসার এক অথবা একাধিক গ্রহের অবস্থানের বিশ্ব। সেই সব গ্রহদের এক বা একাধিক উপগ্রহের অবস্থানের বিশ্ব। ব্লাকহোলের মত ভয়ঙ্কর ভক্ষকের আশ্রয়দাতা বিশ্ব। নিউট্রন তারা, সাদা বামন তারা, বাদামী তারা (Brown Star), লাল দৈত্য তারা, উল্কা, ধুমকেতু, নিহারীকা ইত্যাদির বিচরণ ক্ষেত্রের বিশ্ব। বিগ বাঙ, সুপার নোভা বিস্ফোরণ, গামা-রে বিস্ফোরণ ইত্যাদির (সংঘটিত) ক্ষেত্রের বিশ্ব। জন্মক্ষণের পরমুহূর্তে ইনফ্লেশনের কারণে অসীমত্বের শেষ পরিমাপের বিস্তরণের বিস্তারিত বিশ্ব। ইনফ্লেশনের কারণে ক্ষুদ্রতম চন্দ্রবিন্দু আয়তনের বিশ্বের বিশাল বিস্তৃতির বিশ্ব। দুই নিউট্রন তারার, এই সাদা বামন তারার, দুটি তারামন্ডলী, এমনকি দুটি বিশাল ব্লাক হোলের সংঘর্ষের ক্ষেত্রের বিশ্ব। এই সমস্ত মহাকাশীয় বস্তুর জন্ম হতে মৃত্যু জীবনের অনুষ্ঠিত মঞ্চের বিশ্ব। এই হল বিশ্বের বিশালতা, বিশ্বের অসীমতা, বিশ্বের বৈচিত্র।

আপনার দিকে তাকিয়ে বললেন ঘাবড়ে যাবেন না যদি বলি এই সবই মাত্র ৫ শতাংশ। I mean বিশ্বপরিচয়ের মাত্র ৫ শতাংশ অবশিষ্ট ৯৫ শতাংশের ২৫ শতাংশ অন্ধকার বস্তু (Dark matter)। এই Dark matter বা অন্ধকার বস্তুর পূর্ণ পরিচয় এখনও আমাদের কাছে অজ্ঞাত। যদিও অন্ধকার বস্তুর ব্যাপারে আমাদের যুক্তিযুক্ত অনুমান বর্তমান (বিশদ বিবরণ একাদশ অধ্যায়ে) কিন্তু বিশ্বের সিংহভাগ দখলকারী অন্ধকার শক্তির (Dark Energy) ব্যাপারে মানুষের জ্ঞান, জ্ঞানের চৌহদ্দির পরপারে অবস্থিত। মনে রাখবেন ডার্ক এনার্জীর উপস্থিতি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। আজ অবধি বিশ্ব পরিচয়ে আমাদের জ্ঞানের পরিধি ৫ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই ৫ শতাংশ পরিচয় উন্মোচনের পেছনে শত শত জানা অজানা বৈজ্ঞানীর কত অক্লান্ত পরিশ্রম কত কঠোর তপস্যা চিন্তা করলেও সম্ভ্রমে মাথা নত হয়।

গ্যাললিও থেকে ম্যাক, নিউটন থেকে আইনস্টাইন, ফ্যারাডে থেকে ম্যাক্সওয়েল, কোপারনিকাস থেকে কেপলার, ডালটন থেকে বোর, রাদার ফোর্ড থেকে হাইসেনবার্গ, চন্দ্রশেখর থেকে প্রয়েড ম্যান, পোউলি থেকে বরন (Max Born) গ্লাসহো, সালেম, ওয়েন বার্গ থেকে হকিন্স। কত নাম করব? এই সব চিরস্মরণীয়

বৈজ্ঞানীকরা তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলাফল উপহার দিয়ে গেছেন পরবর্তী প্রজন্মকে। বিজ্ঞানের এই প্রথাটি চিরস্থায়ী প্রথা। আজকের বিজ্ঞানীরা উপলব্ধ জ্ঞান উপহার দিয়ে যাবেন আগামী কালের বিজ্ঞানীদের। মানুষের ক্রমবর্ধমান বিজ্ঞানের জ্ঞানের বিকাশের এইটাই মূল মন্ত্র।

আইনস্টাইন তাঁর জীবনের শেষ তিরিশ বছর গবেষণা করেছিলেন ৪টি মৌলিক বলের একত্রিকরণের চেষ্টায়। সাফল্য পাননি তিনি তাঁর গবেষণায়। যদিও তিনি জানতেন এই একত্রিকরণ সম্ভব। কারণ বিশ্বের জন্মক্ষণে বিশ্বের ঘনত্ব এবং উত্তাপের অসীমত্তে একটি মাত্র বলেরই অস্তিত্ব ছিল। অতঃপর প্রথম মাধ্যাকর্ষণ বল ও ক্রমান্বয়ে অপর তিনটি বল আপন বৈশিষ্টে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৭৯ সালে গ্লাসহো, সালেম এবং উয়েনবার্গ ইলেকাট্রাম্যাগনেটিক ফোরস এবং উইক নিউক্লিয়ার ফোরসের একত্রিকরণে সাফল্যমন্ডিত হন। একত্রিত বলগুলিকে বলা হয় ইলেকট্রো উইক ফোরস। তত্বীয়ভাবে প্রমাণিত $১০^{১৬}$ Gev তে স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফেরস্‌টিরও সংযুক্তিকরণ সম্ভব (একটি ইলেকট্রনকে এক ভোল্ট পেটেনসিয়ালের মধ্যে দিয়ে স্থানান্তরিত করার জনে যে পরিমল শক্তির প্রয়োজন তাকে বলা হয় ইলেকট্রন ভোল্ট। ১ গিগা ইলেকট্রন ভোল্ট $=১০^{৯}$ev। ১টি ইলেকট্রনের শক্তি ০.০০০৫Gev। প্রোটনের ০.৯৩৯Gev। পৃথিবীর বৃহত্তম পারটিক্যাল একসেলেটরে ১৪০০Gev উৎপন্ন করা সম্ভব।) এখনও পর্যন্ত এত শক্তিশালী পারটিক্যাল একসেলেটার নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে সম্ভব হবে।

গ্রীন সাহেব বললেন, ‘‘সম্ভব হবে না মাধ্যাকর্ষণের সংযুক্তিকরণ। আপনার দিকে তাকিয়ে বললেন ‘‘আপনি হয়ত প্রশ্ন করতে পারেন কেন না? জবাবে বলি ‘‘দেখুন আইনস্টাইনের জেনারেল থিয়োরী অফ রিলেটিভিটি একটি ক্যাসিকাল থিয়োরী। এই থিয়োরীতে কোয়ান্টাম থিয়োরীর সম্ভাব্য (Probability) ইত্যাদি ব্যাপারটি অনুপস্থিত। বিশ্বের আঙিনায় বিচরণরত যাবতীয় গুরুভর পদার্থের গতিবিধি সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করে এই থিয়োরী। বিশ্বের একটি সার্ব্বিক পরিচয় দেয় এই থিয়োরী। সার্বিক পরিচয় নিশ্চই দেয় কিন্তু দেয় না সম্পূর্ণ পরিচয়। বিশ্বের সম্পূর্ণ পরিচয় প্রদান এই থিয়োরী অক্ষম। একইভাবে অক্ষম কোয়ান্টাম মেকানিকস্ এর থিয়োরী। সক্ষম কেবল দুটি থিয়োরীর যুগ্ম প্রয়োগ।

কোয়ানটাম থিয়োরী এবং রিলেটিভিটি থিয়োরীর সেতুবন্ধন। এই সেতুবন্ধনের অগ্রগামী থিয়োরীটি নিশ্চয় করে বলা যায় সুপার স্ট্রং থিয়োরী।

আপনার দিকে তাকিয়ে গ্রীন সাহেব বললেন, ‘‘সুপার স্ট্রিং থিয়োরী এবং (M)এম থিয়োরী সম্বন্ধে from the horse’s mouth শোনার জন্যই আমার অনুরোধ করেছিলেন। তাই না বাঙালীবাবু? শুনুন তাহলে। Here we go।

১৯৬৮ সাল। দুটি কণার মধ্যে স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোরসের কারণে আকর্ষণ, এই

ব্যাপারটি নিয়ে সুইজারল্যান্ডের CERN পারটিক্যাল একসেলেটরে গবেষণায় রত নবীন ইটালিয়ান-বিজ্ঞানী গ্যাব্রিয়াল ভান্যেজিয়ানো (GABRIELE VENEZIANO)। তাঁর গবেষণা প্রাপ্ত তথ্য সহযোগে রচনা করেন নতুন সমীকরণ। তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে লক্ষ্য করেন তাঁর রচিত সমীকরণগুলির এবং ইউলার বেটা ফাংসান (EULER BETA FUNCTION) সমীকরণগুলির আশ্চর্য সংগতি। (লিওনহার্ড ইউলারা, সুইজারল্যান্ডের গণিতে পন্ডিত ছিলেন। তিনি গাণিতিক স্বার্থে কয়েকটি সমীকরণ রচনা করেছিলেন প্রায় দুশ বছর পূর্বে। এই সমীকরণগুলি ইউলার বেটা ফাংসান নামে বিখ্যাত।)

ভেন্যেজিয়ানো এই আশ্চর্য সংগতির কারণ ব্যাখ্যা করতে সাফল্যমণ্ডিত হন নি। তাঁর অপূর্ব দক্ষতা এই যে দুশো বছরের পুরোনো সমীকরণের সঙ্গে সংগতি বের করা।

১৯৭০ সাল। তিন বিজ্ঞানীর মিলিত প্রচেষ্টায় ভেন্যেজিয়ানোর রচিত সমীকরণের সঙ্গে ইউলার বেটা ফাংসনের সংগতির কারণ বের করা সম্ভব হয়। এই তিন বিজ্ঞানীর নাম ১) স্টানফোর্ড ইউনিভারসিটির নিওর্নাড সাসকাইন্ড (Leonard susskind) ২) নীল রোর ইন্সটিটিউটের হোলজার নেইলসন (Holger Nielsen) ৩) সিকাগো. বিশ্ববিদ্যালয়ের ইওচুরো নাম্বু (Yoichiro Nam bu)

এই তিন বিজ্ঞানী প্রমাণ করেন অতি ক্ষুদ্রদুটি কণার মধ্যে স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোরসের ক্রিয়ার কারণ। কিসের জন্যে বা কার জন্যে দুটি অতি ক্ষুদ্রকণা স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোরসের প্রভাবে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়?

তিন বিজ্ঞানী প্রমাণ করেন দুটি অতি ক্ষুদ্র কণার মাঝে স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোরস কাজ করে, কারণ এই দুটি ক্ষুদ্র কণা পারস্পরিকভাবে অত্যন্ত শীর্ণ সুতোরা মত রবার ব্যান্ডের আকারে এক অতি ক্ষুদ্র পদার্থ দ্বারা সংযুক্ত। ইউলার বেটা ফাংসন সমীকরণগুলি প্রয়োগের দ্বারা এই অতি শীর্ণ সুতোর মত অত্যন্ত ক্ষুদ্র কণাদের গতিবিধি বিশ্লেষণ করা সম্ভব।

এই সব অতি শীর্ণ সুতোর মত ক্ষুদ্র কণাদের নামকরণ করা হয় স্ট্রিং। এই হল স্ট্রিং থিয়োরীর জন্ম বৃত্তান্ত। এরপর মিঃ গ্রীণ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন চলুন একটু পদচালনা করা যাক। সেন্ট্রাল পার্কের উচু নিচু অথচ মসৃণ বাঁধান রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে মিঃ গ্রীণ বললেন "স্ট্রিং থিয়োরীর জন্মের পর থেকেই তাঁর জীবন আমাদের এই রাস্তার মত মসৃণ ছিল না। বিজ্ঞান সমাজে স্বীকৃতি পাচ্ছিল না স্ট্রিং থিয়োরী। পারটিক্যাল ফিজিক্সের পারটিক্যালদের অনেক আচরণ, অনেক গতিবিধি বিশ্লেষণ করা সম্ভব হচ্ছিল না এই থিয়োরীর সাহায্যে।

স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোরসের অনেক নতুন আবিষ্কৃত তথ্য ব্যাখ্যা করাও সম্ভব হচ্ছিল না সুপার স্ট্রিং থিয়োরীর সমীকরণগুলির সাহায্যে।

অপরদিকে এই সমস্ত তথ্যগুলিকে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হচ্ছিল

তৎকালীন সুপারস্ট্রিং থিয়োরীর প্রতিদ্বন্দী কোয়ানটাম ক্রেমো ডায়নামিক্‌সের সাহায্যে।

এরপর মিঃ গ্রীণ আপনার দিকে তাকিয়ে বললেন আপনাদের বিখ্যাত ভারতীয় বিজ্ঞানী অভয় আসতেকার (ABHAY ASHTEKAR) গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেছেন কোয়ানটাম ক্রোমো ডাইনামিক্‌স নিয়ে।

এর ফলে স্ট্রিং থিয়োরীতে প্রতিশ্রুতি থাকা সত্ত্বেও এই থিয়োরী যথাসম্ভব উদ্দীপনা এবং আকর্ষণ সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়েছিল। তবে এই অবস্থা খুব বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। অল্পকাল পরেই স্ট্রিং থিয়োরী মঞ্চে প্রত্যাবর্তন করেছিল নতুন উদ্দীপনায় অধিক প্রতিশ্রুতি সহকারে।

জন সোয়ার্জ (John Schwarz) (প্রথমদিকের স্ট্রিং থিয়োরীর ওপর বিশ্বাসী বিজ্ঞানী) এই থিয়োরীর একটি বিশেষ ব্যাপার লক্ষ্য করেন।

তিনি লক্ষ্য করেন স্ট্রিং থিয়োরীর সমীকরণগুলির অনুসারে একটি অত্যন্ত শক্তিশালী পারটিক্যাল একসেলেটারে দুটি ক্ষুদ্র কণার সংঘর্ষে এমন একটি কণার সৃষ্টি হওয়া উচিৎ যার ভরশূন্য এবং যার অপর আর একটি বৈশিষ্ট্য "স্পিন-২" থাকা উচিৎ।

আপনার প্রশ্ন "স্যার ডিসর্টাব করার জন্যে মাফ করবেন। কিন্তু "Spin-2" ব্যাপারটি বুঝলাম না। যদি সামান্য বুঝিয়ে বলেন।

মিঃ গ্রীণ বিস্তারিত বিবরণে না গিয়ে বলা যায় এই ক্ষুদ্রতম কণার ঘূর্ণীয়মান গতি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক বলের বাহন কণা ফোটনের ঘূর্ণীয়মান গতির দ্বিগুণ।

পদচারণা বন্ধ করে গ্রীণ সাহেব বললেন "জেনারেল রিলেটিভিটি এবং কোয়ানটাম মেকানিকসের সংযুক্তিকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্ব-তত্ত্ব বিশ্লেষণে এই সংযুক্তিকরণ বিশেষ জরুরী। আশাকরা যায় অদূর ভবিষ্যতে স্ট্রিং থিয়োরী পরীক্ষিতভাবে প্রমাণ করা সম্ভব হবে। তখন অত্যন্ত জরুরি কাজটি সম্পন্ন করা সম্ভবপর হবে। অন্যথায় বিশ্বের জন্মক্ষণের চিত্রটি এবং ব্লাকহোলের অভ্যন্তরের চিত্রটি আমাদের নিকট রহস্যাবৃতই থেকে যাবে।

পুনরায় পদচারণা আরম্ভ করে গ্রীণ সাহেব বললেন "ইলেকট্রোম্যাগনেটিক বলের বাহন কণা "ফোটন" এটি পরীক্ষিতভাবে প্রমাণিত। অনুরূপভাবে ত্বত্তীয়ভাবে গণনার দ্বারা অনুমান করা হয় মাধ্যাকর্ষণ বলের বাহন কণা গ্রাভিটন। অদ্যপি গ্রাভিটনের অস্তিত্ব পরীক্ষিতভাবে প্রমাণিত করা সম্ভব হয়নি। ত্বত্তীয়ভাবে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে এই বাহন কণাটির বৈশিষ্ট্যগুলি। এই বাহন কণাগুলির ভর শূন্য এবং স্পিন-২ (Spin-2) অবস্থায় এদের অবস্থান। জন সোয়ার্জ সদ্যপ্রাপ্ত গ্রাভিটন কণার বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে স্ট্রিং থিয়োরী দ্বারা তত্ত্বীয়ভাবে উদ্ভূত কণার সম্পূর্ণ সংগতিটি লক্ষ্য করেন। তিনি বক্তব্য রাখেন যদিও স্ট্রিং থিয়োরী স্ট্রং নিউক্লিয়ার বলের বিশ্লেষণের জন্য রচিত কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই থিয়োরীটি

কোয়ানটাম মেকানিকসের গ্র্যাভিটেশন বলের থিয়োরী। অর্থাৎ স্ট্রিং থিয়োরী মাধ্যাকর্ষণ বলটিকে কোয়ানটাম মেকানিকস্ দ্বারা বিশ্লেষিত করে। ব্যাখ্যা করে। স্ট্রিং থিয়োরী অনুসারে ভরশূন্য এবং স্পিন-২ বৈশিষ্ট্য যে কণাটির সম্ভাব্য অস্তিত্বের ব্যাপারে মত প্রকাশ করে সেই কণাটি হল গ্রাভিটন। মাধ্যাকর্ষণ বলের কোয়ানটাম কণা। কোয়ানটাম পারটিক্যাল।

গ্রাভিটি, মাধ্যাকর্ষণ বিশ্বের দুর্বলতম বল। গ্রাভিটন-এর বাহনকণার শক্তির ক্ষুদ্রতম কণা। এই কারণেই আজ পর্যন্ত গ্রাভিটনের অস্তিত্ব পরীক্ষিতভাবে প্রমাণিত করা সম্ভব হয়নি।

গ্রীণ সাহেব হাঁটতে হাঁটতে তাঁর বক্তব্য জারী রাখলেন। বললেন স্ট্রিং থিয়োরীর সমীকরণগুলি এই তথ্য প্রদান করে যে স্ট্রিং-এর শক্তি তাদের দৈর্ঘ্যের অনুপাতিক। অধিক দৈর্ঘ্যের স্ট্রিং, অধিক শক্তিমান স্ট্রিং। স্বল্প দৈঘ্যের স্ট্রিং, স্বল্প শক্তিমান স্ট্রিং।

জন সোয়ার্জ গাণিতিকভাবে প্রমাণ করেন গ্রাভিটন কণার ন্যায় ক্ষুদ্র শক্তির কণার গঠনের জন্য অত্যন্ত ক্ষুদ্র দৈর্ঘ্যের স্ট্রিং এর প্রয়োজন। প্লাঙ্ক লেন্‌তের (Plank length ১০$^{-৩৩}$ সে. মি.) স্ট্রিং-এর প্রয়োজন। আপনার তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন স্যার আপনি বললেন কণা গঠনের জন্যে স্ট্রিং-ওর প্রয়োজন। স্ট্রিং কি কণা গঠন করে?

মিঃ গ্রীণ বললেন আপনি এক্কেবারে সঠিক সময়ে সঠিক প্রশ্নটিই করেছেন। আপনার মনোযোগিতা আমায় মুগ্ধ করেছে। যা বলছিলাম "স্ট্রিং বিশ্বের যাবতীয় পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণাদের গঠন করে। ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত প্রকারের কাঁচা মালের গঠনের মূলে স্ট্রিং।

আসুন বাঙালীবাবু স্ট্রিং-এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে—দিই আপনার। মনে রাখবেন স্ট্রিং-এর সম্বন্ধে যে বিবরণগুলি বলব সবই তত্ত্বীয়। আজ পর্যন্ত স্ট্রিংদের অস্তিত্ব পরীক্ষিতভাবে প্রমাণিত নয়। এতই ক্ষুদ্র এর দৈর্ঘ্য।

স্ট্রিং-এর পরিচয় দিতে হলে বলা উচিৎ এটি একটি অতি ক্ষীণ মানের শীর্ণ এক দিশার সুতোর আকারের শক্তি। এর কেবল দৈর্ঘ্যই বর্তমান। ক্ষুদ্রের শেষ সীমার ক্ষুদ্রতম এর দৈর্ঘ্য। দৈর্ঘ্যের পরিমাণ প্লাঙ্ক length-এর পরিমাণ অর্থাৎ ১০$^{-৩৩}$ সে.মি.। মনে রাখবেন এটি কোন পদার্থ অথবা পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ নয়। এটি একটি অত্যন্ত মৃদুশক্তি যা ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম দৈর্ঘ্যের সুতোর আকারে আকাশে অবস্থান করে।

স্ট্রিং-এর দুটি রূপ। কোন কোন স্ট্রিং-এর দুটি প্রান্ত মুক্ত। ওপেন লুপ (Open loop) স্ট্রিং। কোন কোন স্ট্রিং-এর দুটি প্রান্ত যুক্ত। ক্লোজ্‌ড লুপ (Closed loop) স্ট্রিং। বাঙালীবাবু মনে রাখবেন স্ট্রিং এক প্রকার String এর কোন প্রকার ভেদ নেই। যখন কোন String স্ট্রিং এক বিশেষ স্পন্দনে স্পন্দিত হয় তখন একটি বিশেষ কণার উদ্ভব হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় স্ট্রিং এক বিশেষ স্পন্দন গঠন করে আপ স্কেয়ার্ক কণা। অনুরূপভাবে অপর একটি স্পন্দনের মানের কারণে গঠিত

হয় অপর একটি ক্ষুদ্র কণা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক বলের বাহন কণা ফোটন। স্ট্রিং-এর অন্য এক বিশেষ স্পন্দন গঠন করে মাধ্যাকর্ষণ বলের বাহন কণা গ্রাভিটন। এইরূপে একই স্ট্রিং-এর বিভিন্ন স্পন্দনের কারণে উদ্ভব হয় বিভিন্ন ক্ষুদ্রতম কণা।

আপনার দিকে তাকিয়ে মিঃ গ্রীণ বললেন মনে রাখবেন একই স্ট্রিং,—তাদের ভিন্ন ভিন্ন স্পন্দনের কারণে গঠিত হয় ভিন্ন ভিন্ন কণা। এই নয় যে আপ স্কেয়োর্কের জন্যে আপ স্কেয়োর্ক স্ট্রিং, ডাউন স্কেয়োর্কের জন্য ডাউন স্কেয়োর্ক স্ট্রিং, গ্রাভিটনের জন্য গ্রাভিটন স্ট্রিং নিউক্লিয়ার বলের বাহন কণা গ্লুয়নের জন্যে গ্লুয়ন স্ট্রিং, ইলেকট্রনের জন্য ইলেকট্রন স্ট্রিং, মিওন-এর জন্য মিওন স্ট্রিং, টাউ কণার জন্য টাউ স্ট্রিং ইত্যাদি ইত্যাদি। স্ট্রিং এক। স্ট্রিং-এর প্রকার ভেদ অবর্তমান। কেবল এর রূপ দুটি। মুক্ত রূপ এবং যুক্তরূপ। একই স্ট্রিং, কেবল স্পন্দনের তারতম্যে উৎপন্ন করে বিশ্বের যাবতীয় পদার্থের, যাবতীয় বলের কাঁচা মাল বা র মেটেরিয়াল (RAW MATERIAL)।

স্ট্রিং থিয়োরীর অনুসারে সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত কিছুর উৎস, সমস্ত কিছুর মূলে, সমস্ত কিছুর অস্তিত্বের কারণ স্ট্রিং-এর স্পন্দন।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় কোন প্রকার তার বাদ্যযন্ত্রের বিভিন্ন তারের দৈর্ঘ্যের স্পন্দনে তৈরী হয় বিভিন্ন ধ্বনি, একইভাবে String স্ট্রিং-এর ভিন্ন ভিন্ন স্পন্দনে গঠিত হয় ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্রকণা (Particles)।

এই পর্যন্ত বলার পর গ্রীণ সাহেব হয়ত বা বিশ্রামের জন্য সামান্য থামলেন। হাঁটতে হাঁটতে আপনারা ততক্ষণ সেন্ট্রাল পার্কের লেকের বিখ্যাত বো ব্রিজের (Bow Bride)-এর কাছে চলে এসেছেন। ৬০ ফিট লম্বা ঢালাই লোহার এই ব্রিজটি ঢালাই লোহার শিল্প নৈপুণ্যে ভুবন বিখ্যাত। জায়গাটিও ততধিক মনোরম। সবুজের সমারহ। পার্কটিকে সুসজ্জিত রাখার এবং সযত্নে রক্ষণা-বেক্ষণের অপূর্ব নিদর্শন।

ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে মিঃ গ্রীণ বললেন জানেন স্টিংদের এই বিভিন্ন প্রকার স্পন্দনের জন্য প্রয়োজন পড়ে ৯টি আকাশের দিশার। (9 spacial dimensions)। সঙ্গে সময়ের দিশাটি অন্তর্ভুক্ত করলে সমষ্টিগতভাবে প্রয়োজন পড়ে ১০টি দিশার।

সঙ্গে সঙ্গে আপনার "স্যার...হাতের ইশারায় আপনাকে চুপ করতে বলে গ্রীণ সাহেব বললেন "আমি ১০টি দিশার কথা বলায় বিশ্বাস হচ্ছে না। তাই তো? আমিও যখন প্রথম শুনি আমারও বিশ্বাস হয়নি। এমনকি খোদ আইনস্টাইনেরও হয়নি। আইনস্টাইনের ক্ষেত্রে যদিও ব্যাপারটি ছিল ১০টি দিশা নয়, পরিচিত ৪টি দিশার থেকে ১টি অধিক দিশা। মোট ৫টি দিশার ব্যাপার।

১৯১৯ সাল। জার্মান গণিত বিশারদ থিওডর কলুজা (THEODOR KALUZA) প্রমাণ করেন ইলেকট্রোম্যাগনেটিক বল এবং মাধ্যাকর্ষণ বলের সংযুক্তিকরণ সম্ভব। সম্ভব একমাত্র যদি পরিচিত তিনটি আকাশের দিশার অতিরিক্ত আরও একটি

আকাশের দিশা অনুমান করা হয়। কলুজা আইনস্টাইনকে এই ব্যাপারটি চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন। আইনস্টাইন অবশ্য এই সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করেন নি।

গ্রীণ সাহেব বললেন দেখুন প্রাত্যহিক জীবনে আমরা যা কিছু দেখি, যা কিছু ব্যবহার করি সবই তিন দিশার বা থ্রি জাইমেনশনাল। আমি, আপনি এই ব্রিজ, এই লেক, এই সমস্ত কিছুই থ্রি ডাইমেনশনাল। একটি কিউব বর্গক্ষেত্র থ্রি ডাইমেনশনাল। দৈর্ঘ, প্রস্থ এবং উচ্চতা-এর তিনটি দিশা, তিনটি ডাইমেনশন। শান্ত লেকের জলের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন লেকের জলের পৃষ্ঠদেশটি কিন্তু ২ দিশার বা টু ডাইমেনশনাল। জলের পৃষ্ঠদেশটির দৈর্ঘ্য বর্তমান, প্রস্ত বর্তমান, উচ্চতা শূন্য। অনুরূপভাবে একটি কাগজের পৃষ্ঠাও টু ডাইমেনশনাল। যদিও কাগজের পৃষ্ঠার একটি অতি সামান্য উচ্চতা বর্তমান, উদাহরণের জন্যে আমরা হয়ত এই উচ্চতাটিকে অগ্রাহ্য করতে পারি। যদি পেন দিয়ে কাগজের পৃষ্ঠাটিতে একটি সরলরেখা অঙ্কিত করা হয় তবে ঐ সরলরেখাটিকে বলা যায় একটি, দিশা এক বা এটি ওয়ান ডাইমেনশনাল।

বো ব্রিজ থেকে নিচে নামতে নামতে গ্রীণ সাহেব বললেন প্রাত্যহিক জীবনে আমরা আকাশের তিনটি দিশার মধ্যে কাজকর্ম করতে অভ্যস্ত। এবং "কখন" বা "কবে"র ব্যাপারটি বিবেচনা করার সময় "সময়ের অপর একটি দিশা আকাশের তিনটি দিশার সংযুক্তিকরণে আমরা ৪টি দিশার ব্যাপারে চিন্তা করতে সক্ষম। কিন্তু থিওডর কলুজার প্রস্তাবিত ৪টি আকাশের দিশা এবং ১টি সময়ের দিশা, সর্বসমেত ৫টি দিশার বিশ্ব ব্যাপারটি কল্পনার অথবা উপলব্ধির উর্ধ্বে।

১৯২৬ সাল। সুইডেনের বিজ্ঞানী অস্কার ক্লেন (Oskar Klen) আকাশের এই চারটি দিশার চতুর্থ দিশাটির সম্ভাব্য অবস্থানের একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তিনি প্রস্তাব করেন চতুর্থ আকাশের দিশাটি একটি অত্যন্ত ক্ষুদ্র দিশা। ক্ষুদ্রতায় প্লাঙ্ক স্কেলের নিকটবর্তী এর আয়তন। এই দিশাটি আকারও বৃত্তাকার (Circular)। আকাশের প্রতি অংশে সর্বচ্চে-এর অবস্থান।

এরপর মিঃ গ্রীণ আপনার দিকে তাকিয়ে বললেন এই চতুর্থ দিশাটি বোঝাবার জন্য একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। শুনুন :—

চিন্তা করুন অনেক দূরে দুটি সুউচ্চ মিনার। অনেকটা আপনাদের কুতুব মিনারের মত। ধরুন দুটি মিনারের দূরত্ব ৫০০ মিটার। মিনারের চূড়া দুটি একটি দীর্ঘ শক্ত দড়ি দিয়ে বাঁধা। আপনি দেখলেন একজন দড়াবাজিকর (tight-rope waker) তাঁর ক্রীড়া প্রদর্শনে ব্যস্ত। দুটি মিনারের যুক্তকারী দড়িটির দিশা এক। কারণ দড়িবাজিকরের পক্ষে দড়িটির ওপর একটি মাত্র দিশায় পরিভ্রমণ করা সম্ভব। হয় অগ্রে অথবা পশচাতে। অগ্র পশচাৎ একটি দিশা। অনুরূপে উর্ধ্ব অধো অপর একটি দিশা। ডানদিক বাঁদিক আবার একটি দিশা। এইভাবে আকাশের তিনটি পরিচিত দিশা।

হঠাৎ পদচারণা বন্ধ করে গ্রীণ সাহেব আপনার দিকে তাকিয়ে বললেন, "বাঙালীবাবু এবার চিন্তা করুন দড়িটির ওপর একটি ক্ষুদ্র পিপিলিকার বিচরণ। সামান্য চিন্তা করলেই বুঝতে পারবেন পিপিলিকাটির বিচরণের জন্য দড়িটির মধ্যে অপর একটি দিক বর্তমান। দড়াবাজিকরের অনুরূপে পিপিলিকাটি দড়িটির দৈর্ঘ বরাবর চলাচলে সক্ষম। এবার চিন্তা করুন..."মন দিয়ে শুনুন আমি যেটা বলতে যাচ্ছি" পিপিলিকাটির পক্ষে দড়িটিকে বৃত্তাকারেও পরিভ্রমণ করা সম্ভব। বলা যায়
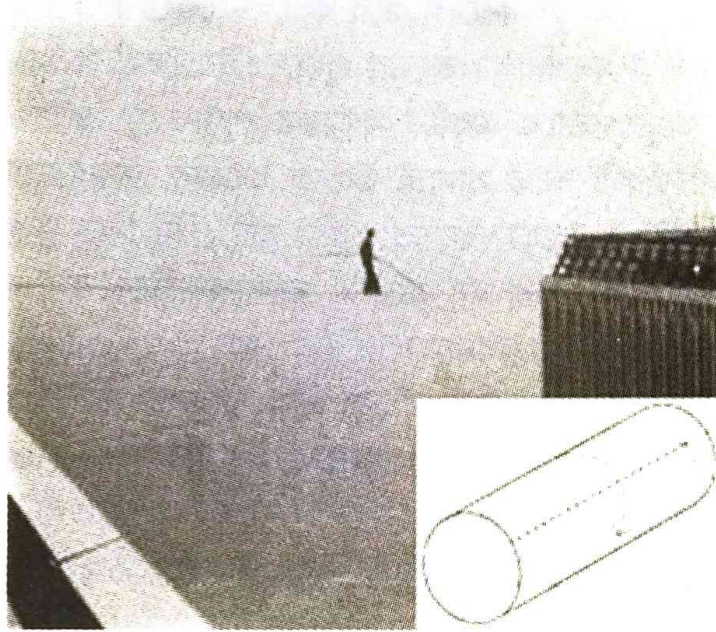
দড়াবাজীকরের বিচরন সম্ভব একটি মাত্র দিশায় সামনে, পেছনে। একটি পিপিলিকার বিচরন সম্ভব ২টি দিশায় সামনে পেছনে এবং দড়িটির পরিধি বরাবর।

দড়ির ওপর চলাফেরার জন্য তুলনামূলকভাবে বৃহৎ আকারের দড়াবাজিকরের কাছে একটি মাত্র দিশা বর্তমান। দড়িটির দৈর্ঘ্য বরাবর। অতএব দড়িবাজিকরের পরিপ্রেক্ষিতে দড়িটির দিশা এক। কিন্তু পিপিলিকার পরিপ্রেক্ষিতে দড়ির মধ্যে পরিভ্রমণের দিশা দুই। দড়িটির দৈর্ঘ বরাবর এবং বৃত্তাকারে দড়িটির পরিধি বরাবর।

বাঙালিবাবু এখন যদি আমি বলি "দুর হতে নিরিক্ষণ যেখানে একটি দিশা বর্তমান বলে মনে হয়, প্রকৃতপক্ষে সেই স্থানে দুটি দিশা বর্তমান" তা হলে আপনি কি বলবেন আমি ভুল বলছি?

আপনার জবাবের অপেক্ষা না করে গ্রীণ সাহেব তাঁর বক্তব্য চালু রাখলেন। বললেন "সুইডিস বিজ্ঞানী অস্কার ক্লেন তাঁর থিয়োরীতে গাণিতিকভাবে প্রমাণ করলেন এই চতুর্থ আকাশের দিশাটির উপস্থিতি। তিনি যুক্তি রাখলেন সময় এবং আকাশের তৈরী বিশ্বের কাঠামোটির অভ্যন্তরে অবস্থিত কোন বস্তুর (দড়ির) মধ্যে একটি অতিরিক্ত ক্ষুদ্র দিশার অবস্থান সম্ভব এই বক্তব্যও নিশ্চয় যুক্তিসংগত। বিশ্বের তিনটি দিশার অভ্যন্তরে অপর একটি অত্যন্ত ক্ষুদ্র কুঞ্চিত দিশার অবস্থান। এই দিশাটি একটি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ দিশা। এবং নিরপেক্ষতার কারণেই এটি একটি

অতিরিক্ত দিশা। এই দিশাটির আয়তন প্রায় প্লাঙ্ক আয়তনের সমান (Plank length) অর্থাৎ এর দৈর্ঘ ১.৬ × ১০$^{-৩৩}$ সে. মি.)। এত ক্ষুদ্রাকৃতি দিশাটি কোন যন্ত্রের সাহায্যেই পরিলক্ষিত করা সম্ভব নয়। মনে হয় না অদূর ভবিষ্যতেও সম্ভব হবে।

বিশ্বের তিনটি পরিচিত দিশার অভ্যন্তরে অবস্থিত রজ্জুটির পরিধি বরাবর কুঞ্চিত দিশাটি বর্তমান। এই দিশায় অক্লেশে একটি ক্ষুদ্র পিপিলিকা বিচরণে সক্ষম।

অনুরূপভাবে একটি প্লাঙ্কের আয়তনের ক্ষুদ্র পিপিলিকাটির নিকট পরিচিত তিনটি আকাশের দিশার অতিরিক্ত অপর একটি ক্ষুদ্র, কুঞ্চিত, নিরপেক্ষ দিশা উন্মুক্ত। সময়ের দিশাটি সহকারে সর্বসমেত বিশ্বের কাঠামোটিতে ৫টি দিশার অবস্থান।

এই পাঁচটি দিশার ব্যাপারটিই বলা হয় কলুজা এবং ক্লেন থিয়োরী।

কলুজা এবং ক্লেন তত্ত্বীয়ভাবে প্রমাণ করেন আকাশ এবং সময়ের সমন্বয়ে তৈরি বিশ্বের কাঠামোটির প্রতি অংশে একটি অত্যন্ত ক্ষুদ্র, কুঞ্চিত এবং নিরপেক্ষ অপর একটি দিশার অবস্থান সম্ভব।

গ্রীণ সাহেব অল্পক্ষণের জন্য তাঁর পদচালনা থামিয়ে আপনার দিকে তাকিয়ে বললেন "বাঙালিবাবু কলুজা, ক্লেনের থিয়োরীর মতানুসারে আকাশের প্রতিটি অংশে অবশিষ্ট একটি "একদিশার" কুঞ্চিত দিশার পরিবর্তে আপনি কি আকাশের প্রতিটি অংশে একটি গোলাকার দিশার অবস্থান চিন্তা করতে পারেন?" চিন্তা করে দেখুন এই প্রকারের বিশ্বে প্লাঙ্ক সাইজের পিপিলিকাটির বিচরণের জন্য তিনটি অতিরিক্ত দিশা বর্তমান। তিনটি অতিরিক্ত আকাশের দিশা।

ধরুন ঐ প্লাঙ্ক সাইজের পিপিলিকাটি প্লাঙ্ক সাইজের গোলকটিকে ছিদ্র করে গোলকটির অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে সক্ষম।

এই অবস্থায় প্লাঙ্ক সাইজের পিপিলিকাটির অবস্থান নির্ণয় করার জন্য সর্বসমেত ৬টি আকাশের দিশার পরিমাপ জানার প্রয়োজন। তিনটি পরিচিত দিশা যা গোলকটির অবস্থান নির্ণয় করে। এর উপরান্তে গোলকটির অক্ষাংশ (Latitude), দ্রাঘিমা (Longitude), এবং গোলকটিতে প্লাঙ্ক সাইজের পিপিলিকাটির ছিদ্র করার দৈর্ঘ। এই অতিরিক্ত তিনটি দিশার পরিমাপ জানা প্রয়োজন। এবং কখন কোথায়? জানার জন সময়ের ব্যাপারটিও জানা প্রয়োজন। এইভাবে আমরা সর্বসমেত ৭টি নিরপেক্ষ দিশা সম্বন্ধে চিন্তা করতে সক্ষম। তিনটি পরিচিত আকাশের দিশা। তিনটি প্লাঙ্ক সাইজের আকাশের দিশা এবং একটি সময়ের দিশা।

গ্রীণ সাহেবের কথা বলার জাদুতে পদচালনায় কখন যে আপনারা নিউইয়র্কের বিখ্যাত সেন্ট্রাল পার্কের গ্রেট লনের কাছে চলে এসেছেন খেয়াল করেননি। ৮৪৩ একরের বিশাল এই পার্কের প্রায় ২৫০ একর জুড়ে সবুজ ঘাসের বিস্তীর্ণ কার্পেট বেছান বিশাল প্রান্তর। প্রান্তরের সীমানায় অজস্র গাছের কৃত্রিম জঙ্গল। সবুজের

সমারোহের পশ্চাতপটে ম্যানহাটনের অভিনব স্কাইলাইন। পিকচার পোষ্টকার্ডের জীবন্ত ছবি।

নেচারালিস্ট পাথওয়ে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে গ্রীণ সাহেব তাঁর বর্ণনা জারি রাখেন। বললেন "দেখুন বাঙালিবাবু সুপার স্ট্রিং থিয়োরী অর্থবাহী হওয়ার জন্য পরিচিত তিনটি নয়, এমনকি কলুজা ক্লেনের ৬টি আকাশের দিশাও পর্যাপ্ত নয়। প্রয়োজন ৯টি নিরপেক্ষ আকাশের দিশা। অর্থাৎ সময়ের একটি দিশা সমেত প্রয়োজন সর্বসমেত দশটি নিরপেক্ষ দিশা।"

গ্রীণ সাহেব বললেন দেখুন বিশ্বের সময় এবং আকাশ দিয়ে তৈরি মঞ্চে অতিরিক্ত দিশার অন্যেষণে আমরা কেবল মাত্র সহজ সরল সম্ভাব্য আকারগুলি চিন্তা করেছি। অধিকন্তু স্ট্রিং থিয়োরির সমীকরণগুলির অনুসারে স্ট্রিং সকল দিশার আরো জটিল এবং ভিন্ন ভিন্ন আকারে স্পন্দিত হয়।

দুই বিখ্যাত গণীতজ্ঞ ইউজেনিও কোলাউবি (Euginio Calabi) এবং সিং টাং ইয়াও (Shing Tung Yao) স্ট্রিং থিয়োরী জন্মের পূর্বেই সম্পূর্ণ গণিতিক কৌতূহলে আবিষ্কার করেছিলেন পরিচিত তিনটি আকাশের দিশার উপরন্তু অধিক দিশার অবস্থান কিভাবে সম্ভব।

গ্রীণ সাহেব তাঁর পকেট থেকে একটি কাগজ আপনাকে দিলেন। বললেন "কাগজে যে ছবিটি দেখছেন এইটিই সিং টাং ইয়াও এবং ইউজেনিও কোলাউবির আবিষ্কৃত সম্ভাব্য ৬টি অতিরিক্ত আকাশের দিশার একটি ছবি। অত্যন্ত ক্ষুদ্র এই মড়েল। এই মড়েলটিতে কেলাউবি এবং ইয়াও প্রমাণ করেন এই প্রকার আকারে ৬টি অতিরিক্ত আকাশের দিশার অবস্থান সম্ভব। এই আকারটিকে বলা হয় কলাউবি ইয়াও সেইপ (Calabu Yao Shape)।

দুই দিশার ছবিতে একটি ৬ দিশার আকাশ স্পষ্টভাবে পরিস্ফুটিত করা কঠিন। যদিও ছবিটির সাহায্যে হয়ত একটি ধারণাকরা সম্ভব।

গ্রীণ সাহেব বললেন বাঙালিবাবু এবার চিন্তা করুন বিশ্বের আকাশ এবং সময়ের কাঠামোটিতে প্রতিটি অংশে কোলাউবি এবং ইয়াও সেপের অত্যন্ত ক্ষুদ্র ৬টি নিরপেক্ষ আকাশের দিশার অবস্থান। এই অবস্থায় তিনটি পরিচিত আকাশের দিশা, ৬টি কোলাউবি ইয়াও আকারের ক্ষুদ্র আকাশের দিশা এবং একটি সময়ে দিশার সমস্যায় সর্বমোট দশ দিশার বিশ্ব চিন্তা করা সম্ভব।

স্ট্রিং থিয়োরীর মতানুসারে বিশ্বের সমস্ত পদার্থকণার (Matter particles) এবং বল কণার (Force or Messengar particles) উৎপত্তির মূলে সুতোর শক্তির স্পন্দন। সুতোর (String) স্পন্দনের বিভিন্ন আকার বিভিন্ন কণা উৎপন্ন করে।

আইনস্টাইনের জগৎ প্রসিদ্ধ সমীকরণ $E = mc^2$ (শক্তির এবং পদার্থের রূপান্তর সম্ভব) অনুশারে, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সুতোর আকারের একটি শক্তির বলয়
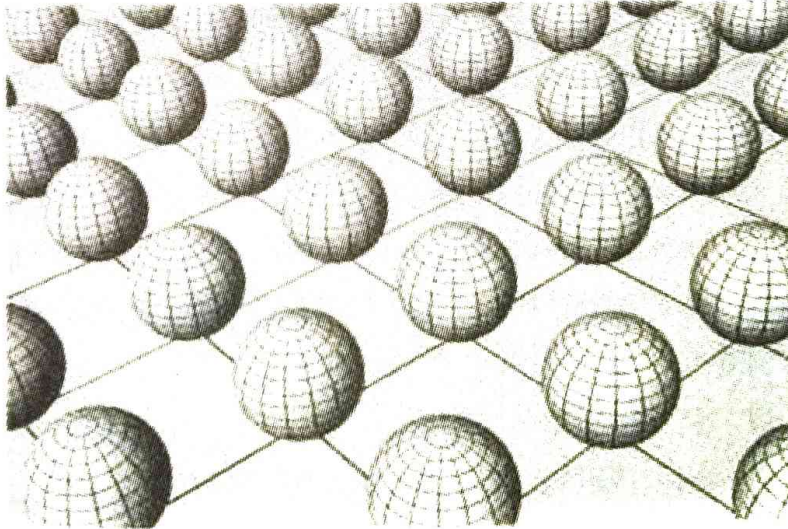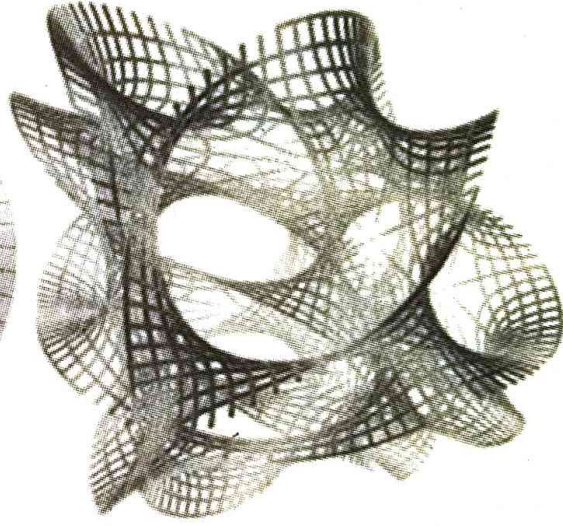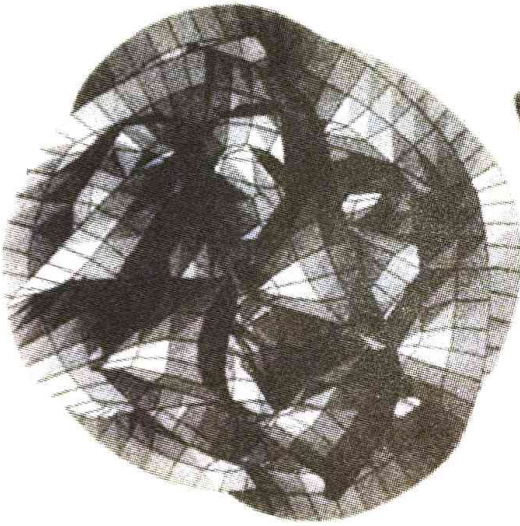
ইউজিনিও কলাউবি এবং সিং টাং ইয়াও আবিষ্কার করেছিলেন আকাশে অতিরিক্ত ছয়টি নিরপেক্ষ দিশার মডেল। আকাশের সর্বত্র অতিক্ষুদ্র এই প্রকার দিশার অবস্থানে প্রমাণ করার সম্ভব বিশ্বের আকাশ এবং সময়ের কাঠামোটিতে সর্বসমেত দশটি নিরপেক্ষ দিশার অবস্থান সম্ভব। (কলাউবি ইয়াও সেইপ)

একটি গোলকের দিশা তিন। অক্ষাংশ, দ্রাঘিমা এবং অভ্যন্তরের বিন্দু দৈর্ঘ্য। বিশ্বের সর্বত্র ক্ষুদ্র গোলকের অবস্থানে সর্বসমেত ৭টি দিশার (৩ পরিচিত দিশা, ৩টি গোলকের দিশা, একটি সময়ের দিশা) বিশ্ব চিন্তা করা সম্ভব।

স্পন্দনের কারণে রূপান্তরিত হয় পদার্থের কণায় অথবা বলের কণায়। এই সকল কণারই বিশ্বের যাবতীয় জিনিসের কাঁচা মাল। সমস্ত কিছুই গঠিত হয় এই প্রকার কণার সমন্বয়ে। অতএব এই বক্তব্য রাখা নিশ্চই সম্ভব যে, বিশ্বের যাবতীয় দ্রব্যের অথবা বলের তথা শক্তির অবস্থানের, উৎসের এবং উৎপত্তির মূলে সুতোর আকারের একটি অতি, অতি ক্ষুদ্র শক্তির বলয়ের স্পন্দন।

কোয়ান্টাম থিয়োরীর মতানুসারে আনবিক স্তরে বিশ্বের কাঠামোটি কঠোর ভাবে অস্থির। অসমতল। এই অস্থিরতা বিশৃঙ্খল অস্থিরতা। ফুটন্ত জলের পৃষ্ঠদেশের অবস্থার সঙ্গে তুলনীয়।

জেনারেল থিয়োরী অফ রিলেটিভিটির মতানুসারে আকাশ এবং সময়ের তৈরী বিশ্বের কাঠামোটি গুরুভর বিশিষ্ট পদার্থের অবস্থানের স্থানটি পদার্থের ভরের অনুপাতে দোমড়ান। বিশ্বটি সর্বস্তরে এবং সর্বক্ষণে সম্প্রসারিত। এই মহাবিশ্বের মহাকাশে কোন একটি সম্পূর্ণ স্থির মহাকালীয় বস্তুর উপস্থিতি অদ্যপি অনাবিষ্কৃত।

জেনারেল থিয়োরী অফ রিলেটিলিভিটিতে বিশৃঙ্খল অস্থিরতার স্থান নেই। অস্থিরতা নিশ্চই বর্তমান। বিশ্বের সম্প্রসারণ, নক্ষত্র, নক্ষত্রমণ্ডলী, গ্রহ, উপগ্রহ ইত্যাসি যাবতীয় মহাকালিয় বস্তুর আবর্তন, পরিভ্রমণ সবই অস্থিরতার লক্ষণ। যদিও এই অস্থিরতা বিশৃঙ্খল অস্থিরতা নয়। লম্ফ, ঝম্পের অস্থিরতা নয়।

কোয়ান্টাম বিশ্ব বিশৃঙ্খল ভাবে অস্থির। কোয়ান্টাম বিশ্বের হাজার হাজার কটিগুন ক্ষুদ্র "স্ট্রিং বিশ্বে" পুনরায় বিশৃঙ্খল অস্থিরতার অনুপস্থিতি।

বহ্মাণ্ডের তাবৎ বল, তাবৎ শক্তি, তাবৎ পদার্থ সবেরই মূলে সুতোর স্পন্দন।

গ্রীণ সাহেব তাঁর পদচালনা বন্ধ করে আপনার দিকে ফিরে বল্লেন "বাঙ্গালীবাবু, স্ট্রিং থিয়োরীর বৈধতা বিজ্ঞান সমাজে স্বীকৃতি লাভ করা সম্ভব হলে, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবেও পরীক্ষিত ভাবে প্রমাণ করা সম্ভব হলে মনুষ্য সমাজের জ্ঞানের ভান্ডারে যে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।" জেনারেল থিয়োরী অফ রিলেটিভিটি এবং কোয়ান্টাম মেনানিকস্ থিয়োরী সংযুক্তিকরণ করা সম্ভব হবে। সম্ভব হবে চারটি মৌলিক বলের একত্রিকরণ। থিয়োরী অফ এভরিথিং এর স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে।

বাঙ্গালীবাবু এই হল স্ট্রিং থিয়োরীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ। এই থিয়োরীর একটি পরবর্ত্তী অধ্যায় বর্তমান। নামকরা হয়েছে M থিয়োরী।

আপনারা হাঁটতে হাঁটতে সেন্ট্রাল পার্কের সাউথ গেটের কাছে এসে পড়েছেন। ক্লান্ত রবিমামা ইতিমধ্যে নিউ ইয়র্কের স্কাই লাইনের অন্তরালে সেই দিনের মত শুভরাত্রি জানিয়ে বিদায় নিয়েছে। রবিমামাকে টেক্কা দেওয়ার জন্য যেন আলোর রোসনায়ে গরবিনী রূপসি নিউইয়র্ক নিজেকে সজ্জিত করেছে আপাদমস্তক।

গ্রীন সাহেব বল্লেন "চলুন টাইম স্কোয়ারের দিকে যাক। চারদিক খেয়াল করে হাঁটবেন। দেখবেন কি বিচিত্র এই শহর।

আপনারা নিউ ইয়র্কের সেভেন্ত (7th) এভিনিউ ধরে টাইম স্কোয়ারের দিকে হাঁটতে আরম্ভ করলেন।

ব্রেন বিশ্ব

টাইম স্কোয়ারের পথে হাঁটতে হাঁটতে মিঃ ব্রায়েন গ্রীন তাঁর বক্তব্য জারী রাখলেন। বল্লেন "বিগত তিন দশকে একটি নয় পাঁচ পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন স্ট্রিং থিয়োরী আবিষ্কৃত হয়েছে। স্ট্রিং থিয়োরীর গবেষকেরা বোসন কণাদের সংশ্লিষ্ট তিনটি থিয়োরী আবিষ্কার করেছেন। অপর দুটি থিয়োরীকে বলা হয় হেটেরোটিক (Heterotic) স্ট্রিং থিয়োরী। কোন কোনটি বদ্ধ স্ট্রিং বা মুক্ত স্ট্রিং সম্পর্কিত আবার কোনটি বা যুক্ত স্ট্রিং সম্পর্কিত। এই ভিন্ন ভিন্ন ৫ প্রকারের স্ট্রিং থিয়োরী, স্ট্রিং থিয়োরীর বৈধতা সম্বন্ধে স্বাভাবিক ভাবেই সন্দেহের উদ্রেক করে।

১৯৯৫ সালে বিজ্ঞানী এডওয়ার্ড উইটেন (EDWARD WZITTEN) প্রথম ৫টি ভিন্ন স্ট্রিং থিয়োরীর মধ্যে সম্পর্ক আবিষ্কার করেন। তিনিই প্রমাণ করেন পাঁচটি ভিন্ন স্ট্রিং থিয়োরীর সবগুলিরই মূল বক্তব্য এক। স্ট্রিংদের ভিন্ন আকারে স্পন্দনের কারণেই বল কণা (Force particles), এবং পদার্থ কণাদের (Matter particles) এর উৎপত্তির কারণ। বিজ্ঞানী উইটেনের এই আবিষ্কারের পেছনে অন্যান্য আরো কিছু স্ট্রিং বিশারদের অবদান ছিল। উল্লেখযোগ্য আমাদের বাঙ্গালী বিজ্ঞানী অশোক সেনের নাম।

উইটেন প্রমাণ করেন ৫টি ভিন্ন স্ট্রিং থিয়োরী আসলে একই থিয়োরীর ভিন্ন রূপ। এই প্রমাণের জন্যে উইটেন ৯টি আকাশের দিশা ছাড়াও অতিরিক্ত আরো একটি অর্থাৎ সর্ব্বসমেত দশটি আকাশের দিশা গণ্য করেছিলেন।

গ্রীণ সাহেব আপনার দিকে ফিরে বল্লেন দেখুন বাঙ্গালীবাবু স্ট্রিং থিয়োরীতে, বলা উচিৎ সুপার স্ট্রিং থিয়োরী অনুযায়ী ১০টি আকাশের দিশার উপস্থিতি গণ্য করা হয়। এই ১০টির মধ্যে ৭টি আকাশের দিশা আয়তনে অত্যন্ত ক্ষুদ্রভাবে গণ্য করা হয়। এই ক্ষুদ্রতার কারণেই এই দিশাগুলি পরিলক্ষিত নয়। কোন যন্ত্রের সাহায্যেও পরিলক্ষিত নয়। অথচ আমরা জানি বিশ্বের উৎপত্তির ক্ষণে বা বিগ বাঙের সময় বিশ্বের আয়তনও ছিল ক্ষুদ্রতার ক্ষুদ্রতম সীমায়। বলা যায় আয়তনের পরিমাপ ছিল প্লাঙ্ক স্কেলের পরিমাপে। এই অবস্থায় বলা যায় নাকি যে আকাশের দশটি দিশার সবগুলির আয়তন ছিল সুদ্রতার ক্ষুদ্রতম সীমায়। নিশ্চয়ই বলা যায়।

আমরা এত জানি অতঃপর ইনফ্লেশনের (ইনফ্লেশনের বিস্তারিত বিবরণ দশম অধ্যায়) দৌরাত্ম্যে অকস্মাৎ বিশ্বের ১০টি আকাশের দিশার মধ্যে মাত্র ৩টি দিশার ঘটেছিল অভাবনীয় বিস্তার।

কি কারণে প্রকৃতির এই বৈষম্য তা আজও আমাদের অজ্ঞাত। পরিচিত তিনটি

আকাশের দিশায় কি সেই বিশেষ বৈশিষ্ট্য বর্তমান যার কারণে বিশ্বের বিস্তার কালে কেবল মাত্র তিনিটি দিশায় নির্বাচিত হয়েছিল? এই প্রশ্নের জবাবের জন্যে আমরা অপেক্ষারত।

এওয়ার্ড উইটন তাঁর আবিষ্কৃত থিয়োরীটির নামকরণ করেন "M THEORY"। এম অর্থে Membrane? হয়ত। থিয়োরীটির নামকরণের সময় কারণটি বিশ্লেষিত হয় নি। আমরা ধরে নিতে পারি M অর্থে Membrame, ঝিল্লি। কেন ঝিল্লী?

চলুন বাঙ্গালী বাবু এই ব্যাপার কিছু বক্তব্য রাখা যাক।

গ্রীণ সাহেব বল্লেন দেখুন "এম" থিয়োরীর পরিকাঠামোটিতে এক দিশার স্ট্রিং ছাড়াও দুই বা আরো অধিক দিশার পর্দ্দার ন্যায় ঝিল্লীর অবস্থানও সম্ভব। এই ঝিল্লীকেই বলা হয় Membrane।

এক অথবা অধিক দিশা বিশিষ্ট ব্রেনের উপস্থিতি সম্ভব। বলা যায় 'P' পি দিশা বিশিষ্ট পি ব্রেনের উপস্থিতি সম্ভব। কেবল P-এর সীমানা ১ থেকে ১০। ১০ অথবা ১০ এর ক্ষুদ্র কোন সংখ্যা।

এই ব্যাপারটিকে এইভাবেও উপস্থাপিত করা যায়। এক দিশার ব্রেনের পরিচয় একটি স্ট্রিং। ২ দিশার ব্রেনের পরিচয় একটি পর্দ্দার অথবা বলা উচিৎ একটি দুই দিশার ঝিল্লী। অনুরূপে তিন ব্রেন অর্থে তিন দিশা বিশিষ্ট একটি ঝিল্লী। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এর পর গ্রীণ স্যার বল্লেন দেখুন বাবু যে কোন স্ট্রিং এর দৈর্ঘ্য নির্ভর করে তার শক্তির ওপর। বল্লেন "আমার বলা উচিত একটি স্ট্রিং-এর দৈর্ঘ্যের পরিমাপ নির্ভর করে স্ট্রিংটির মধ্যে অন্তর্নিহিত শক্তির ওপর। হীনবল স্ট্রিং, ক্ষুদ্র স্ট্রিং, শক্তিমান স্ট্রিং বিস্তীর্ণ স্ট্রিং।

স্ট্রিং থিয়োরীর উৎপত্তির সময় গণনায় প্রমাণিত হয় স্ট্রিং-এর দৈর্ঘ্য অত্যন্ত ক্ষুদ্র। প্লাঙ্ক দৈর্ঘ্যের সমান। ১০$^{-৩৩}$ সে.মি। মাধ্যাকর্ষণ বলের বাহনকরা গ্রাভিটনের গঠনে গণনায় প্রমাণিত যে অতি স্বল্প দৈঘ্যের স্ট্রিংই এই শর্ত পুরণ করে।

গ্রীণ সাহেব বল্লেন "দেখুন গণনায় আবার স্ট্রিং দৈর্ঘ্য সংক্রান্ত অপর একটি মূল্যবান তথ্যও প্রমাণিত হয়। প্রমাণিত হয় যে কোন একটি স্ট্রি-এর মধ্যে ক্রমন্যয়ে অধিক শক্তি সঞ্চারিত করার ফলে প্রথমে স্ট্রিটের স্পন্দনের মাত্রা বর্দ্ধিত হয়। আরো অধিক শক্তি সঞ্চারিতের ফলে স্ট্রিং এর দৈর্ঘ্য বিস্তারিত হয়। ঠিক তায় স্ট্রিং এর দৈর্ঘ্য বেড়ে যায়।

আধুনিক প্রযুক্তির দ্বারা আমরা স্ট্রিং এর মধ্যে এই পরিমাণ শক্তি সঞ্চারে অক্ষম।

কিন্তু বাঙ্গালীবাবু চিন্তা করুন বিশ্বের জন্মক্ষণে অসীম শক্তির বিন্দুতে একত্রিকরণের কারণে স্ট্রিংদের অভ্যন্তর এইরূপ শক্তি সঞ্চারিত হওয়া অসম্ভব ছিল না। এর ফল স্বরূপ স্ট্রি-এর দৈর্ঘ্যের প্রসার অসীমত্বে পৌছনও সম্ভব ছিল। সৃষ্টি হয়েছিল অসীম দৈর্ঘ্যের স্ট্রিদের। আমরা হয়ত অনুমান করতে পারি এই প্রকার

অসীম দৈর্ঘ্যের একদিশার স্ট্রিং সকল দ্বারা বিশ্বের আকাশ আজও পরিবেষ্টিত? অতএব কে বলতে পারে ভবিষ্যতে হয়ত বা আকাশ চর্চার মাধ্যমেই প্রমাণিত হবে স্ট্রিং এদের অস্তিত্ব।

অতঃপর বেশ কিছুক্ষণ নিঃস্তব্দে পথচলার পর গ্রীণ সাহেব পুনরায় তাঁর বক্তব্য আরম্ভ করলেন। বল্লেন ‘‘দেখুন একাধিক দিশা বিশিষ্ট ‘‘পি” ব্রেনের আকারের ক্ষুদ্রতার কোন সুনিদিষ্ট লক্ষণ রেখার বাধ্যকতা নেই। অর্থাৎ এই সব ব্রেনের আকারে অসীমত্বতা থাকা সম্ভব। দুই দিশার T V পর্দার ন্যায় দৈর্ঘ্যে প্রস্থে অসীম দুই দিশার ব্রেন চিন্তা করা সম্ভব। হয়ত বা এইরূপ অসীম আকারের তিন দিশা অথবা আরো অধিক দিশা বিশিষ্ট ব্রেনের অভ্যন্তরেই আমাদের পরিচিত বিশ্বের অবস্থান। হয়ত বা আমাদের বিশ্বটিই একটি ব্রেন বিশ্ব।

দেখুন বাবুজি—আমার এই বক্তব্যগুলি অত্যন্ত বেশি রকম কল্পনা প্রসুত। যদিও গণনার ভিত্তিতে বলা যায় এইরূপ বিশ্বের অবস্থান সম্ভব।

এবার গ্রীণ সাহেব আপনার দিকে তাকিয়ে আপনাকে জিজ্ঞেস করলেন ‘‘বাবুজি আপনার কি মনে আছে আমি বলেছিলাম স্ট্রিং দুইপ্রকার?”

আপনার উত্তর ‘‘ইয়েস স্যার, যুক্ত স্ট্রিং এবং মুক্ত স্ট্রি। প্রথমটির দুটি প্রান্ত উন্মুক্ত অপরটির দুটি প্রান্ত বরার ব্যান্ডের ন্যায় যুক্ত। ঠিক বলেছি তো স্যার?

একশতে একশো। শুনুন ‘‘গণনায় দেখা গেছে মাধ্যাকর্ষণ বলের বাহন কণা গ্রাভিটনের উৎপত্তি হয় যুক্ত স্ট্রিং-এর বিশেষ আকারে স্পন্দনের ফলে। মনে রাখবেন যুক্ত স্ট্রিং-এর অর্থাৎ যে স্ট্রিং-এর প্রান্তর দুটি যুক্ত সেই স্ট্রিং-এর বিশেষ আকারের স্পন্দন গ্রাভিটন কণা গঠন করে।”

১৯৯৫ সালে উইটন তাঁর বিখ্যাত M/এম থিয়োরী প্রকাশ করার পর ক্যালিফোরনিয়া ইউনিভারসিটির বিজ্ঞানী পোলচিনস্কি প্রমাণ করেন মুক্ত স্ট্রিংদের দুটি মুক্ত মুখই ব্রেনের পৃষ্ঠদেশের সঙ্গে যুক্ত। মুক্ত স্ট্রিংগুলির গতিবিধি যুক্ত স্ট্রিংগুলির গতিবিধি একটি দিশা অথবা দুটি দিশা অথবা পি সংখ্যক দিশার ব্রেনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। নির্ভর করে মুক্তমুখী স্ট্রিংগুলি ১টি দিশা, ২টি দিশা, পি সংখ্যক দিশার ব্রেনের সঙ্গে সংযুক্ত এর ওপর।

গ্রীণ সাহেব পকেট থেকে একটি কাগজ বের করে আপনাকে দিলেন। বললেন কাগজটিতে কেবল দুই দিশার ব্রেনই দেখান আছে। তিন বা তিনের অধিক দিশার ‘‘পি” দিশার ক্ষেত্রেও অনুরূপভাবে মুক্তমুখী স্ট্রিংদের মুক্তমুখগুলির সংযুক্তিকরণ হয়। এইভাবে মুক্তমুখী স্ট্রিংদের গতিবিধি ‘‘পি” ব্রেনদ্বারা অধিকৃত স্থানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

দেখুন M থিয়োরী আবিষ্কারের পূর্বে সুপার স্ট্রিং থিয়োরীতে তত্ত্বীয়ভাবে প্রমাণ করা হয়েছিল ৯টি আকাশের দিশার মধ্যে ৬টি আকাশের দিশা আয়তনে অত্যন্ত ক্ষুদ্র। এই কারণেই এই দিশাগুলি আমাদের নিকট অদৃশ্য।

এম থিয়োরীর মতানুসারে ব্রেনের আয়তনের সীমাবদ্ধতা অনুপস্থিত। অর্থাৎ অসীম আয়তনের ব্রেনের উপস্থিতিও সম্ভব।

মিঃ ব্রায়েন গ্রীণ এবার আপনাকে জিজ্ঞেস করলেন "বাঙালিবাবু খেয়াল আছে কি? আমি বক্তব্য রেখেছিলাম আমাদের বিশ্বটি হয়ত ব্রেন বিশ্ব? এই বক্তব্য যদি সত্য হয় তবে বলতে পারেন কি এই অবস্থাতে ব্রেনদেরও কেন আমরা দেখতে পাই না? স্ট্রিংদের মত ব্রেনরা ক্ষুদ্র নাও হতে পারে।
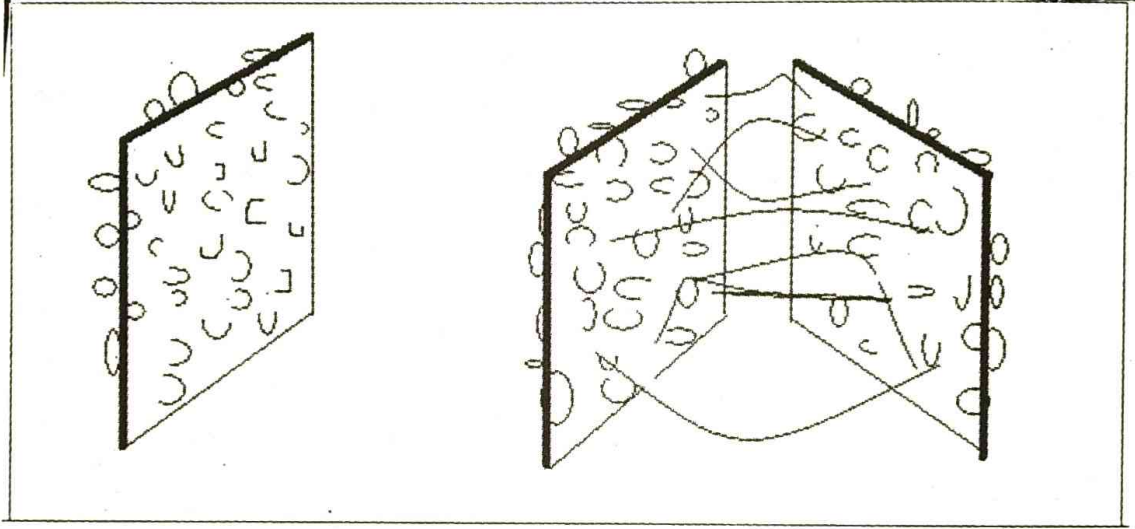
মুক্তমুখী স্ট্রিংদের গতিবিধি একটি দুই দিশার ব্রেনের (যার সঙ্গে স্ট্রিংগুলির মুক্ত মুখ সংযুক্ত)-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। অনুরূপভাবে মুক্তমুখী স্ট্রিংদের মুক্তমুখ দুটি দুইদিশার দুটি ব্রেন এবং পৃথকভাবে দুটি ব্রেনের পৃষ্ঠ দেশের সঙ্গে সংযুক্ত।

আপনার বিনিত উত্তর "স্যার এই বিষয়ে আপনি পন্ডিত। তায় আপনার উত্তরের অপেক্ষায় আছি আমি।

গ্রীন সাহেব বললেন ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভের অত্যন্ত ক্ষুদ্র অংশ আমরা মানুষেরা দেখতে পায়। ধরুন অনুমান করা হল ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রামের যেটুকু অংশ আমরা দেখতে পায় সেইটুকু অংশে ব্রেনেরা স্বচ্ছ। কিন্তু গামা-রে, এক্স-রে, আলট্রাভাইলেট-রে, ইনফ্রারে, মাইক্রোওয়েভ, রেডিও ওয়েভ অর্থাৎ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভের সম্পূর্ণর নিকটই কি ব্রেনেরা স্বচ্ছ?

দেখুন জবাব YES। ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভের কাছে ব্রেনেরা স্বচ্ছ। গামারে, এক্সরে, আলট্রাভাইলেট রে, মানুষের দেখতে পাওয়া রে, ইনফ্রা-রে, মাইক্রো ওয়েভ, রেডিও ওয়েভ এই সবের কাছেই ব্রেনেরা স্বচ্ছ।

দেখুন গণনায় দেখা গেছে ইলেকেট্রোম্যাগনেটিক ফোরসের বাহন কণার উৎপত্তি হয় স্ট্রিং একটি বিশেষ আকারে স্পন্দনের কারণে। আমরা জানি মুক্তপ্রান্ত স্ট্রিং সব, দুই দিশা, তিন দিশা অথবা "পি" দিশার ব্রেনেনের পৃষ্ঠদেশের সঙ্গে যুক্ত।

এবার চিন্তা করে দেখুন বাবুজি মুক্তপ্রান্ত স্টিরং-এর মুক্ত প্রান্তগুলি যদিও

আমাদের পরিচিত তিনটি দিশার বিশ্বের তিন দিশা ব্রেনগুলির পৃষ্ঠদেশের সঙ্গে সংযুক্ত। কিন্তু এই তিনদিশার ব্রেনের পৃষ্ঠদেশের সমস্ত জায়গাতে এদের গতি অপ্রতিরুদ্ধ। Within the three brans open strings are free to move anywhere। আর আপনিতো জানেন ফোটন কণার গতি যখন কোন পদার্থের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখের রেটিনাতে আঘাত করে তখনই আমরা পদার্থটিকে দেখতে পায়।

এই ব্যাপারটি চিন্তা করার বিষয়। আমরা, আমাদের বিশ্বটি, আমাদের বিশ্বের তিনটি দিশা অথবা বলা যায় বিশ্বের তিনটি ব্রেনের অভ্যন্তরে আবদ্ধ। এবং এই তিনটি ব্রেনের অভ্যন্তরে ফোটনকণাগুলির গতি অবাধ। ফোটনকণাগুলি বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার পর আমাদের চোখের রেটিনাতে আঘাত করে না। ফলস্বরূপ ব্রেনদের আমরা দেখতে পাই না। আমাদের চোখে এবং সমস্ত ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভের স্পেকট্রামের কাছে এই কারণেই ব্রেনেরা স্বচ্ছ।

গ্রীন সাহেব বললেন ‘‘এবার দেখুন আমাদের বিশ্বের ফোটনকণাগুলি আমাদের তিন ব্রেনের বিশ্বকে ভেদ করে তিন ব্রেনের অধিক কোন ব্রেন বিশ্বে প্রবেশ করতে অপরাগ আবা অক্ষম। এবং এই কারণেই আমরা আমাদরে তিন ব্রেন বিশিষ্ট বিশ্বের উপরান্তে অধিক ব্রেন বিশিষ্ট বিশ্বের উপস্থিতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

গ্রীন সাহেবের দিকে তাকিয়ে আপনি বললেন, ‘‘স্যার যদি কিছু না মনে করেন আমার একটা প্রশ্ন ছিল।

মেজাজে ছিলেন বোধহয় গ্রীন সাহেব। বললেন ‘‘বাঙালিবাবু মুক্তপ্রান্ত স্ট্রিংদের ব্রেনপৃষ্টে স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করার মত আপনিও স্বচ্ছন্দে আমায় প্রশ্ন করতে পারেন। সাধ্যমত জবাব দেবার চেষ্টা করব। কেবল মনে রাখবেন সুপারস্ট্রিং থিয়োরী, ব্রেন থিয়োরী এখনও পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে গণনাভিত্তিক। অনুমান, অতঃপর গণিতে দ্বারাই এদের বিকাশ। প্রত্যক্ষ এমনকি পরোক্ষভাবেও এদের অস্তিত্বের প্রমাণ করতে আজও আমরা অক্ষম।

Super string theory and ‘M’ theory, both of them are still on the making. এই দুটি থিয়োরীর শেষ শব্দ লেখা এখনও শেষ হয় নি। এই জন্যই বললাম ‘‘আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করব আপনার প্রশ্নের জবাব দেবার।

আপনার জবাব ‘‘না, না স্যার। আমার প্রশ্ন তেমন কিছু কঠিন প্রশ্ন নয়। অত্যন্ত সরল প্রশ্ন আমার। হয়ত স্বভাবতভাবেই এই প্রশ্ন এসে পড়ে। আমি প্রশ্ন না করলেও হয়ত আপনি এই ব্যাপারটি বলতেন। আমার প্রশ্ন এই যে ‘‘জাগতিক ৪টি মৌলিক বলের মধ্যে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক বলের নিকট ব্রেনেরা স্বচ্ছ। অপর তিনটি মৌলিক বলের কাছেও কি এরা স্বচ্ছ?

আমার প্রশ্নে দৃশ্যত খুশি গ্রীন সাহেব জবাব দিলেন ‘‘স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোরসের বাহন কণা গ্লুয়ন এবং উইক নিউক্লিয়ার ফোরসের বাহন কণা W এবং Z কণা

সকলের কাছেও ব্রেনেরা স্বচ্ছ। স্বচ্ছতার কারণও সেই এক। গ্লুয়ন কণা, W এবং Z কণা এর সবেরই উৎস মুক্তপ্রান্ত স্ট্রিংদের বিশেষ আকারের স্পন্দন।

এইবার বাঙালিবাবু আমি যেটি বলব সেটি ভবিষ্যতে মানব জাতির কাছে হয়ত বা সর্বাধিক মহার্ঘ জ্ঞান হিসেবে পরিণত হতে পারে। দেখুন চারটি মৌলিক বলের মধ্যে তিনটি বলের বাহনকণার উৎপত্তির কারণ মুক্তপ্রান্ত স্ট্রিং-এর বিশেষ স্পন্দন। কেবল মাধ্যাকর্ষণ বলের বাহন কণা গ্রাভিটনের উৎপত্তির কারণ মুক্তপ্রান্ত নয় যুক্তপ্রান্ত স্ট্রিং-এর বিশেষ আকারে স্পন্দনের কারণে। অর্থাৎ ব্রেনের মধ্যে এর গতি অপ্রতিরুদ্ধ। গণনায় প্রমাণ করা যায় ব্রেনেদের উপস্থিতির কারণে এদের গতিবিধির সীমাবদ্ধতা অবর্তমান। অগাধ গতি এঁদের (রঙিন ছবি নং ১৩ দেখুন)।

অর্থাৎ গ্রাভিটন তথা মাধ্যাকর্ষণ বল আমাদের পরিচিত তিনদিশার বিশ্বের উপরান্তে অন্য বিশ্বে (হয়ত বা তিন দিশার অধিক দিশা বিশিষ্ট কোন বিশ্ব) গমনাগমনে সক্ষম। অতএব আমাদের বিশ্বটি যদি তিন ব্রেনের বিশ্ব হয় অর্থাৎ তিন দিশা ব্রেনের অভ্যন্তরে আবদ্ধ হয় তবে মাধ্যাকর্ষণ বলই একমাত্র মাধ্যম যার সাহায্যে সম্ভব অন্য কোন বিশ্বের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের। ভবিষ্যতে বিভিন্ন বিশ্বের উন্নত প্রাণীদের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম হবে হয়ত বা মাধ্যাকর্ষণ বল।

হাঁটতে হাঁটতে আপনারা টাইম স্কোয়ারে পৌঁছে গেছেন। মধ্যগগনের সূর্যালোকের মত আলোকিত টাইম স্কোয়ার। লোকে লোকারণ্য। কত ভিন্ন পোষাক, কত ভিন্ন ভাষা, কত ভিন্ন চেহারা। বিচিত্র আলোর কারসাজি, কত প্রমোদ গৃহ, তাদের হাতছানি। হট্টগোল, কোলাহল। বৈচিত্রের জঙ্গল।

গ্রীণ সাহেব বললেন চলুন ঐ ছোট্ট ত্রিকোণ পার্কের রেলিং-এ বসা যাক সামান্য। এই কোলাহলের মধ্যে আপনি কি আমার কথা বুঝতে পারবেন? হয়ত বা বলা উচিত উপভোগ করতে পারবেন কি?

আপনার সহাস্যে উত্তর স্যার বোঝা অথবা উপভোগ করাটা নির্ভর করে বিষয়ের এবং বক্তার ওপর শ্রোতার ভক্তির ওপর। আপনি বলুন দয়া করে। আপনার কথা আমার কাছে অমৃতবাণী।

চিন্তা করা যাক একটি, না না একটি কেন বেশ কয়েকটি ৫ দিশার বিশ্ব। ৪টি আকাশের দিশা এবং একটি সময়ের দিশা সম্মিলিত ৫ দিশার বিশ্ব। আমাদের পরিচিত ৪ দিশার বিশ্বের অভ্যন্তরে অবস্থিত।

কেম্ব্রিজ ইউনিভারসিটির বিজ্ঞানী নীল টুরক (Neil Turok), প্রিন্সটন ইউনিভারসিটির পল স্টেইনহারড (PAUL STEINHARDT) এবং আরো কয়েকজন বিজ্ঞানী তাঁদের মতবাদ রেখেছেন যে আমাদের পরিচিত ৩ ব্রেনের বিশ্বের সমান্তরালে আরো ৩ ব্রেনের বিশ্বের অবস্থান। সুপার স্ট্রিং থিয়োরীর মতানুসারে অবশিষ্ট ৬টি আকাশের দিশা কলাউবি ইয়াও-এর বিশেষ আকারে ক্ষুদ্র দিশা হিসাবে অবস্থান করে এই ৪ দিশা সম্পন্ন (আকাশের দিশা) বিশ্বের অভ্যন্তরের সর্বস্থলে।

এই দিশাগুলিতে যথারীতি স্ট্রিং-এর বিশেষ আকারের স্পন্দনের কারণে উৎপন্ন হয় বিভিন্ন পদার্থের ক্ষুদ্র কণা সকল, বিভিন্ন বলের বাহন কণা সকল।

গ্রীণ সাহেব কিছুক্ষণ কথা বলা বন্ধ রেখে ঘাড় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে টাইম স্কোয়ারের এদিক সেদিক দেখতে আরম্ভ করলেন। বললেন "এখানে একটা আমার অত্যন্ত প্রিয় একটি গ্লোবের গ্লো বিল বোর্ড ছিল। দেখছি না সেটা। সরিয়ে নিয়েছে হয়ত।

"যাই হোক যা বলছিলাম স্টেইনহারড এবং টুরক চিন্তা করেছিলেন, কেবল চিন্তা করেছিলেন বললে ভুল হবে, গণিতের সাহায্যে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন (অত্যন্ত জটিল গণিত) প্রতি এক লক্ষ কোটি বছরে (1 Trillion Years) (১-এর পর ১২টি শূন্য) আমাদের তিন ব্রেনের বিশ্বের এবং পার্শ্ববর্তী সমান্তরাল অপর একটি তিন ব্রেনের বিশ্বের সংঘর্ষ হয়। এবং এই সংঘর্ষের ফলে তীব্র উত্তাপ এবং শক্তিশালী রশ্মির বিচ্ছুরণ হয় (রঙিন ছবি নং ১৪ দেখুন)।

দুটি সমান্তরাল তিন ব্রেনের সংঘর্ষের উপরান্তে দুটি বিশ্বের অবস্থা হয় ইনফ্লেশনের পরবর্তী অবস্থার অনুরূপ। দুটি বিশ্বেই আরম্ভ হয় নতুন জীবন যাত্রা। উৎপত্তি হয় পদার্থ এবং বলের ক্ষুদ্র কণা-ফারমিয়নস এবং বোসন। ক্রমে ক্রমে উৎপত্তি হয় মহাকর্ষীয় গ্যাস নেবুলা, নক্ষত্র, নক্ষত্রমন্ডলী, গ্রহ, উপগ্রহ ইত্যাদি ইত্যাদি। চলতে থাকে বিশ্ব জীবন। জারী থাকে বিশ্বের সম্প্রসারণ। প্রথম ৭শ কোটি বছর (সংঘর্ষের পর) এই সম্প্রসারণের গতি থাকে নিম্নগামী। অতঃপর বিশ্ব সম্প্রসারণের গতি হয় উর্ধগামী (বিশদ আলোচনা ১৬৩ পৃষ্ঠায়)। তরান্বিত—সম্প্রসারণের গতি। ১ লক্ষ্য কোটি বছর পর সম্প্রসারণের গতি পৌঁছে যায় প্রায় আলোর গতির কাছাকাছি। অসীম সম্প্রসারণের কারণে পার্শ্ববর্তী নক্ষত্রমন্ডলীও চলে যায় দৃষ্টির অন্তরালে।

সম্প্রসারণের ফলস্বরূপ দূর্বল মাধ্যাকর্ষণ বল আরো দূর্বল হয়। রাজত্ব আরম্ভ হয় অন্ধকার শক্তির। ফলে পুনরায় পরস্পরের প্রতি আকর্ষিত হয় দুটি পার্শ্ববর্তী সমান্তরাল বিশ্ব। সংঘটিত হয় আবার সংঘর্ষ। আরম্ভ হয় পুনরায় এক নতুন জীবনকাল। আয়ু ১ লক্ষ্য কোটি বছর। এই পুনরাবৃত্তি চলতে থাকে অনন্তকাল।

গ্রীন সাহেব বললেন "দেখুন দুটি ব্রেনের পরস্পরের সংঘর্ষের সময় চিন্তা করুন ব্রেনেদের কোয়ান্টাম বিশ্বের কথা। দুটি ব্রেনেরই কোয়ান্টাম বিশ্ব যথারীতি তান্ডব নৃত্যে রত। এই লাফালাফির কারণে দুটি ব্রেনের মধ্যে সংঘর্ষটি সর্বক্ষেত্রে, সর্বস্তরে একই বলের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় না। এর ফলে দুটি ব্রেনেরই বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎপাদিত উত্তাপের তারতম্য ঘটে। এই তারতম্যের কারণে বিকীর্ণ রশ্মির তীব্রতায় হয় অসমতা। বিকীর্ণ রশ্মির তীব্রতার অসমতা পরিলক্ষিত হয় নাশার উইলকিনসম মাইক্রোওয়েভ এ্যানিসোট্রপি প্রোব নামে (WAMP is a NASA Explorer mission measuring rhe temperature of the cosmic background radiation over the full sky with unprecedented accuracy)।

উত্তাপের অসমতার কারণে সদ্য উৎপাদিত ক্ষুদ্র কণাদের (সমষ্টিগতভাবে) ঘনত্বেরও তারতম্য হয় ক্ষেত্র বিশেষে। অধিক ঘনত্ব বিশিষ্ট কণা সমষ্টি আকর্ষিত করে পার্শ্ববর্তী কণাদের। বৃদ্ধি হয় ঘনত্বের। উত্তাপ সঞ্চারিত হয়। আরম্ভ হয় কণাদের আণবিক প্রক্রিয়া। জন্ম নেয় এক নতুন নক্ষত্র। অতঃপর হাজার কোটি নক্ষত্র। ক্রমে ক্রমে নক্ষত্র মন্ডলী। হাজার কোটি নক্ষত্র মন্ডলী। এই হল আমাদের পরিচিত বিশ্ব জীবন।

এই বলে গ্রীণ সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, "চলুন এগুনো যাক গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল স্টেশনের দিকে।

হাঁটতে হাঁটতে বললেন, "বাঙালিবাবু এতক্ষণ আপনাকে যে কথাগুলি বললাম, স্ট্রিং থিয়োরী, সুপার স্ট্রিং থিয়োরী, এম থিয়োরী বা ব্রেন থিয়োরী, এদের সবগুলিই গণিতের সাহায্যে উদ্ভূত। কোনটিই পরীক্ষিতভাবে প্রমাণিত নয়। এই কারণে বহু বিজ্ঞানীর মতে এই থিয়োরীগুলির বিজ্ঞান হিসাবে গৃহিত হওয়া উচিত নয়। বলা উচিত এইগুলি "দর্শন" Philosophy। আমার বিশ্বাস অদূর ভবিষ্যতে প্রত্যক্ষভাবে এই থিয়োরীগুলির প্রমাণ করা সম্ভব নাও হতে পারে কিন্তু একদিন এই থিয়োরীগুলির বৈধতা পরোক্ষভাবে প্রমাণ করা সম্ভব হবে।

গ্রীন সাহেব বললেন ব্রেন থিয়োরী বিশ্ব রহস্যের অনেক কিছুর সন্তোষজনক ব্যাখ্যা করে। অন্যান্য তিনটি মৌলিক বলের তুলনায় মাধ্যাকর্ষণ বলের দুর্বলতার কারণ গ্রাভিটি একমাত্র মৌলিক বল যেটি এক বিশ্ব হতে অন্য বিশ্বে গমনাগমনে সক্ষম। অর্থাৎ এর বিস্তৃতি কোটি কোটি গুণ অধিক। বিশাল বিস্তৃতির কারণে বলটি অধিকতর তরলীকৃত। এইজন্য গ্রাভিটি দুর্বল।

আপনারা নিউইয়র্কের গ্রান্ড সেন্ট্রাল স্টেশনে পৌঁছলেন। মিঃ ব্রায়েন গ্রীনকে করমর্দন করে তাঁকে সহস্র ধন্যবাদ জানালেন। পকেট থেকে একটি বড় সুপুরীতে খোদাই করা অত্যন্ত সূক্ষ্ম কারুকার্যের একটি নটরাজের মূর্তি উপহার দিলেন। আপনি বললেন, দুটি ব্রেন বিশ্বকে যিনি সংঘর্ষে লিপ্ত করেন, বারবার, এটি তাঁরই মূর্তি। সমস্ত বাঙালি জাতির তরফ থেকে আপনাকে এই ক্ষুদ্র উপহার। মানব কুল তাকিয়ে আছে আপনার এবং আপনার মত বৈজ্ঞানিকদের দিকে। তাকিয়ে আছে তাঁদের পরিচয় জানার জন্যে। আপনার জ্ঞানরশ্মির দ্বারা মানুষের জ্ঞান প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করার জন্য আপনাকে সহস্র ধন্যবাদ। নমস্কার। নমস্কার ব্রায়েন গ্রীন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

শেষ কথা?

রানীক্ষেত। পাহাড়ের ওপর দিকে আর্মি ক্যানটনমেন্ট ছাড়িয়ে কুমায়ুন মণ্ডল বিকাস নিগমের আরামদায়ক গেস্ট হাউসে আশ্রয় নিয়েছেন। কয়েকদিন প্রকৃতিকে নিভৃতে উপভোগ করা আপনার উদ্দেশ্য।

সান্ধ্য ভ্রমণে বেরিয়েছেন। মানুষ নয়, কপিকুল অধ্যুষিত অঞ্চল। যানবাহন নয়। পাহাড় কেটে পায়ে হাঁটার জন্যে পাকা রাস্তা। শুনশান পরিষ্কার চারদিক। ঘাড় উঁচু করে দেখার বিশাল বিশাল লম্বা দেওদার আর পাইন গাছে পরিবৃত পাহাড়।

কোন তাড়া নেই। গাড়ী চাপা পড়ার ভয় নেই। পরিচিত, অপরিচিত কারুর সাথে দেখা হওয়ারও সম্ভাবনা নেই।

মাঝে মাঝে কেবল কাঠঠোকরার ঠক্ ঠক্, ঠক্ ঠক্ শব্দ ছাড়া কোন শব্দ নেই। শব্দের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্যে ঠক্ ঠক্, ঠক্ ঠক্।

দিনান্তে রানীক্ষেতের জঙ্গলে পাহাড়দের রজনীর কোলে নিদ্রা যাওয়ার তোড়জোড় আরম্ভ।

এ হেন নৈসর্গিক বাতারণে আপনি দেখলেন অনন্ত আকাশ হতে পাহাড়ের দিগন্ত বেয়ে বিলম্বিতলয়ে নিঃশব্দে তামসী রাত্রির ক্ষেত্র জয়।

আপনার অজান্তে আপনার অলস পদচারণা নিথর হয়। সম্মোহিত চিত্তে হেলান দিয়ে বসে পড়েন পথের ধারে এক বিশাল দেওদার গাছের কাণ্ডের গোড়ায়। সামনে নিম্নগামী জঙ্গলে পাহাড়ের ঢাল। ঢালের শেষে অন্য পাহাড়।

আপনার দৃষ্টির সূদুর সীমানায় দেখলেন আপাতদৃষ্টিতে বিচ্ছিন্ন নয়, অবিচ্ছিন্ন বৃক্ষরাশির পরিধির উপর ঘন নীল আকাশের মাঝে প্রথম তারার আত্মপ্রকাশ। একের পর আরো এক। দুয়ের পর আরো দুই। দশের পর আরো দশ। হাজিরা দেওয়ার জন্যে লক্ষ তারায় ভরা রানীক্ষেতের অমাবস্যার আকাশ হাজির হয় আপনার সামনে।

নৃপতি আপনি। নৃপতির মনোরঞ্জনে প্রকৃতির এই অনন্য রূপ প্রদর্শন।

It is an ecstasy।

বিমহিত মন আপনার। হারিয়ে যায় বিশ্বভুবনের না জানি কোন কিনারায়।

আকাশের মাঝে হারিয়ে যাওয়া মনকে খুঁজতে খুঁজতে আপনার মনে হয় এই

আকাশের একটি কাঠামো, একটি অবয়ব একটি গড়ন বর্তমান। বিজ্ঞান তাই বলে।

বিজ্ঞান বলে “space has a sructure. Plank size structure.

আপনার অবিশ্বাসী মনের প্রশ্ন। আকাশের গড়ন? বাড়ী, ঘরদোর, সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ তারার মত গড়ন?

ঠিক তা নয়। আকাশের গড়ন একটি পরমাণুর থেকেও ছোট। কোটি কোটি, কোটি কোটি গুণ ছোট। ছোট হওয়ার শেষ সীমানায় ছোট। Plank size-এর আয়তনে আকাশের অবয়ব।

৪০ হাজার কোটি তারা দিয়ে নিজেকে সাজিয়ে আমাদের তারামণ্ডলী দুধের রাস্তার মত আকাশের বুকে ছড়িয়ে রয়েছে। নক্ষত্রমণ্ডলী আকাশ গঙ্গা। Milkyway। এপার ওপার করতে আলোর সময় লাগে ১ লক্ষ বছর।

এখানে না জানি কত হাজার কোটি গ্রহ, কত হাজার কোটি চাঁদের বসবাস।

আমাদের প্রতিবেশী নক্ষত্রমণ্ডলী এ্যানড্রোমেডা (ANDROMEDA, Messier object-31) আকাশগঙ্গার দেড়গুণ বড়। ১০০ হাজার কোটি সূর্যের বাসস্থান। আরো কত বেশী গ্রহ চাঁদের অবস্থান সেখানে।

১০ হাজার কোটি নক্ষত্রমণ্ডলী আমাদের জ্ঞাত বিশ্বে।

আপনার বিশ্বাস করতে মন চায় না বিশাল এই ব্রহ্মাণ্ডের আর কি কোথাও, নিদেনপক্ষে মানুষের মতও কোন উন্নত প্রাণী নেই? এমন কোন প্রানী যাঁরা উন্নত প্রযুক্তির অধিকারী?

আধুনিক মানব সভ্যতার বিকাশের সাফল্যের মূলে প্রযুক্তি বিদ্যার প্রভাব অনস্বীকার্য। হয়ত বা বিশ্ব রহস্যের তুলনায় এই সফলতা, এই জ্ঞান অতি অল্প।

মনে রাখা দরকার এই জ্ঞান ক্রমবর্ধমান। ত্বরান্বিত গতিতে ক্রমবর্ধমান।

প্রযুক্তির মাধ্যমেই পৃথিবীর বাইরে, বিশ্বের অন্য কোথাও কোন প্রাণীর সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের প্রষ্টোয় বহু বিজ্ঞানী নিরলসভাবে কর্মরত।

কর্মরত এমন কোন উন্নত প্রাণীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের যাদের সঙ্কেত গ্রহন করা এবং সংকেত প্রেরণ করার প্রযুক্তি কক্ষাগত।

এই সংকেত আদান প্রদানের প্রধান অন্তরায় বিভিন্ন মহাকাশীয় বস্তুর অন্তবর্তী অসীম দূরত্ব।

মনে রাখা দরকার যে কোন ‘নক্ষত্রে’ জীবনের অস্তিত্ব অসম্ভব। নক্ষত্র বিশাল ভাবে উত্তপ্ত। জীবনের অস্তিত্বও সম্ভব কেবলমাত্র জীবন ধারণের অনুকূল এমন কোন গ্রহে অথবা কোন গ্রহের উপগ্রহে।

নক্ষত্রের তুলনায় গ্রহের আয়তন কম। বিশেষভাবে পৃথিবীর মত ছোট গ্রহের আয়তন অত্যন্ত কম। গ্রহেররা নক্ষত্রদের মত জাজ্জ্বল্যমান নয়। এই কারণে অন্য সৌরমণ্ডলীর গ্রহের সন্ধান বিশেষ ভাবে পৃথিবীর আয়তনের গ্রহের সন্ধান করা অত্যন্ত কঠিন। বলা উচিত আজকের প্রস্তুতিতে কঠিন। তদুপরি মহাকাশিয় অসীম

দূরত্ব। ৫০০ আলোকবর্ষ দূরের কোন গ্রহে প্রেরিত সঙ্কেত এর জবাব পাওয়ার জন্যে অপেক্ষা করা দরকার ১০০০ বছর। (যদি কোন উন্নত প্রযুক্তির প্রাণী সেই সঙ্কেত গ্রহণ করার পর তার জবাব দেয়)।

এই সব কারণের জন্যেই যদি কোথাও অন্য কোন সৌরমণ্ডলীকে উন্নত প্রাণী থাকেও তাঁদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা অত্যন্ত কঠিন।

আপনার বিশ্বাস হয় না অন্য গ্রহবাসীদের লুকিয়ে লুকিয়ে পৃথিবীতে আগমন। UFO (Unidenlified flying object), Flying Sancer ইত্যাদি ব্যাপারগুলিতে আপনি বিশ্বাস করেন না।

ভিন্ন গ্রহের intelligent, উন্নত প্রযুক্তির অধিকারী এমন কোন প্রাণীর দ্বারা পৃথিবী আক্রান্ত হওয়ার অহেতুক কোন ভয় নেই আপনার। কেন থাকবে? আপনি জানেন, আপনি লক্ষ্য করেছেন—

মানব সভ্যতার সাথে সাথে হাতে হাত মিলিয়ে ক্রমান্বয়ে, নিশ্চিতভাবে হ্রাস পাচ্ছে হিংসা।

মানুষ বার বার, বহুবার ঠকে ঠকে শিখেছে, (শিখেছে কি?) হিংসার ফলাফল? যুদ্ধের পরিণাম? হিংসা মানেই সভ্যতার অগ্রগতির গতিহ্রাস। creative চিন্তার সর্ব্বাধিক প্রতিবন্ধতা হিংসার মনোবৃত্তি।

তাই আপনার মতে যদি কোন ভিন্ন গ্রহের জীবের পৃথিবীতে আগমন ঘটেও তা ঘটবে মিত্রতার বাতাবরণের। লুকিয়ে চুরিয়ে। সব্বাইকার অলক্ষ্যে, নিভৃত রাতে, নির্জন কোন প্রান্তরে?...না না কদাচ নয়।

নিকট আত্মীয়ের বাড়ীতেও আজকাল ফোন করে তবেই যাওয়ার রীতি।

পৃথিবীতে ভ্রমণে ইচ্ছুক ভিন্ন গ্রহের জীবেরা রাষ্ট্রের কাছে আশার Permission পাওয়ার পরই আসবেন এটাই আপনার বিশ্বাস।

Look before you leap

তেনারা আমাদের পৃথিবী সম্বন্ধে সমস্ত খবরাখবর না যোগাড় করে হুট করে হাজির হবেন কোটি কোটি আলোকবর্ষ পাড়ী দিয়ে একটা নিশ্চয়ই বিশ্বাস যোগ্য নয়।

তা ছাড়া সশরীরে হাজির হওয়ার দরকারই বা কোথায়? অনেক উন্নত প্রযুক্তি তেনাদের করায়ত্ত। 3D অথবা Vertual Projection এর সাহায্যে উন্নত কোন মহাকাশিয় প্রাণী পৃথিবীতে আসতে পারেন। প্রাথমিক ভাবে আসতে তো পারেনই। শারীরিকভাবে উপস্থিতির প্রয়োজন কোথায়? আলোর গতির এমনকি আলোর ১/৪ ভাগ গতিতে গমনাগমন কেবলমাত্র প্রযুক্তির দিক থেকে অত্যন্ত কঠিন তাই নয় তাত্ত্বিকভাবে এবং বিশাল মাধ্যাকর্ষণের চাপ সহ্য করাও শারীরিক ভাবে অত্যন্ত কঠিন।

অন্য তিনটি মৌলিক বলকে shield করা গেলেও গ্র্যাভিটিকে shield করা

সম্ভব নয়। এখনও পর্য্যন্ত মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

অন্যদিকে 3D বা virtual projection-এ আলোর গতিতে ভ্রমণ করা সম্ভব।

আপনার মনে প্রশ্ন জাগে এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে ভিন্ন কোন গ্রহে ভিন্ন গ্রহবাসীদের পৃথিবীর প্রাণীদের মতই যে দেখতে হবে বা বিশেষ করে এই যে পৃথিবীর প্রাণীদের মতই হবে তার কোন কারণ আছে কি? মাথা ওপরে কপাল তারপর, চোখ, নাক, মুখ এই ভাবেই সাজান পৃথিবীর প্রায় সমস্ত স্থলচর প্রাণী। ভিন্ন গ্রহের প্রাণীদের এই ভাবে দেখতে নাও হতে পারে। না হওয়াটাই স্বাভাবিক।

রানীক্ষেতের তারায় ভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আপনি ভাবলেন ব্রহ্মাণ্ডের সব রহস্যের সমাধান কি কোনদিন মানুষ করতে পারবে? পারবে কি সমস্ত আবরণ সরিয়ে এর পূর্ণ পরিচয় উন্মোচন করতে?

হাতের কাজ এখন Dark matter, Dark energy এদের পরিচয় জানা।

জানা দরকার আমাদের বিশ্বটি কত দিশার বিশ্ব? দৃশ্যত আকাশের তিন আর সময়ের এক এই নিয়ে ৪ দিশার বিশ্ব আমাদের। সুপার স্ট্রিং থিয়োরী আকাশের আরো ৭টি দিশার কথা বলে। আকাশের তিনটি দিশার অধিক দিশার অস্তিত্বের প্রমাণ দরকার।

সুপার স্ট্রিং থিয়োরীর মতে বিশ্বের সমস্ত কিছুর গঠনের Raw material বিশ্বের সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতম আয়তনের বিভিন্ন দিশায় স্পন্দিত স্ট্রিং। স্ট্রিং এর অস্তিত্ব বাস্তব? super string theory, বা M theory কি বিজ্ঞান? science? না দর্শন? Philosophy?

জরুরী দরকার Relativity আর quantumn mechanics এর মেলবন্ধন। দরকার theory of everything এর আবিষ্কার। চারটি মৌলিক বলের যোগসূত্রটি জানা দরকার।

জানা দরকার পদার্থের ভরের কারণ। Higgs Boson ক্ষুদ্রকণার অস্তিত্ব সুনিশ্চিত করা।

মাধ্যাকর্ষণ বলের বাহন কণা Graviton-এর অস্তিত্বের প্রমাণ দরকার। দরকার Gravitationel field-এর অস্তিত্বের প্রমাণ।

এ তো গেল হাতের কাজ। এরপর আছে ব্লাকহোলের অন্দরমহলের খবরাখবর জোগাড় করা (Inside event horizon)। কি কান্ড ঘটছে সেখানে? ব্লাকহোলের কেন্দ্রে (কেন্দ্রকে বলা হয় Singulerity) সমস্ত কিছুই (যা ইভেন্ট হরাজনের লক্ষণ রেখা অতিক্রম করেছে) Infinite মাধ্যাকর্ষণ বলের কারণে ক্ষুদ্র হতে হতে ক্ষুদ্রতম বিন্দুতে রূপান্তরিত হয়ে অবশেষে চির বিদায় নিচ্ছে আমাদের চেনাশোনা বিশ্বটি হতে। বিশাল-বিশাল নক্ষত্রমন্ডলী অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে Black hole-এর Singulerity-তে এই কি সব শেষ?

Singularity হয়ত বা Worm hole-এর প্রবেশ দ্বার? ভিন্ন কোন সমান্তরাল

ব্রহ্মাণ্ডের প্রবেশ দ্বার? Worm hole হয়ত বা তাৎক্ষণিক না হলেও অতি অল্পসময়ে বিশাল মহাকাশীয় দূরত্বের Short cut?

আপনার মনের এই সব প্রশ্নের পরিসীমা আপনার জ্ঞান। জ্ঞান বাড়লে প্রশ্নও বাড়ে। বাড়ার শেষ কোথায়? কেউ কি জানে এর শেষ কোথায়?

আপনার চিন্তা ধারার পরিবর্তন করে মননিবেশ করেন আমাবস্যার রাতে তারায় ভরা রাণীক্ষেতের আকাশে প্রকৃতির অনিবর্চনীয় Ramp walk-এ।

আপনার শান্তিনিকেতনি ঝোলা থেকে Portable দূরবীনটি-বের করে ঐ ঐশ্বরিক বাতাবরণে প্রকৃতিকে অর্ঘ্য প্রদানে ব্রতী হন আপনি। চোখ রাখেন না জানি কতদূরে কোন এক অজানা নক্ষত্রমন্ডলীর কোন এক অজানা নক্ষত্রে?

পকেট থেকে লেজার পেনটি বের করে সাংকেতিক বার্তা পাঠান Hallow পৃথিবী থেকে বলছি....

পরিশিষ্ট

মহাকাশ বিজ্ঞান ভারতবর্ষে : ভারতবর্ষে আর চিনে প্রাচীনকাল থেকেই মহাকাশ বিজ্ঞানের চর্চা ছিল। বেদে বিশেষ করে ঋগ্বেদে এই বিজ্ঞানের উল্লেখ পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ বছরের কথা। বৈদিক আর্যরা সূর্য, তারা, ধুমকেতু, গ্রহ ইত্যাদি মহাকাশীয় বস্তুর উল্লেখ করে গেছেন। সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর বার্ষিক গতি আর পৃথিবীর অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রহদের অবস্থান এঁনারা অঙ্কের সূত্রে বার করতে পারতেন। আকাশে গ্রহদের অবস্থান তাঁরা জ্যোতিষ শাস্ত্রে ব্যবহার করতেন। প্রাচীন আর্যরা জানতেন তারাসকল সূর্যের থেকে অনেক দূরে অবস্থিত তাই তারাদের এত ছোট দেখায়। এছাড়া, তারা আর সূর্যের মধ্যে কোন তফাত নেই। এঁনারা পৃথিবীর ব্যাস বলেছিলেন ৫০০০ যোজন। এক যোজন হল ৭.২ কিলোমিটার। তার মানে আর্যরা আজ হতে প্রায় ৫০০০ বছর আগে বলেছিলেন পৃথিবীর পরিধি ৩৬,০০০ কিলোমিটার। আমরা এখন জানি পৃথিবীর পরিধি ৪০০৭৬.৫ কিলোমিটার বিষুব রেখায়। সেই সময় মাপার কোন যন্ত্র ছিল না কেবল অঙ্ক কষেই তেনারা ১০ শতাংশের মধ্যে তাঁদের মাপ বের করেছিলেন। এটি কম কৃতিত্বের ব্যাপার নয়।

খ্রিস্টিয় ৪০০ শতাব্দে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি মানমন্দির ছিল মহাকাশ পর্যবেক্ষণ করার জন্যে ৫০০ খ্রিস্টাব্দে আর্যভট্ট সেখানে অধ্যয়ণ করেছিলেন। মহাকাশ বিজ্ঞানে তাঁর অসাধারণ জ্ঞান তিনি লিপিবদ্ধ করে গেছেন। আর্যভট্ট সূর্যকেন্দ্রিক জগতের পক্ষে মত দিয়েছিলেন। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের মানমন্দিরটির নাম ছিল 'খাগোলা'। তারা আজও ভারতবর্ষের কোথাও কোথাও মহাকাশ বিজ্ঞানকে খাগোলা শাস্ত্র বলা হয়ে থাকে। আর্যভট্টের সূর্যকেন্দ্রিক জগতের তথ্য ফারসি ভাষায় অনুবাদিত হয়েছিল। হতে পারে তাঁর এই অনুবাদ পারস্য থেকে পাশ্চাত্যেও ছড়িয়ে পড়ে। নিকোলাস কোপারনিকাসের প্রায় ১০০০ বছর আগে আর্যভট্ট সূর্যকেন্দ্রিক জগতের কথা লিখে গেছেন। তাঁর লেখা লাটিন ভাষায় অনুবাদিত হয় ১৩০০ শকাব্দিতে। ত্রিভূজের ক্ষেত্রফল (AREA OF TRIANGLE), বলের ঘনবল (VOLUME OF SPHERE), বর্গমূল (SQUARE ROOT), ঘনমূল (CUBE ROOT) নির্ণয় করার পদ্ধতি তৎকালীন পাশ্চাত্যের গণিতজ্ঞরা তাঁর লাটিন অনুবাদের থেকে শিখেছিলেন। তবে তাঁর সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ, সূর্যের প্রতিফলিত আলোতেই চাঁদ আলোকিত এই সব তথ্য সেখানে সমাদৃত হয় নি। কারণ ততদিনে কোপারনিকাশ গ্যালেলিও তাঁদের তথ্যাদি প্রকাশ করে ফেলেছিলেন। যদিও আর্যভট্ট তাঁদের ১০০০ বছর পূর্বেই এইসব তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করেছিলেন কিন্তু তাঁর ল্যাটিনে অনুবাদ হয়েছিল প্রায় ১০০০ বছর পর।

দূরবীক্ষণ যন্ত্রের অভাবে ভারতবর্ষে মহাকাশ বিজ্ঞানের চর্চায় অনেক ক্ষতি হয়েছিল। তবুও সূর্যের, চন্দ্রের ও গ্রহদের গতিবিধি, সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ, সমুদ্রের জোয়ার ভাটা ইত্যাদির ভবিষ্যতবাণীতে তাঁদের যথেষ্ট নিপুণতার পরিচয় পাওয়া যায়।

ব্রহ্মগুপ্ত ৭ম শতাব্দীতে পৃথিবীর পরিধি বলেছিলেন ৫০০০ যোজন। এই গণনা সঠিক মানের প্রায় কাছাকাছি। ব্রহ্মগুপ্ত পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সম্বন্ধেও তাঁর মতবাদ ব্যক্ত করে গেছেন।

আর্যভট্ট আর ব্রহ্মগুপ্ত ছাড়াও প্রাচীন ভারতীয় মহাকাশ বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন বরাহমিহির (৬ শতাব্দ), লালা (৮ শতাব্দ), মঞ্জুলা (১০ শতাব্দ), শ্রীপতি (১০ শতাব্দ), আর ভাস্করাচার্য (১১ শতাব্দ)। ভাস্করাচার্যের পর আধুনিক মহাকাশ চর্চায় ভারতের তেমন উল্লেখযোগ্য আবেদন পাওয়া যায় না।

আধুনিক মহাকাশ বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে ভারতের মেঘনাদ সাহা (1892-1936) আর সুব্রমনিয়াম-চন্দ্রশেখরের (1910-1995) নাম উল্লেখযোগ্য। মেঘনাদ সাহা সূর্যের, তারাদের মধ্যে উচ্চ তাপের জন্যে গ্যাসের কণাদের তড়িৎ কণায় রূপান্তরিত হওয়ার ব্যাপারে কাজ করে গেছেন। তাঁর এই কাজের জন্যেই অধুনা বহুব্যবহৃত স্পেকট্রোমিটার আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছিল। এই যন্ত্রের সাহায্যে তারা, তারামন্ডলী, সূর্য ও দূরদূরান্তে অবস্থিত মহাকাশীয় বস্তুর যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে।

সুব্রমনিয়াম চন্দ্রশেখর মহাকাশে তাপের প্রবাহ নিয়ে কাজ করেছিলেন। ব্রহ্মান্ডের সব তারাদেরই একটা জীবন দশা আছে। আমাদের সূর্যেরও আছে। ৫০০ কোটি বছর পর সূর্যের জীবনের অবসান ঘটবে। প্রতি সেকেন্ডে ৪০ লক্ষ টন হাইড্রোজেন গ্যাস দাহিত হচ্ছে সূর্যকে জীবিত রাখার জন্যে। ৫০০ কোটি বছর পর সূর্য কিন্তু পৃথিবীর থেকেও ছোট হয়ে যাবে। আর এটি একটি অন্যরকম তারারূপে অবস্থান করবে। এই বামন তারাদের বলা হয় সাদা বামন তারা (WHITE DWARF STAR)। সুব্রমনিয়াম চন্দ্রশেখর আবিষ্কার করেছিলেন যে—যে সব তারা সূর্য থেকে ১.৪৪ গুণ বড় তাদের জীবনান্তে সাদা বামন তারার দশা প্রাপ্তি ঘটেনা। এটি চন্দ্রশেখর লিমিট বলে বিখ্যাত। ১৯৮৩ সালে চন্দ্রশেখর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উইলিয়াম-এ ফাউলারের সাথে যুগ্মভাবে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তাঁদের তারা সম্বন্ধীয় কাজের জন্যে। ১৯৯৯ সালে আমেরিকা X-রে দূরবীক্ষণ যন্ত্র সম্বলিত একটি মানমন্দির পৃথিবীকে প্রদক্ষিণরত মহাকাশে স্থাপন করে এবং চন্দ্রশেখরের নামানুসারে মানমন্দিরটির নামকরণ করা হয় চন্দ্রা। এই চন্দ্রার সাহায্যে আজ অবধি মহাকাশ সম্বন্ধীয় অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। এই মানমন্দির পৃথিবী বিখ্যাত আর মহাকাশ বিজ্ঞানের গবেষণায় একটি জ্যোতিষ্ক স্বরূপ। তিনি

কসমোলজির ও মহাকাশ বিজ্ঞানের ওপর দুটি তথ্যপূর্ণ বই লিখে গেছেন। একটি হল স্টাডি অফ স্ট্রেলার স্ট্রাক্‌চার (১৯৩৯) আর একটি প্রিনসিপল অফ স্ট্রেলার ডাইনামিকস্ (১৯৪২)।

সরাসরি মহাকাশ-বিজ্ঞানের সঙ্গে জড়িয়ে না থাকলেও আর একজন বিখ্যাত বাঙালি বৈজ্ঞানিকের নাম নেওয়া হয়ত অসংগত হবে না। তিনি হলেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু (১৮৯৪-১৯৭৪)। পারটিক্যাল ফিজিক্স আর কোয়ানটাম মেকানিকস্ এর ওপর তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সব কাজ করে গেছেন। পদার্থবিজ্ঞানের এই দুটি শাখার ব্যবহার করা হয়ে থাকে ব্যাপকভাবে মহাকাশ বিজ্ঞানের গবেষণায়। মহামান্য আইনস্টাইনের সঙ্গে তিনি যুগ্ম প্রচেষ্টায় স্ট্যাটিসটিক্যাল মেকানিকস সূত্র আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁর-ই নামানুসারে ফিজিক্স একটি পারটিকেলের নামকরণ করা হয় বোসন। CRYSTALLOGRAPHY আর জাগতিক চারটি বলের (FORCE)-এর একত্রিকরণ নিয়েও তিনি বেশ কিছু তথ্য পেশ করেছিলেন।

পরিশেষে জয়ন্ত বিষ্ণু নারলিকারের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে ভারতীয় কসমোলজিস্টদের নামের সঙ্গে।

বছর পাঁচেক আগেকার ঘটনা। নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় বক্তব্য রাখছিলেন। উল্লেখ করলেন আগামি ১০ হতে ১৫ বছরের মধ্যে বিশ্বসাহিত্য সভায় বাংলা সাহিত্যের স্থানচ্যুতির সম্ভাবনার ব্যাপারটি।

এই স্থানচ্যুতির কারণ অন্বেষনে আমার ধারণা হয় "বাংলা সাহিত্যে ব্যাপ্তি তথা ব্যাপৃতির স্বল্পতা। বিশেষ কোন বিষয়ে বাংলা সাহিত্য বহুলাংশে দেউলিয়া। কারণ হয়ত বা চাহিদার অভাব। চাহিদাকে এড়িয়ে, সৌমিত্রবাবুর বক্তব্যে অনুপ্রারিত এই **Novice** লেখক ব্রতী হয় বাংলা সাহিত্যের ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম ব্যাপ্তি সম্প্রসারণে।

এই প্রচেষ্টার ফলাফলের নির্ভরতা পাঠক সমাজে সমাদৃত হওয়ার ওপর। আশায় আশায় —

SOLUTION PRIVATE LIMITED
www.infounibyte.com
Specialised in : ERP, Web Development, e-books, Cover Design.